এক

আমার স্বগ্রামবাসী এক প্রৌঢ়ের কৈশোর-স্মৃতি লিখে পাঠিয়েছেন।

শাস্ত্রমতে এগার থেকে পনের বছর পর্য্যন্ত পাঁচ বছর হল কৈশোর। যোল বছর বয়স হলেই শাস্ত্রমতে সে যুবক হয়ে যায়। অর্থাৎ বাল্য এবং যৌবনের মধ্যবর্ত্তী কাল হল কৈশোর। ঠিক যেন ভোরবেলার তন্দ্রাচ্ছন্ন কালের মত কাল। বাইরের পাখীর ডাক, ফুলের গন্ধ, বাতাসের স্পর্শ, আলোর আভাস, প্রতিটি ইন্দ্রিয়ে সাড়া তুলে তাকে জাগিয়ে তোলে ধীরে ধীরে; বলে—ওঠ, জাগ, দেখ বাইরের পৃথিবী কত সুন্দর, কত কর্ম্মমুখর, ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরে এস। জেগে উঠে বাইরে এসে পথে নামা আর কৈশোর শেষ হয়ে যৌবনের জাগরণ হওয়াও ঠিক এক রকম।

আমাদের স্কুলে সংস্কৃত পড়াতেন হেডপণ্ডিত মশায়; তিনি বলতেন—"বাবা, কৈশোর কাকে বলে জানিস? গরুর বাছুরের শিঙ ওঠা দেখেছিস? শিঙ দুটো দেখা দেয় অথচ মাথা ছাড়িয়ে ওঠে না, গুঁতোবার ঠিক শক্তি জন্মায় না অথচ অনবরত সে গুঁতোতে চায়—কৈশোর হ'ল ঠিক তাই।" রসিক লোক ছিলেন তিনি। কিন্তু কথাটা ঠিক বলেছিলেন। ফুল ধরবার আগে চারাগাছ সতেজ হয়ে বাড়তে সুরু করে। আলোর দিকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। গাছের কৈশোর ওই সময়টুকু।

সে হিসাবে আমাদের দেশে কৈশোর আসে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সময়ের আরও কিছু পরে। অন্তত আমাদের কালে আসত। কালটা ছিল এখন হতে চল্লিশ বছর আগে। দেশে তখন পরাধীনতার শীত ঋতু বর্ত্তমান—রাত্রি ছিল বড়, দিন ছিল ছোট, সূর্য্যোদয় হত বিলম্বে। চৌদ্দ পনের বছরের আগে তখন নবীনের মনে ভবিষ্যতের আহ্বান আসত না। তখন ইংরিজি ১৯১১।১২ সাল; একদিন—সে দিনের কথা আমার মনে আজও অনির্ব্বাণ প্রদীপের শিখার মত অক্ষয় হয়ে আছে, যখন-তখন সে স্মৃতি আমার মনে

জেগে ওঠে। সেদিন রাত্রি তখন প্রায় বারোটা, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ব
মানুষের চীৎকারে। আগুন—আগুন—আগুন!

আমার দেশ বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। আমাদের ও অঞ্চ
মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। মাটির দেওয়ালের ঘর পাকাবাড়ীর ম
পোক্ত, এক একখানা ঘর একশো দেড়শো বছর কাটিয়ে দেয়। চাল দেড়ফু
দু' ফুট পুরু করে খড় দিয়ে ছাওয়ানো! চাল কাঠামোতে পাকা তালে
কড়ি-বর্গা চাল-কাঠ, তার সঙ্গে দেশী জাম অর্জ্জুন কাঠের কত সযত্ন কারুকা
করা কাঠ লাগানো থাকে। আগুন লাগলে আগুনের অগ্নিমান্দ্য সেরে যা
খাদ্য শুধু সুস্বাদুই নয় পরিমাণেও সে পায় ভূরি-ভোজন। আমাদের দেশে
বসতি অত্যন্ত ঘন, চালে চালে প্রায় ঠেকে থাকে, কলকাতার বাড়ীর ছাদে
মত এ চাল থেকে ও চাল ক'রে যাওয়া চলে! হনুমানের দল মাঠ থেকে
গ্রামের একপ্রান্তে একটা চালে উঠে এ প্রান্তে এসে মাটিতে নেমে গ্রামান্তরে
চলে যায়। কাজেই 'আগুন' শব্দ শুনলে গোটা গ্রাম চকিত হয়ে উঠে
আমাদের গ্রামে সমাজ-সেবক সমিতি নামে একটি সমিতি ছিল, না
কাজের মধ্যে আগুন নেভানোর কাজ ছিল সব চেয়ে বড় কাজগুলির একটি
বালতি ছিল পঁচিশটা। 'আগুন' শব্দ শুনলেই ছেলের দল ছুটে গিয়ে সমিতি
বাড়ীর দরজায় জমত। সেখান থেকে ছুটত বালতি নিয়ে। নিয়ম ছি
ছেলেরা জল তুলবে, তার চেয়ে বড় যারা তারা সেই জল তুলে ধরবে—
আর আগুনধরা চালের উপর উঠে সেই জল নিয়ে আগুনের সঙ্গে লড়া
করবে অগ্রবর্ত্তীরা প্রধানেরা। আরও নিয়ম ছিল, ছোটরা গ্রামান্তরে যাবে
না। তাদের কাজ গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেদিন রাত্রে ঘুম ভে
উঠে বাড়ীর ছাদে উঠে দেখলাম আকাশ লাল হয়ে উঠেছে উত্তর দিকে
গ্রাম তখন জেগেছে, পাকা বাড়ীগুলির ছাদে ছাদে কথা চলছে। কোথা
আগুন? বুঝতে পারছি না, বোধ হয় মহুগ্রামে!—ওঃ উকো উড়ছে দেখ
দেখেছ? চৈত্রমাস—চাল একেবারে শুকনো হয়ে আছে! ওদিকে আকা
জ্বলন্ত খড়ের কুটি আগুনের শিখার বেগে হাউইয়ের মত ছটকে উ
আকাশময় ছড়িয়ে জ্বলতে জ্বলতে ভেসে চলেছে। কিছুদূর গিয়ে ঝ

পড়েছে। অধিকাংশই আকাশে নিভে যাচ্ছে অবশ্য। কিন্তু জ্বলন্ত অবস্থায় নেমেও আসছে অনেক স্ফুলিঙ্গ। দূর থেকে ভেসে আসছে বিপন্ন মানুষের আর্ত্ত চীৎকার। মহুগ্রাম আমাদের গ্রামের উত্তরে। তখন আমি দিনের বেলা গ্রামান্তরে যেতে পাই, রাত্রে যাওয়ার হুকুম পাইনি। রাত্রে যেতে সাহসও ছিল না তখন। অন্ততঃ এই দিন, এই ক্ষণটির আগে সাহস ছিল না। রাত্রে ওই আকাশের লাল ছটায় মুক্তপথ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল যেন। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর্ত্তকলরব আমার মনে যেন একটা অলঙ্ঘনীয় আহ্বান এনে দিল। ডাক সেদিন আমি যেন স্পষ্ট শুনেছিলাম। হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম, ছুটে নীচে নেমে এলাম। পিছনে মা পিসিমা বিস্মিত শঙ্কিত হয়ে আমায় ডাকলেন, ওরে—ওরে! আমি শুনতে পেয়েছিলাম কিনা মনে নাই, কিন্তু বারেকের জন্য—ক্ষণেকের জন্যও দাঁড়াইনি। ছুটেছিলাম—ছুটেছিলাম। সমিতির বাড়ীর দোরে কখন পৌঁছেছিলাম ঠিক স্মরণ করতে পারি না, তবে গিয়েছিলাম, কারণ মনে পড়েছে গ্রামান্তরে জ্বলন্ত ঘরের সামনে যখন দাঁড়িয়েছিলাম, তখন আমার হাতে বালতি ছিল। তিন চারখানা ঘরে তখন আগুন লেগেছে। চাষীর গ্রাম—চাষীদের মেয়েরা মাটির হাঁড়ি ভরে জল তুলে আনছে। একটি মেয়ের কাঁখ থেকে একটা জল-সুদ্ধ কলসী ফেঁসে গিয়ে পড়ে গেল। আমি তারই হাতে দিলাম বালতিটা।—এইটে—এইটেতে আন জল।

খালি হাতে আমি চাইলাম জ্বলন্ত চালের দিকে। চৈত্র মাসের শুকনো খড় জ্বলছে—হাওয়ায় মধ্যে মধ্যে আগুনের শিখা লম্বা হয়ে যেন শুয়ে পড়ছে, মুহূর্ত্তে সামনের খানিকটা খড় জ্বলে উঠছে। আগুন যেন লাল ছুটন্ত ঘোড়ার মত ছুটে এগিয়ে আসছে। কি যে হল আমার, আমি উঠে পড়লাম মই বেয়ে চালের উপর। আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছিল, গরম হয়ে উঠছিল, ওই ছুটন্ত জ্বলন্ত লাল ঘোড়াটার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে ওকে আঘাত করব, রুখব জলের ধারা ঢেলে। আর টেনে খসিয়ে নেব ওর ছুটন্ত ক্ষুরের সম্মুখের সুগম পথকে, অর্থাৎ ছাড়িয়ে দেব খড় বাঁখারী বাঁশ। ওকে থমকে দাঁড়াতে হবে। কতটা আমি পেরেছিলাম জানি না, তবে সমবেত চেষ্টায় আগুনকে

দাঁড়াতে হল থমকে, তারপর নিভল। নিভল যখন তখন রাত্রি তিনটে। আমার গায়ে অনেক জায়গায় আগুনের আঁচে ফোস্কা পড়েছিল। কেটেও গিয়েছিল কয়েকটা জায়গায়। বাঁশ ছাড়াতে খড় টানতে দড়ি ছিঁড়তে হাত আর পায়ে বেশ আঘাত পেয়েছিলাম। সেই আমার কৈশোর-জাগরণ, সে দিন বুঝতে পারিনি—আজ পারি। তবে পরের দিন থেকে আমি যে পাল্টে গিয়েছিলাম এটা অনুভব করতে পারতাম। মনে হ'ত বড় হয়েছি আমি। সত্যই বড় হয়েছি। পদক্ষেপে সেই মনের কথাটুকু যেন ঘোষণা ক'রে চলতাম। আশেপাশের লোকের মৃদু কথাও শুনতে পেতাম—ছেলেটা ডাঁটো হ'য়ে উঠল দেখতে দেখতে।

তখন পৃথিবী এল তার আহ্বান নিয়ে।

১৯১১।১২ সাল।

তখন বাংলা দেশে ছেলেদের কৈশোরের কল্পনায় সার্থক জীবন ভাবতে গেলেই তিনটি স্বর্ণসিংহাসন ভেসে উঠত। একটিতে আঙ্গুল দেখিয়ে দাঁড়াতেন তেজোদৃপ্ত এক সন্ন্যাসী—মাথায় গৈরিক পাগড়ী—গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, আয়ত অদ্ভুত দুটি চোখ, বলতেন—জানিও জন্ম হইতেই তুমি মহামায়ার উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত! আত্মবলি দিয়া এই সিংহাসনের অধিকারী হও। সে সন্ন্যাসী—বিবেকানন্দ।

আর একটি সিংহাসনের পাশে দাঁড়াতেন—আর এক তেজোদৃপ্ত পুরুষ—মাথায় পাগড়ী, গায়ে চাপকান, দৃঢ়বদ্ধ অদ্ভুত দুটি ঠোঁট, তেমনি ললাট, চক্ষে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! তাঁর হাতে লেখনী, কুক্ষিতলে বই। নাম পড়া যেত বইগুলির। কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ, রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কমলাকান্তের দপ্তর, আরও অনেক—অনেক। এই বইগুলি আমাদের বাড়ীতে ছিল, আমি পড়েছিলাম। বাকি বইগুলি তখনও পড়িনি। তিনি বলতেন আমার পিছনে এস। গান গেয়ে এস—পৃথিবীর দেশে দেশে—বাংলাদেশের বেদনার গান। বলি ও-সুখের কথায়

বাঙালীর অধিকার নাই, কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন, স্বার্থক হ'লে এ সিংহাসনে তুমি বসতে পাবে।

আর একটি সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন একটি পনের যোল বছরের কিশোর। দেবদূতের মত কল্পনার জন সে। তার ছবি কখনও দেখিনি তবে বাউলদের মুখে তার গান শুনেছি।

বিদায় দে মা ফিরে আসি।
হাসি হাসি পরব ফাঁসী দেখবে জগতবাসী।

ক্ষুদিরাম আঙ্গুল দেখিয়ে বলতেন, এ সিংহাসনের মূল্য গলায় ফাঁসী পরে দিতে হবে। বন্দেমাতরম্।

এই তখনকার দিন।

হয় বিবেকানন্দের মত দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী, নয় বঙ্কিমের আদর্শে সাহিত্যিক, নয় ক্ষুদিরামের আদর্শে শহীদ হওয়াই ছিল বাঙালীর ছেলের কৈশোরের স্বপ্ন। আরও ছিল বই কি।

ছিল—মর্ত্ত্যের কুশন আঁটা রূপোর চেয়ার।

মোহনবাগান ছিল। মোহনবাগান সেবারই আই-এফ-এ শিল্ড পেয়েছে। মনে আছে এগারোজন খেলোয়াড়ের শিল্ড-বল নিয়ে গ্রুপ ফটোর ব্লক ছাপিয়ে বাংলাদেশের ক্লাবে ক্লাবে পাঠানো হয়েছিল। আমাদের হাফ্-ইয়ারলি একজামিন হচ্ছে, পরীক্ষা দিচ্ছি—আমাদের হেডমাষ্টার মশাই হঠাৎ এসে সেই ছবিটা আমাকে দেখিয়ে বললেন, দেখ্, এরা গোরাদের খেলায় হারিয়ে শিল্ড নিয়েছে। পারবি এমনি খেলতে?

খেলাতেও আমার ঝোঁক ছিল। কি শীত কি গ্রীষ্ম, ছুটির পর বীরভূমের অবাধ প্রান্তরে খেলার মাঠে বল নিয়ে ছুটতাম, বল যতক্ষণ দেখা যেত ততক্ষণ খেলা চলত। মাত্র দু'জন খেলোয়াড়, আমি আর একজন, তাও চলেছে খেলা—ধাঁই—ধাঁই আমি এদিকে, বীরেশ্বর বলে একটি ছেলে সে ওদিকে। বীরেশ্বর আজও খেলতে পারে বোধ হয়। কালো কষ্টি পাথরের মত শক্ত শরীর তার। খেলাতেও তেমনি পারদর্শিতা ছিল। সুযোগ পেলে সে বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় হতে পারত। ফুটবল

নিজ্‌নে নিত্য তার ছবি উঠত কাগজে! আমার সাধ ছিল আমি হব শিব ভাড়ুড়ীর মত লেফ্‌ট আউট।

আরও একটা ছিল গদি-আঁটা চেয়ার। সে ছিল অভিনেতার আসন। শখের থিয়েটারের মারফতে ওই আসনটাকে তুলে ধরা হয়েছিল। নইলে পেশাদারী থিয়েটারে যাবার কথা মনে থাকলেও কেউ উচ্চারণ করতে পারত না। তবে শখের থিয়েটারে নাম কেনার আকাঙ্খা কিশোর মনের কোণে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিত। আমাদের লাভপুরের শখের থিয়েটার সত্যসত্যই ভালো থিয়েটার ছিল। পাকা স্টেজ, প্রচুর সাজ সরঞ্জাম, সত্যকারের অভিনয়-প্রতিভা—সবই ছিল। স্বর্গীয় নাট্যকার নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই আয়োজনের পুরোধা। তিনি প্রতিভাশালী অভিনেতা ছিলেন। নাটক লিখে—অভিনয় করে—সাহিত্য ও নাট্য চর্চ্চার একটি অপরূপ পাদপীঠে পরিণত করেছিলেন আমাদের গ্রামকে। এই প্রসঙ্গে ছোট একটি গল্প বলি। কলকাতা থেকে খাস কলকাত্তাই একদল বরযাত্রী গিয়েছিলেন আমাদের গ্রামে। মেয়ে আমাদের গ্রামের। ধনীর কন্যা এবং সাধের কন্যা। তাই আমাদের সখের রঙ্গমঞ্চ অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। বরযাত্রীরা হেসে বললেন—রাত্রি জেগে অভিনয় দেখার দায় থেকে অব্যাহতি দিতে হবে! অনেক বিনয়ের পর স্থির হ'ল—এক অঙ্ক দেখবেন। বিবাহ শেষ রাত্রে। বিবাহের পর দিন অভিনয়। সেজন্য থাকতে হ'ল তাঁদের। বিবাহের দিন তাঁরা খেয়ে দেয়ে শুয়েছেন—আমি গিয়েছি পান নিয়ে। ঘরে ঢুকতেই শুনলাম, একজন বলছেন—আজ যে যে গোলমাল ক'রে ঘুমুতে দেবে না, কাল তাকে সমস্ত রাত্রি থিয়েটার দেখার সাজা নিতে হবে। অর্থাৎ ওখানে থিয়েটার দেখা, আর কুইনিন মিক্সচার একটু একটু ক'রে খাওয়া একই রকম ব্যাপার। আমি যত পেলাম লজ্জা তত হ'ল দুঃখ। পরের দিন তাঁরা থিয়েটার দেখতে বসলেন—গোড়া থেকেই গোল ক'র না গোল ক'র না করে গোলমাল সুরু করলেন। অভিনয় আরম্ভ হল। নির্ম্মলশিববাবুর বীররাজা নাটক। সেখানি তখনও পাণ্ডুলিপি, কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তখনও অভিনয় হয়নি, ছাপাও হয়নি। প্রথম দৃশ্য

অভিনীত হ'তে হ'তে কলকাতার বাবুরা ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে চুপ করলেন। নিজেদের মধ্যে গা টেপা-টিপি সুরু করলেন। যার অর্থ হ'ল, একি হে! এরকম তো কথা ছিল না। এ যে ধুকুড়ির মধ্যে খাসা চাল! একেবারে দাদখানি।

আমাদের গ্রামের একজন রসিক পিছনে বসে কথাটা শুনেছিলেন। তিনি প্রথম দৃশ্য শেষ হতেই চেঁচিয়ে উঠলেন—গোবিন্দ ভোগ! গোবিন্দ ভোগ! অর্থাৎ দাদখানি চালটা কলকাতার; এখানকার ভাল চাল আমাদের গোবিন্দ ভোগ। কলকাতার বাবুরা রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত অভিনয় শেষ দেখে তবে উঠেছিলেন।

আমার কৈশোরে এই পাঁচখানি আসনের হাতছানিই আমাকে উতলা করেছিল। দু-এক বছর যেতেই সেবা সমিতির সম্পাদক হলাম। আজও সে স্মৃতি মনে জাগলে ক্ষণিকের জন্যও উদাস হয়ে পড়ে আমার সমস্ত সত্তা। মনে পড়ে সেই পুণ্য সাধনার স্বাদ। মনে পড়ে যে পীড়িতের, যে আর্ত্তের সেবা করতাম—তার চোখের সে দৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে থাকত বিধাতার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ! একবার কলেরা মহামারীর আকারে আমাদের অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল। কলকাতা থেকে স্বাস্থ্যবিভাগের বড় কর্তা বেণ্টলী সাহেব গিয়েছিলেন একদল ভলেণ্টিয়ার নিয়ে। তখন আমি ছেলেদের নিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছি। বেণ্টলী সাহেব আমাকে তাঁর নিজের ওয়াটারপ্রুফটি উপহার দিয়েছিলেন। আমার উপন্যাস ধাত্রীদেবতার মধ্যে এই মহামারীর এবং আমার সে সময়ের সেবা-কর্ম্মের ছবি ফুটে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে চলত সাহিত্য সাধনা। লিখতাম কবিতাই বেশী। নাটকও লিখতাম। এবং ছাদের উপর সিন্ হিসেবে নানা রঙের গায়ের র‍্যাপার টাঙিয়ে অভিনয় করতাম। পরবর্ত্তী জীবনে অভিনয় করেছি। অভিনয়ের জন্য সুখ্যাতিও পেয়েছি। নিজের রোগা চেহারার জন্য রঙ্গমঞ্চে নামতে আজ লজ্জা পাই, নইলে হয়তো রঙ্গমঞ্চে অন্তত এখানকার সখের অভিনয়ে অভিনয় করতাম। কিছুদিন আগে সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রস্মৃতি সমিতির তরফ থেকে অভিনয় করেছিলেন। তাঁদের জেদে শেষ পর্য্যন্ত একটি চাকরের

ভূমিকা বেছে নিয়েছিলাম। অভিনয় দেখে তারিফ করে আমাদের এক সাহিত্যিক দাদা প্রেক্ষা-গৃহ থেকে হেঁকে বলেছিলেন—কি হ'লে এমন চাকরটি পাওয়া যায়? বলি ওহে, মাইনে নেবে কত?

তারপর সুরু করেছিলাম গল্প লেখা, উপন্যাস লেখা। তখন আমার বয়স মধ্যযৌবনে। বত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে। মধ্যে সাহিত্য-সাধনায় একটা দীর্ঘ ছেদের পর।

এই দীর্ঘ ছেদটা শহীদ হবার তপস্যায় কেটেছিল আমার। এ তপস্যা শুরু হয়েছিল কৈশোরেই। পনের ষোল বছর বয়সে এসে পড়েছিলাম বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে। পুরো বিপ্লবী হইনি তবে তাঁদের জানার সৌভাগ্য হয়েছিল। ম্যাট্রিকপাশ করেছিলাম ষোল বছর বয়সে। কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলাম। কিছুদিন যেতে না যেতে দলের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গেল। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলেছে। ওদিকে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের—'এবার ফিরাও মোরে'—কবিতাটি ছিল আমার পরম প্রিয়। আমার আত্মার বাণী। কবিতা লিখতাম। বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে হতে মনে মনে বলতাম "ওরে তুই ওঠ্ আজি, আগুন লেগেছে কোথা!" গান গাইতে পারি না, তবুও তখন গাইতাম—"একলা চল রে।"

এর মধ্যেও কিন্তু মোহনবাগানের খেলা দেখেছি। অনেক কষ্টে অনেক সাহস সঞ্চয় করে ভাদুড়ী ভাই দুজনের—সেকালে বলত ভাদুড়ী ব্রাদার্স, তাঁদের কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছি। মনে আছে শিব ভাদুড়ীর জামাখানি সন্তর্পণে স্পর্শ করে মনে মনে গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম!

এ গল্প আমার ফুটবল খেলার সঙ্গী বীরেশ্বরের কাছে করেছিলাম, অনেক বাড়িয়েও বলেছিলাম। সেদিন আমরা ছিলাম তিনজন, বীরেশ্বর ছাড়া আর একজন, তার নাম কালিদাস দত্ত। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের নৌবিহারের মত আমরা লুকিয়ে নদীর ঘাটে পারাপারের নৌকা খুলে নিয়ে ভেসে চলেছিলাম। কালিদাস হাল ধরেছিল, মধ্যে মধ্যে বুক্নি কাটছিল গুরু গম্ভীর ভাষায়—ওটা তার বিলাস ছিল—। আজও মনে আছে সে

কথাগুলি; হঠাৎ বলে উঠল—সাবধান, দোদুল্যমান। অর্থাৎ নৌকা দুলছে। আমি ভাদুড়ী ভাইদের কথায় বলেছিলাম—এই লম্বা, কালিদাস বলেছিল—লম্বমান! মান দিয়ে কথা বলে বাক্যকে গম্ভীর করত দোদুল্যমান, ঝোঝুল্যমান, রোরুদ্যমান প্রলম্বমান, প্রকম্পমান, শেষ পর্য্যন্ত ধোধুকঁ্যমান ছোছুট্যমান, পর্য্যন্ত!

তখন পূজোর ছুটি। বাড়ী এসে দেখলাম একজন লোক বসে আছে। লোকটি ছিল সাধারণ ভদ্র আগন্তুকের বেশে পুলিশের লোক। আমাকে অনু-সরণ করেই সেখানে গিয়েছিল। বিদেশী বিপন্ন পরিচয়ে আমাদের বাড়ীতেই রইল সেদিন। কৈশোরের সরল স্বপ্নভরা মন—তাকে আশ্রয় দিয়ে কত কথা বলেছিলাম মনের আবেগে। তাকে আমার কবিতা শুনিয়েছিলাম। সেবারকার দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কবিতা। একটা লাইন আজও মনে আছে—

"মাটির হাতে আর খেলার প্রহরণ
জননী মিছে তুমি ধরো না ধরো-না।"

তারিফ তিনি খুব করেছিলেন। কিন্তু কলকাতায় ফিরবা মাত্রই আমায় পুলিশে ধরলে, সঙ্গে তিনিই ছিলেন। পূর্ণ লাহিড়ী মশায় ছিলেন—আমার পিতৃবন্ধু। তিনি আমাকে শাসন করে—বুঝিয়ে ব্যবস্থা করলেন—বাড়ীতে বন্দীত্বের। (Home internment)।

শৃঙ্খলিত হল আমার কৈশোর আমার সঙ্গে। তবু সে সেই শিকল টেনে নির্ভয়ে এগিয়ে চলল—এগিয়ে চলল যৌবনের দিকে। ১৯২১-এর দিকে। ১৯২৮-এর দিকে। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২৮ সালে সাহিত্য সাধনাকে আমার জীবন সাধনা হিসাবে গ্রহণের সূত্রপাত।

কৈশোরের সোনার আসনের স্বপ্ন আজও শেষ হয়নি। কারুরই হয় না; ওই স্বপ্নই চলে। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত চলে। স্বপ্ন চলে, সঙ্গে সঙ্গে আমি চলি, চলি আর নিজেকেই বলি—

ওরে বিহঙ্গ—ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ বন্ধ ক'রো না পাখা।

দুই

ইংরিজী ১৯১১।১২ সাল। আমার বয়স তখন চৌদ্দ পনেরো। ইংরিজী ১৮৯৮ সালে আমার জন্ম।

ওই আগুন লাগা রাত্রে আমার কৈশোর জাগল। বাড়ী ফিরে এলাম পোড়া খড় এবং কাঠের কালি মেখে; গায়ে ফোস্কা পড়েছে, কয়েক জায়গা কেটে গিয়েছে; শেষ রাত্রে তখনও মা-পিসীমা জেগে বসে রয়েছেন আমার জন্যে; আমি এসে তাঁদের সামনে দাঁড়ালাম। আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে চোখের সামনে ভাসছে যেন—তাঁদের চোখের সে বিস্ময়-জ্বল-জ্বল দৃষ্টি! যেন চারটি উজ্জ্বল দীপ-শিখা। আমার মনে আত্মপ্রত্যয়, তাঁদের চোখে বিস্ময়। কাপড়ে কালি—সর্ব্বাঙ্গে কালি—দেহের ক্ষত থেকে রক্ত তখনও গড়াচ্ছে; পোড়া জায়গাগুলি কালো হয়ে উঠেছে—তবু তাঁরা আহা-উহু বলে সমবেদনা প্রকাশ করবার মত ভাষা খুঁজে পেলেন না, চিন্তু থেকে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার দুঃসাহসিকতার পরিচয় পেয়েও, শঙ্কা প্রকাশ ক'রে তিরস্কার করতে পারলেন না; আমারও মনে এলন না কোন প্রকার অপরাধ-বোধের একবিন্দু সংকোচ। [জীবনে নিরপরাধ বা অপরাধের সঙ্গে সংস্রবহীন অসম-সাহসিকতার মধ্যে অন্যায়বোধ নেই কিন্তু অনুশোচনা-বোধ আছে।] সে বোধ অপরাধবোধের চেয়ে কম পীড়া দেয় না। সে বোধও কোন পীড়া বা লজ্জা দেয়নি সেদিন। বিজয়ী বীরের মত দাঁড়িয়েছিলাম তাঁদের সম্মুখে। সে রাত্রে স্নান করি নি, সেই কালি মেখেই বাকী রাত্রিটা শুয়েছিলাম।

যে রকম ঘরের ছেলে আমি, এবং তখনও আমাদের দেশে যে ধারা ধরণ প্রচলিত, তাতে এই ভাবে আমার কৈশোরের জাগরণ একটু বিচিত্র। তখনও আমাদের দেশের প্রচলিত ধারায় আমাদের মত ঘরের ছেলেরা, যাঁরা যুবক তাঁরা নিজের ঘরে আগুন লাগলেও পরিচ্ছন্ন ঢিলেঢালা পোষাক একটু-আধটু এঁটেসেঁটে নিয়ে নিচে দাঁড়িয়ে সাধারণ জনগণকে আগুন

নেভাতে হুকুম দেন, যারা নেভাবার কাজে ইতিমধ্যেই রত হয়েছে তাদের নির্দ্দেশ দেন—এই কর—ওই কর! ওই খানে জল দে! জল আন্! এই, দাঁড়িয়ে করছিস কি! জল আন্! রাখ গায়ের কাপড় রাখ!

অর্থাৎ জন্মগত অধিকারে অশ্বারোহী বা রথী সেনাপতি তাঁরা, দৈবক্রমে পায়ের নিচের ঘোড়া মরে গেলে বা রথখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হলে মাটিতে দাঁড়িয়ে তলোয়ার ধরেন না, সেটা মর্য্যাদায় বাধে। এইটাই হ'ল তখনকার প্রাচীন ধারাধরণের ধারাবাহিকতার স্বরূপ এবং সে ধারাবাহিকতা তখনও ক্ষুণ্ণ হয় নি। উনিশ-শো পাঁচ সাল—এর-ছ সাত বৎসর পূর্ব্বে নূতন এক যুগের সূচনা করেছে—আমরা সেই কালের বালক বলেই বোধ হয়—এমনটা সম্ভবপর হ'ল। আরও বোধ হয় একটা কারণ ছিল। বাল্যেই পিতৃহীন হয়েছিলাম, উনিশ-শো ছ' সালে আট বছর বয়সে আমার মাথার উপরের বাবার স্নেহচ্ছায়া তাঁর দেহপাতের সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়েছিল। তার ফলে আমাদের লাভপুরের প্রতিষ্ঠাদ্বন্দ্ব-জর্জ্জর সমাজের অনেক জর্জ্জরতা আমাকে আক্রমণ করেছিল। আমাকেও করেছিল—আমাদের বংশের ওই আভিজাত্যের ধারাকেও আক্রমণ করেছিল। তখন সামান্য বালক-সুলভ চাপল্য অথবা ত্রুটির জন্য আমার উপর বাক্যবাণ বর্ষিত হ'তে সুরু হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অকারণেও বাক্যবাণ বর্ষিত হ'ত। এর কতকগুলি আদিম মানুষের রচিত গুহা-চিত্রের মত আমার মনে অক্ষয় হ'য়ে আছে।

তখন বোধ করি আমার বয়স এগার কি বারো—ইস্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে, প্রাইজ পাব, ক্লাসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি। প্রাইজ উপলক্ষে আবৃত্তি করবার জন্যে আমাকে ও লক্ষ্মীনারায়ণকে দেওয়া হয়েছে স্বর্গীয়া কবি কামিনী রায়ের একলব্য নাটকের খানিকটা অংশ। আমি একলব্য—লক্ষ্মীনারায়ণ দ্রোণ। লক্ষ্মীনারায়ণ বাল্যজীবন-ভাগ্যে আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান। স্বর্গীয় যাদবলাল বাবুর দৌহিত্র, তার মামারাই তখন গ্রামের প্রধান, তার মেজমামা স্বর্গীয় অতুলশিববাবুই তখন ইস্কুলের সেক্রেটারী, তাঁর বাপ শ্বশুরকুলের সহায়তায় নিজের উদ্যমকে কল্পনাতীত সার্থকতায় সফল ক'রে তুলেছেন, সে সফলতা তখনও গতিশীল—সফলতা

সফলতরতার দিকে এগিয়ে চলেছে, তার উপর নারাণ লেখা-পড়াতেও ভাল ছেলে। আমার চেয়ে এক ক্লাস নিচে পড়ে—ক্লাসের প্রথম ছেলে সে। আদরের অজস্রতায় তার জীবন তখন নির্মেঘ শরতাকাশে পূর্ণিমারাত্রির সুধাপ্রসাদ-ধন্য পূর্ণচন্দ্রের মত। স্বভাবেও সে ওই চাঁদের মত মধুর এবং স্নিগ্ধ। পরিণত বয়সে হিসেব ক'রে দেখেছি—সে হিসেবে মনে হয়েছে যে, বাল্যের ওই সমাদরের অজস্রতাই তার চরিত্রে এ প্রসন্ন মাধুর্য্য দিয়ে গেছে। থাক সে কথা, যে কথা বলছিলাম তাই বলি। নারাণ ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু; যত প্রীতি, তত ঈর্ষা—জীবনের যত মধু যত বিষ—তার সব চেয়ে বেশী অংশটা নেয় সে, তার ও দুটোর বেশী অংশ নিই আমি; বিষ পান করেও মোহ ঘোচে না, বাড়ে;—আমরা দুজনে ইস্কুলে, ইস্কুলের বাইরে ঘরে বা মাঠে গিয়ে এই আবৃত্তি অভ্যাস করতে সুরু করলাম। এর আগে পর্য্যন্ত বরাবরই আমরা দুজনে একসঙ্গে আবৃত্তি করেছি। প্রথম বৎসর—আমরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সুরে সুর মিলিয়ে হাতজোড় ক'রে একসঙ্গে আবৃত্তি করেছি—

"সকলে দাঁড়াই এস সারি সারি হয়ে—
ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন অদ্য বিদ্যালয়ে।"

তারপর প্রতিবৎসরেই আমরা একসঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছি এবং সব চেয়ে বেশী প্রশংসা পেয়েছি। এবার প্রথম আমরা নাটকের অংশ আবৃত্তি করব। আমাদের গ্রামে তখন শখের অভিনয়ের খুব সমারোহ। অভিনয় দেখে আমরা আবৃত্তির সূত্র পেয়েছি। আমাদের উৎসাহ স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল। দুজনে পরামর্শ ক'রে নিজেদের পোষাক ঠিক করে নিলাম;—আমি একলব্য—ব্যাধের ছেলে, তপস্বী—সুতরাং আমি পরব মোটা কাপড় ও গায়ে নেব একখানি চাদর; নারাণ পরবে থান কাপড় এবং সাদা জামা। এরপর ঠিক হল—নারাণ নাট্যসম্প্রদায়ের সাজঘর থেকে—দুটি ধনুর্ব্বাণ ও তূণীর নিয়ে আসবে। একথা অবশ্য শিক্ষকদের জানানো হ'ল না। কারণ সে আমল ছিল এমন যে ইস্কুলের ছেলের হাতে খেলার অস্ত্র দেখলেও বাপপুরুষেরা এবং শিক্ষকমহাশয়েরা চমকে উঠতেন।

এ ক্ষেত্রে রাজপুরুষেরা ছিলেন সূর্য্য এবং শিক্ষক মহাশয়েরা ছিলেন বালির স্তূপ। স্থির হ'ল একেবারে আবৃত্তির সময়টিতে আমরা বেঞ্চের তলায় লুকানো যাত্রার দলের ধনুর্ব্বাণ নিয়ে বের হব। তাই-ই হ'লাম। শুধু মিলল না এক জায়গায়, দেখলাম নারাণ কোটপ্যাণ্ট এবং পাগড়ী পরে এসেছে। নারাণ ক্ষুন্ন মনেই বললে—মামারা বললেন—এই প'রে যাও। যাই হোক—প্রথমেই আমি একলব্য হিসেবে চাদর গায়ে তীর ধনুক হাতে সভামণ্ডপের ছোট আঙিনার মত স্থানটুকুতে এসে হাঁটু গেড়ে বসলাম। তারপর নারাণ এল; তারও পিঠে ধনুর্ব্বাণ। আরম্ভ হল আবৃত্তি। নিস্তব্ধ সভামণ্ডপ। এগার বারো বছরের দুটি ছেলের পক্ষে এমন প্রাণবন্ত আবৃত্তি সত্যই বিস্ময়ের কথা। আবৃত্তি শেষ হ'ল। সভামণ্ডপ হাত-তালিতে এবং প্রশংসাগুঞ্জনে ভরে গেল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন একজন প্রবীণ বাঙালী। আমি যখন ক্লাসে দ্বিতীয় হওয়ার গৌরবে পুরস্কার নেবার জন্য গিয়ে নমস্কার ক'রে দাঁড়ালাম, তখন তিনি স্মিতমুখে বললেন—তুমি তো একলব্য। প্রাণটা ভরে উঠল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এমন নিষ্ঠুর আঘাত পেলাম এই কৃতিত্বের অপরাধে যে, সে কথা মনে হলেই সমস্ত শরীরটা আমার আজও কুঁকড়ে ওঠে। অনুষ্ঠান শেষ হতেই সভামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আরও বহুজনের সপ্রশংস অভিনন্দনে অভিনন্দিত হব—এই প্রত্যাশায় ইস্কুলের বারান্দায় ইচ্ছে করেই দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের গ্রামের থিয়েটারের অভিনেতা যুবকবৃন্দের দু'তিন জন এসে আমাকে বললেন—বলিহারি, বলিহারি, একেবারে জাত ময়নার মত বুলি বললে হে!

একজন বললেন—বাস্—বাস্। এইবার ইস্তফা দাও ইস্কুলে। ঢুকে পড় থিয়েটারে। আমরা আর ছেলে খুঁজে ফিরতে পারছি না!

একজন বললেন—এই জায়গাটা যদি আরও একটু ফিলিং দিয়ে বলতে পারতে—! যিনি থিয়েটারে ঢুকতে বলেছিলেন তিনি বললেন—'ও সব ঠিক হয়ে যাবে। ফিলিংসের ওষুধ খাইয়ে দোব!' দেখিয়ে দিলেন ওষুধ খাওয়াটা ভঙ্গি করে। ওটা মদ!

আমার চোখে জল এল, মনে হ'ল ধরিত্রী দ্বিধা হ'লে তার মধ্যে লাফ

দিয়ে পড়ি! এখানেই শেষ নয়। প্রাইজের ছুটির পর ইস্কুল খুলতেই প্রথম ঘণ্টাতেই কেষ্ট চাকর এসে ডেকে নিয়ে গেল লাইব্রেরীতে। সেখানে হেডমাষ্টার মশায় মুখ লাল ক'রে বসে আছেন। নারাণও এল। কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল—ধনুর্ব্বাণ নিয়ে গিয়েছিলি কেন? Why?

···You? Why?

চুপ ক'রে রইলাম।

আবার প্রশ্ন হ'ল—কেন? কেন? কেন? You?

এবার বললাম—একলব্য—ধনুর্ব্বিদ্যাই শিখছিল—

—What? What? আমাকে শিক্ষা দিবি? You ইচড়পাকা! এ তোর বুদ্ধি! তোর! আমি আন্দাজ করেছিলাম। Yes! লাভপুরের ছেলে যে! লেখাপড়া ছাড়বি, থিয়েটার করবি, উচ্ছন্নে যাবি, তোর তো পথ সোজা, বাবা মরে গেছে, সিদে রাস্তায় ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যাবি অধঃপাতে!

এইখানে নারাণ খালাস পেয়ে গেল। সবটা ঘাড়ে পড়ল আমার। অপরাধটা শুধু থিয়েটারের অনুকরণ করার জন্য নয়—অপরাধটা গুরুতর হয়ে উঠেছে অন্যখানে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ওই খেলার তীরধনুক নিয়ে বেরিয়ে arms act-এ অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছি। কালটা তখন ১৩১৫।১৬ সাল। আলিপুর বোমার মামলার পরও কয়েকটা মামলা হয়েছে। ১৩১২ সালের তিরিশে আশ্বিন যে নবজীবনের জোয়ার এসেছিল—সে তার প্রথম আঘাতে যতটুকু ভাঙাচোরা করবার ভেঙেচুরে যতটুকু সঞ্জীবনী ঢেলে দেবার ঢেলে দিয়ে আবার একবার সরে গেছে; ভাটা পড়েছে। রাজশক্তি দুর্যোগের মেঘমুক্ত হ'য়ে তীব্রকিরণ সম্পাতে মাটির শুষে নেওয়া সঞ্জীবন রস টেনে নিচ্ছেন। লাভপুরে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সুরু হ'য়ে গেছে। এবং সুরু হয়েছে বেশ প্রবল ভাবেই। এর জন্য স্থানীয় প্রধান স্বর্গীয় যাদবলাল বাবুর উত্তরাধিকারীরা সহযোগিতা করছেন। যাদবলাল বাবুর মেজছেলে—স্বর্গীয় অতুলশিববাবু তখন প্রেসিডেণ্ট-পঞ্চায়েত এবং অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট; ভবিষ্যতে আরও অনেক রাজসম্মানের প্রত্যাশী! তাঁরা অহরহই শঙ্কিত থাকেন লাভপুরে কোথায় কখন একটি রাজদ্রোহ-সূচক বাক্য উচ্চারিত হয়

এবং তার ধ্বনি গিয়ে পৌছয় সিউড়ি সদর শহরে। কেউ যদি 'বন্দনা' শব্দটি উচ্চারণ করতে যায়—তবে 'বন্দ' পর্য্যন্ত বলতে না বলতে হাঁ—হাঁ করে ওঠেন—পাছে ওটা 'বন্দেমাতরমে' গিয়ে দাঁড়ায়। ভয় তাঁদের অপরিমিত। অন্যথায় তাঁরা আন্তরিক ভাবে বিরোধী নিশ্চয় ছিলেন না। কারণ 'স্বদেশী কাপড়ের' দোকান তাঁরাই করেছিলেন এখানে, যাতে ক'রে এ অঞ্চলের লোকে স্বদেশী কাপড় পরতে পারে। অতুলশিব বাবু হেডমাষ্টার মশায়ের অন্তরঙ্গ ছিলেন। দুজনেরই ধারণা ছিল—ইংরাজ অজেয়। এই কারণেই তাঁদের ভয় ছিল মাত্রাতিরিক্ত। ইংরাজের গুণের প্রতি শ্রদ্ধার চেয়ে ইংরাজের পুলিশী-শাসনের ভয়ঙ্করত্বই ছিল তাঁদের কাছে বড় কথা। আমাদের গ্রামে যে সখের নাট্যসম্প্রদায় স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে তার নাম দেওয়া হয়েছিল—বন্দেমাতরম থিয়েটার। যে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল—তারও নাম হয়েছিল—বন্দেমাতরম লাইব্রেরী। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'তেই ড্রপসিনে লেখা বন্দেমাতরম শব্দটি জল-সাবান দিয়ে মুছে তখন সেখানে লেখা হয়েছে—'অন্নপূর্ণা'। লাইব্রেরীর রবার স্ট্যাম্প মারা বই-গুলিতে সযত্নে কালি দিয়ে বন্দেমাতরম শব্দটি কাটা হয়েছে। ছেলেদের একটি লাঠিখেলার আখড়া হয়েছিল—একবার পুলিশ তদন্ত হ'তেই আখড়াটি উঠে গেছে। সুতরাং ভীতুস্বভাবের হেডমাষ্টার মশায়ের আমাকে arms act-এ ফেলা হয় তো স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু আমার সে বুঝবার বয়স হয় নি এবং 'বাবা মরে গেছে, ঘোড়া হাঁকিয়ে অধঃপাতে যাবি' কথাটির মধ্যে মর্মান্তিক বেদনাদায়ক শ্লেষ ছিল, তাই সেদিন আমাকে জ্বালায় অস্থির ক'রে তুলেছিল। এর পূর্ব্বে গ্রামের অগ্রজ স্থানীয় যুবকেরা যে শ্লেষ ক'রে-ছিলেন—তার সঙ্গে এর যোগ ছিল বলেই বোধ করি এতখানি অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। সেদিন হেডমাষ্টার মশায় অবশ্য মুখে শাসন করেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। ওই বয়সেই—বোধ হয় এই ঘটনার বৎসর খানেক আগে বা পরে, পূজার তিন চার দিন পূর্ব্বের ঘটনা। ইস্কুল বন্ধ হয়েছে, চারিদিকে পূজো যেন ফুলের মত ফুটতে সুরু করেছে, সকালবেলা

সেদিন আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়েছি। আমি, দ্বিজপদ, আর ষড়ানন। দ্বিজপদের কথা "আমার কালের কথা"য় বলেছি, দ্বিজপদ জীবনে অন্ধকারের মুখে ধাবমান একটি প্রচণ্ড গতিশীল উল্কা। মধ্যে মধ্যে আমার শক্তির আকর্ষণে এসে কয়েকঘণ্টা বা কয়েকদিনের জন্য আমাকে প্রদক্ষিণ ক'রে ঘুরত। তারপর আবার চলে যেত। ষড়ানন আমাদের গ্রামের ছেলে নয়, তার বাড়ী শিউড়ির উত্তরে। তার মা এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে পাচিকার কর্ম্ম নিয়ে। বিধবার একটি সন্তান। লেখাপড়া শেখেনি, শিখেছে মাছ ধরতে, শিখেছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াতে। আমাদের বাড়ীতে আসার পর তাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু ইস্কুল বা ষড়ানন পরস্পরে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে নি। ইস্কুলের ছুটি, বাড়ীর প্রাইভেট মাষ্টার মশাইও দেশে গিয়েছেন, আমরা তিনজনে শরত-প্রভাতে প্রসন্ন আলোর মধ্যে সেদিন কেমন ক'রে মিলিত হয়েছিলাম মনে নেই, তবে হয়েছিলাম, এবং ছুটির আনন্দে ছুটে বেরিয়ে গেলাম গ্রাম থেকে। আমার মনে একটি অজ্ঞাত আকর্ষণ ছিল—পশ্চিম দিকে। গ্রাম থেকে পশ্চিম মুখে বেরিয়ে গিয়েছে ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা—লুপলাইনের আমদপুর স্টেশন্। সেবার আমার মেজমামা পূজায় আমাদের বাড়ী আসবেন। তিনি তখন কলকাতায় পড়েন। কলেজ বন্ধ হলেই আসবেন কথা ছিল। তিনিই নিয়ে আসবেন আমার পূজার নূতন গরদের জামা, নূতন জুতো, সব চেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল—একখানি বাঁধানো একসারসাইজ বুক। তখন আমার গোপন সাহিত্যচর্চ্চা স্বরু হয়েছে। বাড়ীতেই একজন সঙ্গী পেয়েছি। নারাণও একজন সঙ্গী, সে ছাড়াও ইনি আর একজন, এসেছেন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। আমাদের বাড়ীতে নায়েব হ'য়ে এলেন—কালিশরণ চক্রবর্ত্তী। পাশের গ্রাম দোনাইপুরে বাড়ী; বয়স বোধ হয় পঁয়ত্রিশ, লম্বা মানুষ; অম্বলের রোগী, দাড়িগোঁফওয়ালা লোকটির সঙ্গে ভারি মিল হয়ে গেল আমার। আমার কবিতা লেখা দেখে তিনিও আমার সাথীর মত সমবয়সীর মত বললেন—আমিও পারি লিখতে।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। আপনার ছন্দে কিছু কিছু ভুল আছে। বলেন তো ঠিক ক'রে দি।

আমি তখন পূজোর পদ্য—অর্থাৎ আগমনী কবিতা লিখছি। এবং তখন আমার মধ্যে চিন্ময়ী ও মৃন্ময়ী দেবতা এক হয়ে গিয়েছেন, 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র শিশুমনেও ক্রিয়া করেছে; কবিতায় আমি দশভুজাকে আক্ষেপ ক'রে বলছি—মা, তোর পূজা করতে এত সাধক বীর দিলেন হৃদয়শোনিত ঢেলে: সুরু করেছিলাম বোধ হয় পুরু রাজা থেকে; পৃথ্বীরাজ পার হয়ে চিতোরে লক্ষণসিংহের কথা লিখছি। লিখছি—তুই মা ক্ষুধার্ত্ত হয়ে এলি—বললি "ময় ভুখা হুঁ", চাইলি রাণার দ্বাদশ পুত্র বলি; রাণা এগারটি ছেলেকে যখন যুদ্ধে পাঠালেন তোকে উৎসর্গ ক'রে, তারপর বংশের জন্য একটিকে রেখে দ্বাদশের স্থান পূরণ করলেন নিজে;—তবু তুই মা জাগলি না! আমাদের গ্রামের কবি শ্রীযুক্ত নিত্যগোপালবাবুর "দেবাসুর সংগ্রামের এই তো সময়" কবিতার সুর আমার মনে সুর বেঁধেছে! থাক সে কথা। আমি কালিশরণ-বাবুকে বললাম, কই এই জায়গাটি ঠিক ক'রে দিন দেখি! তিনি আমার কাছে জেনে নিলেন ইতিহাসের গল্পটুকু এবং আমার বলবার কথাটুকু; তারপর কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে—আমার লাইনগুলি কেটে চমৎকার ক'রে লিখে দিলেন দুটি নূতন স্তবক। এঁর সঙ্গে মিলে সাহিত্যচর্চ্চা স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে গেছে। একসারসাইজ বুকের আকর্ষণ সেইজন্যই সব চেয়ে বেশী। আদি কবি বাল্মীকি স্নানের পথে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে শরাহত হ'তে দেখে যে দিন প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন সে দিন আগে ভূর্জ্জপত্র বা তালপত্র সংগ্রহ ক'রে তবে নদীর জলে নেমেছিলেন একথা তিনি লিখে স্বীকার করে না-গেলেও অভ্রান্ত সত্য।

সেই একসারসাইজ বুকের আকর্ষণে নানা গল্পের মধ্যে প্রায় মাইল তিনেক হেঁটে গিয়ে গাছতলায় বসলাম। তারপর স্পষ্টভাষায় সঙ্গীদের কাছে প্রস্তাব করলাম, চল—আমদপুর যাই। আমার মামা আসবেন। খাতা আনবেন—জামা আনবেন—জুতো আনবেন।

দ্বিজপদ চিরকাল আমার কবিতার ভক্ত। কবিতা সে কোন দিনই

বোঝে নি জীবনে কিন্তু কবিকে সে ভালবাসত। আমার জন্য সে ওপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে; মার খেয়েছে; মেরেছে। সে সোৎসাহে বললে—চল। ষড়াননও রাজী—চল। আমদপুর আরও চার মাইল। সাত মাইল হেঁটে স্টেশনে এলাম। কলকাতার ট্রেণ চলে গেল; মামা এলেন না। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার ফিরলাম। এবার পা দুটি ক্লান্ত, সম্মুখে একসারনাইজ বুকের হাতছানি নাই; শরতের প্রভাত প্রসন্ন হলেও মধ্যাহ্ন প্রখর, তখন সেই মধ্যাহ্নকাল, পথে বীরভূমের রাঙা মাটির লাল ধুলা। বেলা একটা নাগাদ প্রখরতায় ক্লিষ্ট হয়ে সর্ব্বাঙ্গে লাল ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে বাড়ী এসে পৌছুলাম। তখন বাড়ীতে কলরব কোলাহল পড়ে গেছে। সকাল বেলা বেরিয়ে বেলা একটা পর্য্যন্ত আমার অনুপস্থিতি একটা অতি অস্বাভাবিক ব্যাপার। এগারটা থেকেই খোঁজ হয়েছে। বারোটা নাগাদ প্রকাশ পেয়েছে যে, আমাদের দেখা গেছে সুঁদপুরের বটতলার কাছে আমদপুরের পথে। আমাদের গ্রামেরই একজন মুসলমান গাড়োয়ান আমদপুর থেকে ফেরার পথে দেখেছিল, সেই সংবাদ দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কলরব সুরু করেছেন আমার পিসীমা। এই রৌদ্র—এই এতটা পথ—এই আশ্বিন মাস—মাত্র এগার বার বছরের ছেলে—ফিরবে কি ক'রে?

তিনি ছুটে গেলেন নারানদের বাড়ী। নারানদের তখন লাভপুরে ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবসা ছিল। লাভপুর থেকে আমদপুর যাত্রীদের ট্রেণ ধরিয়ে দিত—আমদপুর থেকে যাত্রী নিয়ে আসত লাভপুর। সেই গাড়ীর জন্য গেলেন। গাড়ীখানি চাই, যা ভাড়া লাগে দেবেন। কিন্তু গাড়ীখানি তখন মাত্র ঘণ্টাখানেক আগেই আমদপুর থেকে এসেছে। ঘোড়া দুটি ক্লান্ত। কাজেই তাঁরা ইতস্তত করলেন। অবশেষে রাজী হলেন। এই কথাবার্ত্তার অবসরে বাড়ীর ভিতরের কয়েকটি কথা আমার পিসীমার কানে পৌছুল—নারানের-মা নারানকে বলছেন—আর খেলা করবি তারাশঙ্করের সঙ্গে? যাবি? মিশবি? ভাল ছেলে—ভাল ছেলে! হ'ল তো ভাল ছেলে? খবরদার, যাবি নে আর। আজ আমদপুর পালিয়েছে, কাল দিল্লী লাহোর পালাবে ও ছেলে।

কথাটা তাঁর কথা নয়, তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন, নারানের মতই ভালবাসতেন ; কিন্তু কথাটা ইতিমধ্যেই গ্রামে এমনি রটে গিয়েছে, যে তিনি তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি। লোকে এইটুকু সময়ের মধ্যেই বলতে স্বরু করছে—"বাপ মরে গেছে, মাথার উপর মুরুব্বি নেই, ও ছেলে ক'দিন ভাল থাকবে—বখে গিয়েছে, আজ আমদপুর গিয়েছে, কাল যাবে দিল্লী-লাহোর!"

গ্রামের লোকেরও বোধ হয় দোষ ছিল না; কারণ তখন আমাদের গ্রামের সন্ত যুবকদের মধ্যে বাপমার বাক্স ভেঙে টাকা সংগ্রহ ক'রে কলকাতা পালানো একটা নিয়মিত ঘটনায় দাঁড়িয়েছিল। আমাদের বাড়ীর উত্তর-পূর্ব্ব দিকের বাড়ী, আমাদেরই দৌহিত্র বংশের একটি শাখার বাড়ী এবং দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে আর এক দৌহিত্র বংশের বাড়ী। একবাড়ীর ছেলে নিত্যগোপাল-বাবু, খোকা, অন্যবাড়ীর ছেলে ষষ্ঠী। "আমার কালের কথা"র মধ্যে এদের পরিচয় দিয়েছি। নিত্যগোপালবাবুর আর এক খুড়তুত ভাই ছিল। রামগোপাল। বসিষষ্ঠীর সহোদর ছিল রাধাশ্যাম। রামগোপাল এবং খোকা—এদের দুজনকে কলকাতায় পড়তে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের অভিভাবকেরা। তারা দুজনেই বাসা থেকে ইস্কুল বেরিয়ে নিখোঁজ হ'তে স্বরু করেছে তখন। খোঁজ পেতে অবশ্য বেগ পেতে হ'ত না, দেশেই তারা পালিয়ে আসত। ওদিকে রাধাশ্যাম—আমি বলতাম রাধা দাদা—তখন বাক্স খোলা পেলেই টাকা সংগ্রহ ক'রে দেশ থেকে কলকাতা ছুটতে স্বরু করেছে। শুধু ওই দুই বাড়ীতেই নয়, আরও কয়েকজন তখন এমনই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারা সেই অনুযায়ী বিচার ক'রে স্থির ক'রেছে আমি ব'য়ে গিয়েছি। একটি বালক-চিত্তের বিচিত্র অভিলাষ পূর্ণ করবার আকুলতার মূলে যে কি অভিলাষ ছিল তা তাঁরা জানতেনও না, জানবার চেষ্টা করার প্রয়োজনই বা কি তাঁদের! দেশ-কালের ধারা ও পরিণতি অনুযায়ী ওই মন্তব্যেই গ্রামখানাকে ভরে দিলেন।

যাই হোক—গাড়ীতে ঘোড়া জোতা হচ্ছে এমন সময় আমরা আবির্ভূত হ'লাম তিন জনে। সঙ্গে সঙ্গে ওই বাক্যবাণাহত পিসীমা আহতা ব্যাঘ্রীর

মত আমাকে আক্রমণ করলেন। যত প্রহার করলেন তার চেয়ে বেশী কাঁদলেন। আর বারবার বললেন, শুনে আয় গ্রামের এ মুড়ো (অর্থাৎ মাথা) থেকে ও মুড়ো পর্য্যন্ত লোকে কি বলছে, শুনে আয়! সকলে একবাক্যে বলছে, উচ্ছন্ন গিয়েছে ব'য়ে গিয়েছে! কথাটা তীরের মতই বিঁধেছিল।

আরও কিছুদিন পর, সেও এক প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন অনুষ্ঠানের দিনের ঘটনা। তখন জেলাশাসক অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্বর্গীয় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর। তখনকার দিনে নামকরা জেলা শাসক। ইংরেজি ফ্যাশনে ঘাড় চেঁচে যে সব ছেলে চুল কাটে—তাদের ডেকে বিদ্যাবত্তার তথ্য জেনে নেন, যার সে গৌরব নাই তাদের চুল কেটে ফেলতে বলেন। যাদের আছে—তাদের তারিফ করেন। সাধারণ পোষাকে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে কনষ্টবলদের ঘুষ নেওয়া ধরেন। স্টেশনে থার্ডক্লাস বুকিং-এর জানালায় যাত্রীদের সঙ্গে টিকিট মাস্টারের ব্যবহার লক্ষ্য করেন। কোথায় গ্রামে অস্বাস্থ্যকর ডোবা সারডোবা আছে খুঁজে বেড়ান, সেগুলিকে বন্ধ করতে বাধ্য করেন। ইংরেজের ছকা শাসন পদ্ধতির মধ্যেও শাসনকর্ম্ম ছাড়া সংস্কার কর্ম্মে তাঁর স্পৃহা ছিল। ইস্কুলের অনুষ্ঠানের পর তিনি আমাদের পাড়ায় এলেন। আমাদের পাড়ার মূল রাস্তাটি অতি সঙ্কীর্ণ ছিল—আজও আছে, তিনি সেই রাস্তাটিকে কিছুটা প্রশস্ত করবার অভিপ্রায়ে এসেছিলেন। রাস্তার দুপাশে বসত বাড়ী। বাড়ী-ঘরের ক্ষতি না-করে ভিত-দাওয়া-সিঁড়ি কেটে রাস্তাটিকে প্রশস্ত করবেন এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। প্রত্যেক গৃহস্বামীকে ডেকে তিনি খানিকটা এমনই সীমানা চেয়ে নিচ্ছিলেন। আমাদের বৈঠকখানা বা কাছারী-বাড়ী রাস্তার ধারে। প্রথমেই মাঝখানে সিঁড়ির দু'পাশে দুটি আট-দশ ফুট চওড়া দাওয়া, তারপর বারান্দা। বাড়ীর সম্মুখে প্রায় দু বিঘে জায়গায় বাগান ও খামার বাড়ী। তার একপাশের পাঁচীল চলে গিয়েছে রাস্তার পাশে পাশে। পাঁচিলের পাশে ভিতে প্রায় পাঁচ ছ'ফুট জায়গা পড়ে আছে। অমৃতলালবাবু আমাদের বৈঠকখানার সামনে এসে প্রশ্ন করলেন—এ বাড়ী কার?

পরিচয় দিলেন নির্ম্মলশিববাবু, তখন তাঁর মেজদাদা গত হয়েছেন—তিনিই তাঁর স্থান গ্রহণ করেছেন। তিনিই তখন প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত—অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট—জেলার সাহেবসুবাদের প্রিয়পাত্র। তিনি বললেন—না-বালকের বাড়ী। ইত্যাদি—ইত্যাদি! ইতিমধ্যে আমি বেরিয়ে এলাম বাড়ীর ভেতর থেকে। নির্ম্মলশিববাবু বললেন—এই যে!

অমৃতলালবাবু আমাকে দেখেই বললেন—ও! এই যে দেখছি King!

প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষ্যে—ঘণ্টা দুয়েক আগেই আমি এবং নারান আবৃত্তি করেছি একসঙ্গে; সেবার আবৃত্তির বিষয় ছিল—**King and the Miller.** সেবারও আমাদের আবৃত্তিই সব চেয়ে ভাল হয়েছিল এবং আমিই শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছিলাম।

আমি নমস্কার ক'রে দাঁড়ালাম। তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—King, খানিকটা জায়গা দিতে হবে। তোমার দাওয়াটার অর্দ্ধেকটা আর পাঁচিলের বাইরের জায়গাটা রাস্তার জন্যে দিতে হবে।

আমি বললাম—নিন।

তিনি বোধ হয় এক কথায় এমন উত্তর প্রত্যাশা করেন নি। সম্ভবত—অন্য স্থানগুলির অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যাশা করেন নি। সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—এক কথায় দিয়ে দিলে?

আমি এ কথার জবাব দিতে পারি নি, খুঁজে পাই নি, শুধু প্রসন্নমুখেই তাঁর দিকে চেয়ে ছিলাম। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—নিই তা হ'লে? এরপর মনে মনে বলবে তো লোকটা কি দুষ্টু?

—না। তা বলব না।

এরপর তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে পাশে নিয়েই এগিয়ে চললেন। চলতে চলতে কি তাঁর মনে হ'ল, তিনি বললেন—না। তোমার জায়গা আমি নেব না। তুমি বড় হয়ে নিজে দিও।

সে দেওয়ার ভাগ্য আজও আমার হয় নি, কারণ নেবার মানুষ কেউ নাই। দাবী কেউ জানায় নি। গ্রহীতা নাই।

এ ব্যাপারেও কিন্তু রটল—আমি ইঁচড়ে পেকেছি। এই কিশোর বয়সেই

বংশগত আভিজাত্যের ঢলঢলে জুতো এবং জামা প'রে নিতান্ত অশোভন ভাবেই গ্রামের বয়স্কদের হটিয়ে সাহেবের পাশেপাশে চলার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেছি, আর আমার ভবিষ্যতের কোন প্রত্যাশা নাই। পড়াশুনা ছেড়ে জমিদারী সেরেস্তার মধ্যে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলেই হয়!

এমনি করেই একটি ধারাবাহিক অধঃপতনে যাচ্ছি বা গিয়েছি বা যাব এই দুর্ণাম রটনাই আমাকে বোধ হয় সুনামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। যত অপবাদ রটেছে ততই আমি চেষ্টা করেছি সুবাদ সুখ্যাতি অর্জ্জন করতে।

এর প্রতিক্রিয়ায় বিপরীত পথে যাবারও সুযোগ ছিল যথেষ্ট এবং সে পথও তখন পর্য্যন্ত সুগম ও প্রশস্তই ছিল। আমার শৈশবের কথায় সে কালের কথার মধ্যে তার পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু আমার মা ছিলেন আমার [illegible]। আর আমার বাবার আধ্যাত্মিক ভাবগম্ভীরতার প্রভাবও আমার উপর পড়েছিল। তাই সুগম এবং প্রশস্ত পথে না ছুটে দুর্গম পথেই আমার জীবন মোড় নিয়েছিল।

আর সব চেয়ে বড় কারণ ছিল—নবযুগের ধর্ম্ম।

মহাকাল নূতন যুগে বেশ পরিবর্ত্তন করলেন, রূপান্তর গ্রহণ করলেন। ১৯০৫ সাল নিয়ে এল নূতন দৃষ্টি, নূতন উপলব্ধি, নূতন ভাবধারা।

জাহ্নবী যেন মাঝখানে ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শুনতে না পেয়ে পথভ্রান্তের শঙ্খধ্বনির পিছনে পিছনে ছুটেছিলেন, ভগীরথ আবার ফেরালেন তার মোড়; কীর্ত্তিনাশিনী পদ্মাবতীর জলধারার প্রবাহ থামল না, কিন্তু নূতন ভাগীরথী আপন পথে প্রবাহিত হলেন।

আমাদের গ্রামে ১৯০৫ সালের প্রতিক্রিয়া প্রবল হয়েছিল। থিয়েটারের ড্রপসিন থেকে, গ্রন্থাগারের রবার ষ্টাম্প থেকে বন্দেমাতরম শব্দ মুছে দেওয়া হয়েছিল, কেটে দেওয়া হয়েছিল। নির্ম্মলশিববাবুরা জেলাশাসকদের সহযোগিতা করে রাজভক্ত বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

[illegible]কে পুলিশ বিভাগে চাকরী নিতে হয়েছিল। তিনি

দেশপ্রেমমূলক কবিতা লেখাও হয়তো বন্ধ করেছিলেন কিন্তু মহাকালের নব আবির্ভাবের প্রভাব রুদ্ধ হয় নি!

সে কি হয়?

নিত্যগোপালবাবুই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দরিদ্রভাণ্ডার। ওই দরিদ্র-ভাণ্ডারের মধ্যেই আগুন-নেভানোর ব্যবস্থা হয়েছিল পরবর্তী কালে। ওই ব্যবস্থার সূত্র ধরে সে-দিন অন্ধকার রাত্রে একলা বেরিয়ে গিয়েছিলাম ছুটে।

আমাদের বাড়ীর গলিপথে জেঠামশায়দের বাড়ীর ডুমুর গাছে ভূতের প্রবাদ ছিল, শিউলি গাছে, 'কালপুরুষের' আসন ছিল, গলির দু পাশে রাত্রে শন-শন শব্দ তুলে গোখুরা বিচরণ করত। সন্ধ্যা হলে ওই গলিপথ আমার কাছে ছিল ভয়ঙ্করের লীলাপথ। আমি গলির মুখে—ষষ্ঠীদের বাড়ীতে ঢুকে বলতাম—আমায় একটু দাঁড়িয়ে দাও গো।

সে দিনও সন্ধ্যাবেলা সে বাড়ীর একজন আলো হাতে আমার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে। সেই দিন গভীর রাত্রে কার আহ্বানে সেই পথে একা ছুটে বেরিয়ে গেলাম, আগুন নিভিয়ে ফিরলাম। ফিরবার সময় একবার থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর সাপের জন্য হাতে তালি দিতে একাই বাড়ী ফিরলাম। নির্ভয়ে!

কৈশোর জাগল। মহাকাল যে নবযুগ এনেছিলেন, প্রতিক্রিয়ায় সে যুগের ধর্ম্ম,—মহাকালের প্রসাদ—অন্যে গ্রহণ করতে ভয় করেছিল—কিন্তু আমি দুহাত পেতে গ্রহণ করেছি!

তিন

আমার কৈশোরের কাল ধর্ম্মের কথা বলেছি। এবার বলব পটভূমির কথা। আমার কৈশোরের পটভূমি আমাদের গ্রামের স্কুল। প্রাচীন গ্রাম; প্রাচীন কালে আমাদের ও অঞ্চলে সমগ্র রাঢ়ভূমিতেই পাকা বাড়ী একরকম ছিলই না। মাটিকে পুড়িয়ে ইট করার কল্পনায় তাঁরা শিউরে উঠতেন। বলতেন, মা বসুমতীকে পোড়ানো? সে সহ্য হবে না বলেই অনেকের

বিশ্বাস ছিল। ইট পুড়িয়ে একমাত্র দেবমন্দির তৈরী করতে বাধত না। গোটা রাঢ় ভূমিতেই প্রাচীন কালের বসবাসের পুরাণো ইমারত প্রায় দেখা যায় না। মুসলমান আমলের নবাবদের ইমারত আছে। রাজরাজড়াদের যে ইমারতগুলি আছে তার কিছু পুরাতন—অধিকাংশই আধুনিক কালের। সে কালও যে গণনায় কতকাল পিছনে যাবে—অর্থাৎ পলাশীর ওপারে যাবে কিনা বলতে পারি না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের ছিল না বলেই মনে হয়। ইংরাজ রাজত্ব কায়েম হওয়ার পরই পাকাবাড়ীর রেওয়াজ গ্রামাঞ্চলে দেখা গিয়েছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যাঁরা তাঁরা জমিদার হয়েছেন ইংরেজ আমলে, লর্ড কর্ণওয়ালিশ সাহেবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ার পর। এক সময় যখন আমাদের অঞ্চলে পদব্রজে ঘুরেছি তখন বিস্মিত হয়েছি কোথাও পুরাণো কালের ভাঙা ইমারতের সন্ধান না পেয়ে। পরে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনায় একদিন পেলাম ঠিক এই কথা। সে কালে বসবাসের জন্য পাকাবাড়ীর রেওয়াজ ছিল না। এক দেবগৃহ ছাড়া পাকাবাড়ী নির্ম্মাণের পথে সংস্কারের বাধা ছিল।

আমাদের দেশে বলে 'ডাকপুরুষের কথা'—অর্থাৎ প্রবচন, সেই প্রবচনে আছে 'যেমন তেমন ঘর, খান পাঁচ ছয় কর'। একখানা বড় ঘর, দশ বারো কুঠুরীওয়ালা ঘর করো না, তিন-চারখানা কুঠুরীওয়ালা ঘর করবে। বড় ঘরের বিপদ হল ঘরটা যদি ফাটে তবে গোটাটাই গেল, তার চেয়ে বড় কথা ছেলেদের মধ্যে ভাগ হবে, বড় ঘরের মধ্যে কুঠুরী ভাগ করে নিয়ে বসবাসে ঠিক স্বাতন্ত্র্য আসবে না, শান্তিও না। তারও চেয়ে বড় কথা লক্ষ্মী চঞ্চলা, আজ এসেছেন বলে চিরদিন থাকবেন না; কাল যদি তিনি চলেই যান তবে ওই বড় বাড়ী তোমার ঘাড়ে চাপবে ঘটোৎকচের মত। কর্ণওয়ালিশ সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করে এতে কিছু ব্যতিক্রম ঘটালেন। বড় বড় জমিদারী ভেঙে ছোট ছোট লাট তৌজি বিলি হ'ল, তার ওপর পত্তনী, দর-পত্তনী সে-পত্তনি প্রভৃতি স্বত্ব সৃষ্টির ফলে জমিদারের অধীনে উপ-জমিদার, উপ-উপ-জমিদার আবির্ভূত হলেন সমাজে; ওদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে চঞ্চলা লক্ষ্মীর পা দুটিও ভারী হয়ে উঠল;

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ওজনেভারী পিতলের নূপুর পরে মা লক্ষ্মী একদিকে তার ঝমর-ঝমর শব্দের গরবে গরবিনী হয়ে উঠলেন অন্যদিকে ওই ভাবে চলা-ফেরা কম করতে বাধ্য হলেন। বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা সাধক কবি কণ্ঠমশায় অর্থাৎ নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মশায় গান বাঁধলেন—'আগে করবে জমিদারী তবে করবে পাকাবাড়ী।' প্রবচনটা গানের কলিতে সংশোধিত হ'ল।

তা হ'লেও দেশে তখনও পর্য্যন্ত আগেকার রেওয়াজই চলে আসছিল। পাকাবাড়ীর সংখ্যা কমই ছিল আমাদের গ্রামে। খুব দরকারও ছিল না আমাদের দেশে পাকাবাড়ীর। আমাদের দেশে মাটির কোঠা বাড়ী পাকাবাড়ীর চেয়েও আরামপ্রদ, এবং মজবুতও কম নয়। রবীন্দ্রনাথ—আমাদের দেশের মাটির বাড়ীর স্থায়িত্ব এবং আরাম দেখে ওই বাড়ী তৈয়ারীর ধরণ উন্নত করতেই 'শ্যামলী' তৈরী করার কল্পনা করেছিলেন। যাক। আমাদের মাটির দেওয়াল খড়ের চাল বসতির দেশে—ইস্কুল, বোর্ডিং ডিসপেন্সারীর পাকাবাড়ীগুলি একটি মনোহর নবরাজ্যের সৃষ্টি করলে।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে পড়েছিল একটা ধূ-ধূ করা প্রান্তর, সেইখানে পাকা ইমারতের যে শোভা গড়ে উঠল তাকে আমাদের ওখানে লোকে বলত ইন্দ্রভুবন। সত্যসত্যই থাম ও রেলিঙ ঘেরা, বারান্দাওয়ালা ডিসপেন্সারী বাড়ী, লম্বা একটানা বোর্ডিং-বাড়ী, তার ওপাশে রাণীগঞ্জ টালিতে ছাওয়া চতুষ্পাঠী, চারিপাশে আমবাগান পুকুর-এর এমনই একটা মনোহর শোভা ছিল যাতে আমাদের কিশোর চিত্ত ভ'রে উঠত।

তখন আমাদের নিকটতম রেল স্টেশন ছিল আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে সাতমাইল দূরে লুপলাইনে আমদপুর। সিউড়ি আমাদের সদর শহর, সেও পশ্চিম দিকে। যত লোকজন আমাদের গ্রামে আসতেন তাঁদের একশ জনের মধ্যে আশীজন আসতেন পশ্চিম দিক থেকে। প্রথমেই তাঁদের চোখে পড়ত এই ইস্কুল ডিসপেন্সারী বোর্ডিংয়ের শোভা। সকলে মুগ্ধ হয়ে যেতেন, মনে হ'ত তাঁদের যে—কোন শহরে এসেছেন।

বোর্ডিংয়ে ফটকের মুখেই চেয়ার বেঞ্চ পেতে আসর জমিয়ে বসে

থাকতেন—হেডমাস্টার শশীভূষণ নিয়োগী। লম্বা মানুষ, শীর্ণ শরীর, প্রথম জীবনে দাড়িগোঁফ ছিল। বসে হুঁকোয় তামাক খেতেন। তামাকে তাঁর বিলাস ছিল। ভুর ভুর করে এমন মিষ্টি গন্ধ উঠত যে ছেলেরাও বুকভরে নিশ্বাস নিয়ে ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন করে নিত। তামাক শেষ হলেই হেডমাস্টার মশায় ডাকতেন—কেষ্ট, কেষ্ট! তামাক! কেষ্ট ছিল ইস্কুল ও বোর্ডিংয়ের চাকর। ছেলেদের সে খুব ভালবাসত। হেডমাস্টার মশায় ছড়ি হাতে বা গাড়ু হাতে বের হয়ে গেলেই ছুটে আসত ছেলেরা। বড় বড় ছেলেরা। কেষ্ট তামাক, খানিকটা তামাক! দরজা খোলা পেলে চুরির বদলে ডকোতি সুরু করে দিত। কেষ্ট সভয়ে বলত—ওগো, আর না, আর না। এই দেখ! আর না।

তখনকার দিনে তামাক খাওয়াটা হাতে খড়ির সঙ্গে না হোক, পাঠশালাতেই সুরু হ'ত। শরৎচন্দ্রের দেবদাসে পাঠশালার চিত্রটুকু নিখুঁত। জীবনে পার্ব্বতী কদাচিৎ সত্য কিন্তু হুঁকো কল্কে প্রায় সার্ব্বজনীন সত্য। আমাদের বয়সীদের সংখ্যা গ্রামে ছিল জন তিরিশেক তো বটেই। তিরিশ জনের মধ্যে সাতাশ জন পাঠশালাতেই তামাক খাওয়া সুরু করেছিল। বাদ ছিল তিন জন। আমি, নারান, আর ছকু বা গৌরীবিলাস। আমি এবং নারাণ দুজনে পাঠশালায় যাই নি। একেবারেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলাম। গৌরীবিলাস 'নন্দমশায়ের' পাঠশালা ফিরে এসেছিল। আমাদের মধ্যে নারান ইস্কুল জীবনে বোধহয় ফোর্থ ক্লাস বা ক্লাস সেভন থেকেই ধরেছিল তামাক সিগারেট। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যারা তাদের তো কথাই নেই। তাদের কথাই বলছি। তারাই হেডমাস্টার মশায়ের তামাক ডাকাতি করত।

হেডমাস্টার মশায়ও মধ্যে মধ্যে জেলখানার জমাদারনীর মত বোর্ডিং খানা-তল্লাস করতেন; বে-আইনি মাল ছিল—হুঁকো কল্কে, তামাক টিকে, নভেল নাটক। একেবারে বিশপঁচিশটা হুঁকো, সের তিনচার তামাক, গাদাখানেক নভেল নাটক কেষ্ট ঘাড়ে করে এনে তুলত মাস্টার মশায়ের ঘরে। বোর্ডিং-এ ছাত্র সংখ্যা ছিল জন পঞ্চাশেক, কুড়িটা হুঁকোই তাদের

পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এক হুঁকোতেই প্রায় সকলেই তামাক খেত। বোধকার জাতিভেদের ভিত্তিটা প্রথম নড়েছে হুঁকোর খোঁচায়। মাস্টার মশায় বিজয়দর্পে ফিরে আসতেন আর চীৎকার করতেন সরু গলায়,—তাঁর গলার আওয়াজ ভরাট ছিল না—চীৎকার করতেন—নিকাল যাও, আভি নিকাল যাও হামারা হিঁয়াসে। নেহি মাংতা হ্যায়। দুষ্ট গরু থেকে শূন্য গোয়াল ভাল, চাই না তাঁর এই সব তামাক খাওয়া ছাত্র, চলে যাক সব—তিনি চেয়ার বেঞ্চ দেওয়ালকে পড়াবেন। তারপর বের হ'ত ফাইনের লিষ্ট।

একজন ছাত্র ছিল নলিন মুখুজ্জে। সকলে তাকে বলত 'নলে ক্ষ্যাপা'। নলিন ক্ষ্যাপা ছিল না, পরবর্ত্তী কালে তার মত বিচক্ষণ সুদখোর মহাজন এবং কুটিল বিষয়ী দেখা যায় নি। সে ক্ষ্যাপামির অভিনয় করত এবং সার্থক অভিনয়। সে ছিল একজন বড়দরের তামাকখোর। ফোর্থ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছে, বয়স বোধ হয় বিশ, আঠারোর নিচে তো নয়ই;—খানা-তল্লাসীর আগে কেষ্ট খবর দিয়ে যেত, সেদিন কেষ্টকেও খবর না দিয়ে হেডমাস্টার এসেছিলেন, কাজেই গোটা বোর্ডিংয়ের সমস্ত বামাল ধরা পড়েছে। এবং হুঁকোগুলো মাস্টার মশায় নিয়ে আসেন—আর কেষ্ট চুপিসারে আবার যথাস্থানে পৌঁছে দেয়—এই জন্য মাস্টার মশায় সেদিন ঘরে তালা এঁটে চাবী নিজের কাছে রেখেছেন। ভয়ানক কড়া ব্যবস্থা সেদিন। মাস্টার মশায় কঠিন হয়ে বসে আছেন। ঘণ্টা কয়েক কাটল। রাত্রে খাওয়ার সময় মাস্টার মশায় তামাকখাওয়ার কুফল সম্বন্ধে একটি বক্তৃতাও দিলেন; এবং আশা করলেন সকলেই আজ থেকে তামাক ছেড়ে দিলে। ছেলেরা চুপ করেই রইল। মৌনতা সম্মতিসূচক ধরে নিয়ে হৃষ্টও হলেন তিনি। নিজের ঘরে ফিরে তিনি তামাক খেতে বসলেন। হঠাৎ ক্রন্দনধ্বনিতে বোর্ডিংটা কেঁপে উঠল। প্রবল যন্ত্রণায় কেউ চীৎকার করে কাঁদছে। কার কি হ'ল?

ছুটে গেলেন মাস্টার মশায়।

নলিন ছটফট ক'রছে এবং চীৎকার ক'রে কাঁদছে।—মরে গেলাম, ওরে বাবারে! ওঃ! ওঃ! মরে যাব আমি! আ—।

—কি হ'ল? এই নলিন? কি হয়েছে।

পেটে হাত দিলে নলিন।

—পেট কামড়াচ্ছে? মাস্টার মশায় প্রশ্ন করলেন।

সবেগে ঘাড় আন্দোলিত করে নলিন জানালে—না।

—তবে?

—কেঁপে উঠেছে। ফুলে উঠেছে।

—কেঁপে উঠেছে, ফুলে উঠেছে?

—দম বন্ধ হয়ে যাবে। ও মা গো!

—কেন হ'ল এমন? কি খেয়েছিস?

—কিছু না।

—তবে?

—তামাক। একটান তামাক! ভাত খেয়ে তামাক না খেয়ে পেট কেঁপে উঠেছে। ওরে মা রে! ছটফট করে নলিন ঘরের এদিক থেকে ওদিকে গড়িয়ে চলে গেল।

মাস্টার মহাশয় পালিয়ে এলেন। ডাকলেন—কেষ্ট! কেষ্ট!

—আজ্ঞে।

—ব্র্যাকেটার হুঁকো কল্কে দিয়ে এস। জলদি! জলদি!

চাবী ফেলে দিলেন। তারপর আবার বললেন—দাঁড়াও।

—আজ্ঞে।

—সব, সব হুঁকোগুলো দিয়ে এস। তামাক টিকে কল্কে সব।

তাঁর ভয় হ'ল। নলিন থামবে কিন্তু বাকী উনপঞ্চাশটা ছেলে উনপঞ্চাশ পবনের মত ফাঁপা পেটের বায়ু উদ্গীরণ করে একটা প্রলয় ঝড় বইয়ে দেবে।

এমনি ধরণের অনেক ব্যাপারই ছিল সে সময়। একালের কল্পনায় সেকালের ছেলেদের অদ্ভুত মনে হবে। একটি ছাত্র ছিল রাধারমণ শর। হেডমাস্টার মহাশয়ের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিল সে। অবাধ কর্তৃত্ব করত হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরে। রাধারমণের মস্তিষ্কে খানিকটা বিকৃতি ছিল।

দু তিনবার সে সত্যসত্যই পাগল হয়েছিল। রাধারমণ আমার থেকে বয়সে অনেক বড়, বোধ হয় ছ সাত বছরের বড়, ছেলে বেলায় এই ছ সাত বছরটা অনেক দীর্ঘকাল; আমার তখন সবে কৈশোর সুরু হয়েছে, রাধারমণ তখন যৌবনে প্রবেশ করছে, ছাত্র জীবনে সে সঠিক কেমন ছিল জানিনা, তবে উত্তরকালে তার সঙ্গে কিছুদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি, তখন দেখেছে অপরূপ মানুষ রাধামণ। এমন সৎ-সেবাপরায়ণ স্পষ্টভাষী মানুষ কমই দেখা যায় সংসারে। বোধ হয় সেই কারণেই সে হেডমাস্টার মশায়ের প্রিয়পাত্র ছিল।

আমাদের ইস্কুলে নতুন থার্ডমাস্টার এলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আগুনের শিখার মত দীপ্ত একটি যুবা। নূতন কালের ভাবধারা জীবনের কানায় কানায় ভরে নিয়ে এসেছেন। দ্বিজেন বাবু ইস্কুলে এলেন—কোট-প্যাণ্ট প'রে। সারা ইস্কুলটায় যেন মাছি ভন-ভন ক'রে উঠল। চাল! নতুন চাল মারতে এসেছে রে!

রাধারমণ সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। সে হঠাৎ ক্লাস থেকে উঠে চলে গেল হেডমাস্টারের কাছে। একবার ঘরের চাবীটা চাই।

বিনা প্রশ্নে মাস্টার মশাই চাবী দিলেন। রাধারমণ চাবী নিয়ে হেড-মাস্টার মশায়ের ঘরে গিয়ে তাঁর পুরাণো চাপকান এবং প্যাণ্ট প'রে ক্লাসে এসে গম্ভীর মুখে বসল। বিপদে অবশ্য পড়ল কিন্তু দমল না। পরের ঘণ্টায় দ্বিজেন বাবু ক্লাসে এসে চাপকানধারী ছাত্রটিকে একটি বিশিষ্ট ছাত্র ধরে নিয়ে—বহু প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করলেন। রাধারমণ নিরুত্তর হয়ে বসে রইল।

আমাদের ক্লাসের কথা বলি।

আমার ইস্কুল জীবন যখন সুরু হয় তখন ক্লাসে আমরা তিনজন ছাত্র। আমি, প্রতুল, এবং শিবকৃষ্ণ—আমরা বলতাম শিবকেষ্ট।

প্রতুল ডবল প্রমোশন নিলে, তার পরবারই ফেল হল, সেবার তবুও তাকে প্রমোশন দেওয়া হল, তারপর আবার ফেল হ'ল, আবার হ'ল, আবার হ'ল, আমার থেকে ক্লাস দুই পিছিয়ে গেল।

শিবকেষ্ট প্রথম বছরেই ফেল হ'ল, তবুও সেবার প্রমোশন পেলে। আমাদের

উপরের ক্লাসের দুজন ফেল হয়ে সঙ্গী হ'ল, খুদিরাম সাহা, পঞ্চানন সাহা। আমার চেয়ে বয়সে বড়, দুজনেই আমাদের গ্রামের সাহা বংশের ছেলে। ক্লাসটা ছিল—বোধ হয়—ক্লাস থ্রি—তখন বলা হ'ত এইট্‌থ্‌ ক্লাস বি। লোয়ার প্রাইমারী শেষ ক'রে এল আরও দুজন নতুন ছেলে, ঠাকুরদাস পাল শ্রীকৃষ্ণ পাল। পাশের গ্রামের দুটি ছেলে—খুড়ো আর ভাইপো। ঠাকুরদাস প্রিয়দর্শন বুদ্ধিমান, শ্রীকৃষ্ণের মোটা মোটা গড়ন, বলিষ্ঠ দেহ—সে যেন মূর্তিমান স্থূলতা।

খুদিরাম ও পঞ্চানন এরা দুজনেও ছিল মারাত্মক রকমের স্থূলবুদ্ধি। শিবকৃষ্ণেরও ঠিক তাই। অথচ এই চারজনই সংসার-জীবনে সাফল্য লাভ করে গেছে। খুদিরাম ও পঞ্চানন সাহা, জাতিতে শৌণ্ডিক—পঁচুই মদের ব্যবসায় করত। সে ব্যবসা তারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যবসায়ীর মত পরিচালনা করেছে। কিন্তু কি কারণে জানি না, লেখাপড়ার সঙ্গে একটা বিরোধ তাদের জন্মেছিল। ঠাকুরদাস বুদ্ধিমান ছেলে ছিল, কিছুদূর উপরে উঠে ইংরেজীতে তার কিছু অসুবিধা ঘটেছিল—অন্য বিষয়ে সে ভালই ছিল, কিন্তু বোধ হয় সাংসারিক অসুবিধায় পড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। যাক, পরের কথা পরে। নতুন ক্লাসে—মাস্টার এলেন নতুন। তিনজনকে মনে পড়ছে। কান্তি মাস্টার অঙ্ক কষাতেন। পঞ্চানন পণ্ডিত বাংলা পড়াতেন। রজনী মাস্টার পড়াতেন ইংরেজী আর ইতিহাস। কান্তি মাস্টার ছিলেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত। আমাদের ইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে তিনি শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন। এমন নিষ্ঠুর ভাবে যে কেউ ছোট ছেলেদের মারতে পারে এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি। কালো রঙ, বড় বড় উগ্রদৃষ্টি চোখ, পেশী-সবল, পরিপুষ্ট দেহ—কান্তি মাস্টারের প্রকৃতিতেই উগ্রতা ছিল এবং সে উগ্রতা তার চেহারাতেও ফুটে বেরিয়েছিল। নানা কৌশলে নিষ্ঠুর নির্য্যাতন করতেন। আমি, ঠাকুরদাস দুজন অঙ্ক ভালই পারতাম, ঠাকুরদাস আমার থেকেও তখন অঙ্কে ভাল ছিল, তবু আমাদের নিষ্কৃতি ছিল না।

—এটা? এটা কি হয়েছে? আঁা? গুন-গুন-গুন। আরে—

খামচে চুল ধরেই টেনে আনতেন কাছে—তারপর টেনে মাথাটা নামিয়ে

টেবিলের তলায় আটকে দিয়ে বিরাশীশিক্কা ওজনের কিল বলে যে বিখ্যাত কিলের কথা শোনা যায়—তেমনি কিল বসিয়ে দিতেন। দম আটকে আসত। —আঁ! আঁ—শব্দ ক'রে সামলাতাম—তিনি তাকিয়ে দেখতেন। তারপর আবার ধরতেন। এবার আঙুলের মাথায়। নখের মাথা কচলাতে কচলাতে টেনে টেবিলের উপর রেখে শ্লেটের কাঠ দিয়ে নখ থেকে প্রতিটি গাঁঠের উপর আঘাত করতেন। হাত ঝাঁকি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সামলাতে হত। তারপর অন্য হাত—এবার দুই আঙুলের ফাঁকে পেন্সিল পুরে দিয়ে চাপ দিতেন। তারপর পেটের মাংস ধরে কচ্‌লাতেন।

বেচারী শিবকেষ্ট, খুদিরাম, পঞ্চানন আর শ্রীকৃষ্ণ! এরা অধীর অস্থির হয়ে উঠল। বউয়েরা অনেকে শ্বশুরবাড়ীর নির্য্যাতনে আত্মহত্যা করেন। কান্তি মাস্টার যদি দৈনিক এক ঘণ্টার বদলে আরও ঘণ্টা-দুয়েক পড়াতো—তবে বোধ হয় ওই বয়সে শিবকেষ্টরাও আত্মহত্যা করত। প্রায় তাই করেও ছিল। এবং তার ভাগ আমাদেরও নিতে হয়েছিল। প্রহারের ঠেলায় আমরা সকলে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হয়ে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে স্থির হল—কান্তি মাস্টারের ঘণ্টায় পালা করে পালিয়ে পরিত্রাণ পেতে হবে। দৈনিক দুজন করে। ছ জন ছেলে, সপ্তাহে ছ দিন ইস্কুল, তা হলে দুজন করে পালিয়ে প্রত্যেকে সপ্তাহে দুদিন কান্তির কৃতান্ত-হস্ত থেকে বাঁচতে পারা যাবে। ঠিক পূর্ব্বের ঘণ্টায়—ঘণ্টা শেষের তিন চার মিনিট আগে—সেই ঘণ্টার শিক্ষকের কাছে বাইরে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়তাম ইস্কুল থেকে—এবং অল্প খানিকটা দূরে একটা ঝুড়ি-ঝোপে সমাকুল ঢিবির আড়ালে বসে গল্প করতাম। পরের ঘণ্টাটি ঢং করে পড়ত, আমরা উঠতাম। ফিরে এসে ক্লাসে বসতাম।

কিছুদিন পরে, বোধ হয় মাস ছয়েক পরে একদিন এর প্রতিকার হল। আমার পেটের মাংস কচ্‌লেছিলেন কান্তিবাবু, তার ফলে—পড়েছিল কাল্‌সিটে। সেই দাগ থেকে—প্রকাশ হয়ে পড়ল কান্তিবাবুর নিষ্ঠুর প্রহার পদ্ধতির কথা। আমার অভিভাবক জানালেন ইস্কুলে, হেডমাস্টার মশায়কে। ইস্কুলে বসে আছি—কেষ্ট এসে ডাকলে—হেডমাস্টার ডাকছে।

ভয়ে শুকিয়ে গেলাম—লাইব্রেরীতে গেলাম। হেডমাস্টার পেটের দাগটা দেখলেন। হাফইয়ারলি পরীক্ষার খাতা খুলে—অঙ্কের নম্বর দেখলেন। তারপর বললেন—যা।

তারপর কি হ'ল জানি না। কিন্তু কান্তিমাস্টার সেদিন ক্লাসে এসে বসলেন হাঁক-ডাক করে নয়, চুপচাপ। পড়ালেন না। ঘণ্টাশেষে উঠে চলে গেলেন। সেইদিন থেকে মার বন্ধ হল। কিন্তু তার সঙ্গে আরও কিছু যেন গেল। কান্তিবাবুর যে প্রাণের যোগ ছিল, পড়ানোর মধ্যে যে আগ্রহ ছিল—তাও চলে গেল। আরও ছ মাস প'রে কান্তিবাবু মোক্তারী পাশ ক'রে এখান থেকেই চলে গেলেন। পরে—অনেক কাল পরে—হঠাৎ শুনলাম কান্তিবাবুর সংবাদ। কান্তিবাবু তখন লালবাগ কোর্টে খ্যাতনামা মোক্তার, উপার্জ্জন করেন প্রচুর। তাঁর এক সহপাঠী—আমাদের ইস্কুলের একজন প্রাক্তন ছাত্রের কন্যার বিবাহে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিচিত্র নাটকীয় ঘটনা। কন্যার পিতা দরিদ্র শিক্ষক, কন্যার বিবাহের সংবাদ বন্ধুকে জানিয়েছিলেন। পত্রালাপ তাঁদের নিয়মিতই ছিল, সেই সূত্রেই জানিয়েছিলেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছিলেন—কেমন ক'রে বিবাহ দেব জানি না। আজও অর্থ সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারিনি। কান্তিবাবু হঠাৎ এলেন। এবং বললেন—আমার একটি মেয়ে ছিল মারা গেছে। তার বিবাহের জন্য আমি অর্থ সংগ্রহ করতাম, সেই অর্থ নিয়ে এসেছি, আমি খরচ করব।

আমি কল্পনায় দেখছি—কান্তিবাবুর বড় বড় উগ্র-দৃষ্টি চোখ দুটি থেকে জল পড়ছে, এবং চোখের দৃষ্টির উগ্রতা গলে গলে ধুয়ে যাচ্ছে, সেখানে ফুটে উঠছে অপরূপ কোমল দৃষ্টি।

মনে হয়—ঐ দিনের পর তাঁর চোখের দৃষ্টিতে পুরানো উগ্রতা আর কোনোদিনই ফেরে নি। হয় তো তা সত্যি নয়। তবু এটুকু ভাবতে ভাল লাগে। আরও একটা কথা এখানে বলব। লিখতে লিখতে অনুভব করছি—মনের সেই অনুভূতির কথাটুকু না লিখলে অপরাধ হবে আমার। মনে হচ্ছে এই প্রহার করাটাই তাঁর সব নয়, আরও ছিল। ওই নিষ্ঠুর প্রহার করেও তিনি ভালবাসতেন। সে ভালবাসার আস্বাদ এতকাল পরেও

মনে রয়েছে। তিনি হয়তো ওই চাকরীটাই পছন্দ করতেন না—বা কোন রকম অসন্তোষ ছিল, কিম্বা বাল্য জীবনে তিনি শিক্ষকের কাছে নিজে প্রচণ্ড প্রহার খেয়েছিলেন। এমনি একটা কিছু হবে। নইলে—কান্তিবাবু ভালবাসতেন, আমি আজও সে ভালবাসার আস্বাদ স্মরণ করতে পারছি। তাঁর হাসিও মনে পড়ছে।

• •

আজ কান্তিবাবুর কথা লিখতে গিয়ে মনের একটি উপলব্ধির কথা প্রকাশ না করে পারছি না। জীবনে যত মানুষ দেখলাম—মানুষই দেখেছি আমি, মানুষ খুঁজে বেড়িয়েছি, দেখলাম প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কখনও না কখনও এমনি এক একটি বা এমনি কয়েকটি বিচিত্র বিকাশ হয়! যা মনে করিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় তারও মধ্যে আছে সুন্দর বা মধুরের একটি প্রবাহ; সে শুধুই বালুচর নয়, হঠাৎ একদিন বালুচর ভেদ করে উৎসারিত হয় মধুরের একটি নির্ঝর। প্রতিটি—প্রতিটি মানুষের মধ্যেই হয়।

অরণ্যের বসন্ত-শোভা দেখে, তার স্নিগ্ধতার মধ্যে আমরা আত্মহারা হই, কিন্তু যারা নাকি অরণ্যের অধিবাসী, যারা বৃক্ষলতার প্রতিবেশী তারা দেখে তার সদা সর্ব্বদার রূপ। সে রূপ মানুষের স্বার্থপরতার মত, কুটিলতার মত, হিংসার মত রূঢ় ভয়ঙ্কর। যে পুষ্পিত তরুটির রূপের মধ্যে পেলাম আমি অপরূপের সন্ধান তাকে স্পর্শ করা মাত্র বুঝতে পারি তার কাণ্ডের কঠোর রূঢ় প্রকৃতির পরিচয়। যে লতাটির নবপল্লব শোভায় আপনাকে হারালে মানুষ, ছুটে গেল লতার কাছে—সে তার নমনীয় দেহ বেষ্টনীর জটিল পাকে তার পাদুটিকে এমন করে জড়ালো যে তাতেই হয় তো হ'ল তার জীবনান্ত। হরিণ আবদ্ধ হয় এই লতার জালে—বাঘ এসে তাকে সংহার করে।

আসল কথাটা যেন এই—এই বহু বিচিত্র রূপে ভরা সৃষ্টির মধ্যে সকল রূপই অপরূপ হয়ে আপনাকে প্রকাশ করবার সাধনায় মগ্ন। তপস্বীকেও দেখেছি, তপস্যায় বিঘ্ন হলে—রোষ বহ্নিতে জ্বলে উঠেছেন। অভিশাপ দিয়েছেন। মানুষের সঙ্গে মানুষ আমরা নিবিড় সান্নিধ্যে বাস করি—অহরহ পরস্পরের এই তপস্যার আঘাত করি। তারই ফলে পাই রূঢ়তার

পরিচয়। সরে যাই তিক্ত চিত্তে। আর ফিরে তাকাই না তার দিকে। তাই চোখে পড়ে না—তার অন্তরের রূপ কখন অপরূপ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠল, একাত্মতা অনুভব করলে—রূপ এবং অপরূপেরও পরে আছে যে অরূপ রহস্য —তার সঙ্গে। সকল মানুষের জীবনেই এমনি ভাবে অকস্মাৎ একটা বসন্ত শোভা দেখা দেয়। কারও দেয় বার বার। কারও দেয় বহু—বহুবার। যখনই তার জীবনরূপে এমনি অপরূপের অবির্ভাব হয়, তখনই সৃষ্টিতে আসে একটি কল্যাণ। সচেতন বুদ্ধিতে, যশের আশায়, পুণ্যের কামনায় মানুষ যখন এ ফুল ফোটাতে যায়—তখন এ ফুল ফোটে না, ফোটে তখনই যখন আপনার বুদ্ধি বিবেচনাকে পিছনে ফেলে—বসন্তের এক আকস্মিক ক্ষণের বৃক্ষের রস সঞ্চারের মত—মানুষের জীবনাবেগের উন্মত্ততা তার দেহকোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে তাকে আত্মহারা ক'রে দেয়—যখন সে নিজেও বুঝতে পারেনা কি করছে তখনই ;—তখনই রিক্ত শুষ্ক কঠিন জীবন-পাদপের শাখায় প্রান্তে প্রান্তে ফুটে ওঠে ফুল ; জীবনের রূপ অপরূপ হয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। এইখানেই তো জীবন নাটক। এমনই একটি ছেদে শেষ হয় এক একটি অঙ্ক।

চার

আমার শিক্ষক ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল। স্কুলে তিনি ছিলেন ড্রিল-মাস্টার। তাঁর কথা আমার কালের কথায় বলেছি। কিন্তু স্কুলের প্রথম শিক্ষকের কথা বলা হয় নি।

আমাদের সাতন পণ্ডিত। ঐ নামেই আজীবন পরিচিত থেকে গেলেন। আমাদের গ্রামের লোকই ছিলেন তিনি। আমাদের গ্রামের পাশেই, রশি দুই তিন দূরে খানকয়েক ধানক্ষেতের পরেই মহুগ্রাম। সেই গ্রামে তাঁর বাড়ী ছিল। ভাল নাম সতীশচন্দ্র মিশ্র। ভারী ভাল মানুষ ছিলেন। তেমনি রসিক ছিলেন পণ্ডিত মশায়। ক্লাসে যে ভাল ছেলে হ'ত বিপদ হ'ত তার সবচেয়ে বেশী। তাকেই তিনি তাঁর ঠিক ডান দিকে বেঞ্চের প্রথম স্থানে বসাতেন আর আনন্দের আতিশয্য হলেই তার মাথায় তবলা বাজিয়ে দিতেন।

এখানেই শেষ নয়, আমাদের শিবকেষ্টকে আদর করে পঞ্চানন দেব বলতেন পড়ার সময় কিন্তু বলতেন শিবে !

শিবে !

—আজ্ঞে।

—দাঁড়া। পড়া বল। পড় রিডিং।

শিবকেষ্ট প্রথম শব্দে আটকে যায়—গয়ে র-ফলা দীর্ঘ-ঈ মূর্দ্ধন্য ষ-য়ে ম-য়ে কি হয় শিবকেষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না। মনে মনে বানান ক'রে আর আওড়ায়, কি হবে বুঝতে পারে না।

—পড়্-পড়। বানান ক'রে পড়।

শিবকেষ্ট সশব্দে বানান করে—গয়ে র-ফলা দীর্ঘ-ঈ—

—কি হয় ?

শিবকেষ্ট কি বলত ঠিক মনে নেই তবে—গরীষ বা গিরিষ জাতীয় একটা কিছু বলত।

—পচা !

পচার কণ্ঠস্বর আবার অনুনাসিক ছিল ! তা ছাড়া বেচারার জিভের মাপটা একটু বেথাপ্পা ছিল, হয় ছোট নয় বড় কিছু একটা ছিল, যার জন্য তার জিভে উচ্চারিত শব্দগুলি যেন গড়িয়ে বেরিয়ে আসত। র-কার তার ড়-কার হতই এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ও উচ্চ ভাবেই হত। সে—একবার গিঁ-ড়ি উচ্চারণ করেই থেমে চুপ করে থাকত।

এবার দাঁতে দাঁতে কষকষ করতেন সাতন পণ্ডিত।—তোর মাথা আমি চিবিয়ে খাব শিবে।

ঠিক এই সময়েই ক্ষুদিরাম ক্লাসে ঢুকত কচি নিমপাতা সমেত একটা ডাল নিয়ে। পণ্ডিতের হাতে দিত। পণ্ডিত নিমপাতাগুলি একটানে ছিঁড়ে বের করে নিয়ে মুখে পুরে কচ কচ ক'রে চিবিয়ে খেতেন। ডালটা ফেলে দিতেন ছুড়ে, এবং ধাঁ করে চাঁটী মারতেন ডান পাশের ভাল ছেলেটির মাথায়, না হয় কান ধরে টানতেন।

—মাশ্‌শায় !

—শিবে, পচার পড়া হয় নি কেন ?

—আজ্ঞে শ্যায় ! আমি তার কি করব শ্যায় ?

—দেখবে ! তুমি দেখবে !

এরপর শিবে এবং পচার দণ্ডবিধান হ'ত। কান ছুটো লাল ক'রে দিয়ে চুল টেনে ছিঁড়ে, গালে চড় মেরে, পিঠে কিল মেরে—শেষ—ষ্ট্যাণ্ড আপ্ কিম্বা—ষ্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ, কোন দিন—নিল ডাউন। কোন কোন দিন বাইরের কাঁকর পাথর কুড়িয়ে এনে তাই বিছিয়ে তারই উপর নিল ডাউন। নাকখতেরও প্রচলন ছিল সে কালে। নাকের ডগায় ছাল-চামড় উঠে লাল হয়ে যেত। চরম শাস্তি দিতেন নিমপাতার মুঠো মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে।

—চিবো চিবো। গেল্, কোঁৎ ক'রে গেল্। হুঁ।

তারপর গালাগাল দিতেন—কুকুর-দেঁতো, পোঁটা-নেকো, কটা-চোখো মাথা-মোটা—! চোখ ছুটো ছিল তাঁর রক্তাভ এবং দৃষ্টিতে ছিল একটা চিন্তামগ্নতার আভাস। তিনি যেন অহরহই চিন্তামগ্ন থাকতেন। সমস্ত জীবন এই চিন্তামগ্নতার আভাস তাঁর চোখে দেখেছি। কি ভাবতেন কে জানে। তিনি ছিলেন গ্রামের লোক, তাই ইস্কুলের বাইরেও তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত। পণ্ডিতমশায় সকাল বেলায় গ্রাম্য শিব এবং কালী মায়ের আটনে পূজা করতেন। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে ফুলের পাত্র। নমঃ নমঃ ক'রে—আতপ চাল আর ফুল বেলপাতা ছিটিয়ে দিয়ে, জমিদারী সেরেস্তার দপ্তর দিয়ে বের হ'তেন, তখন তিনি ছিলেন জমিদারের আদায়কারী গমস্তা। সমস্ত জীবন এই করে গিয়েছেন। আমাদের ওখানকার আমার বয়সী থেকে আমার ছেলেদের বয়সীরা পর্য্যন্ত সবাই বোধ হয় তাঁর ছাত্র। বহু কৃতীজন তাঁর ছাত্র। তিনি যখন তাঁদের সঙ্গে সম্ভ্রম ক'রে কথা বলতেন—আমি লজ্জা পেতাম। এই মানুষটির শেষ বয়সটা বড় সকরুণ। কল্পনাতীত ভাবে সকরুণ। অন্নবস্ত্রের কষ্টে সকরুণ নয়। সে দিক দিয়ে তাঁর বিশেষ কষ্ট ছিল না, মধ্য-বিত্ত গৃহস্থ—জমি ছিল, পুকুর ছিল, বাগান ছিল। কিন্তু বিচিত্র বিস্ময়কর পথে এল তাঁর জীবনে বিয়োগান্ত পরিণতি। তাঁর ছুটি ছেলে—শ্রীধর আর

সুদাই অর্থাৎ সুদর্শন। শ্রীধরকে ম্যাট্রিক পাশ করালেন। সুদাইও পড়ছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল দুটি ছেলেই নেশাখোর হয়ে উঠেছে। শেষে পথে ঘাটে সমাজে তারা নেশায় প্রমত্ত হয়ে বেড়াতে লাগল। গাঁজা খেয়ে শ্রীধরের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। আমাদের গ্রামের মহাপীঠ ফুল্লরাতলায় গাঁজাখোরদের আসরের সভ্য হল। সে আসরে মহাপীঠের মহান্ত গদীয়ান থেকে শ্রীধর পর্য্যন্ত দশ বারোজন সভ্য। সকলেই অর্দ্ধোন্মাদ। ষাট বছর থেকে তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের শ্রীধর নিয়ে অদ্ভুত উদার সভা। এই সভার আসরে পারা ঘৃতকুমারীর শাঁস এবং আরও কিছু মিশিয়ে তামা কে সোনায় পরিণত করবার বিচিত্র পরীক্ষা চলত। এই নিয়েই তর্কবিতর্ক করতে করতে শ্রীধর একখানা চেলাকাঠ আর-একজন গঞ্জিকাসেবীর মাথায় দিলে বসিয়ে; ফলে তার মাথাটা চুর হয়ে গেল। আদালতে শ্রীধর সবিস্ময়ে বললে—এত নরম ওর মাথা, সে আমি জানতাম না।

দায়রা আদালতে বিচার হল—সেখানেও শ্রীধর ওই কথাই বললে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসলে। শ্রীধরের সে পাগলের হাসি অকৃত্রিম। শ্রীধর বেকসুর খালাস পেলে।

ওদিকে সুদাই তখন দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছে। বাপকে বাড়ীতে পীড়ন করে—পয়সা দে, গাঁজা খাব। বয়স তার তখন তের কি চৌদ্দ। বোধ হয় ক্লাস সেভেনে পড়ে।

প্রহার করে বাপকে। গ্রামের পথে পথে বাপের অযোগ্যতা ঘোষণা করে বেড়ায়—যে বাপ গাঁজা খাবার পয়সা দিতে পারে না ছেলেকে—সে কেমন বাপ? কিসের বাপ?

বাড়ীতে পণ্ডিত মশায় মাথা হেঁট করে মৃত্যু কামনা করেন। মাথা হেঁট করে পথ চলেন।

হঠাৎ যেন সুদিন এল।

উনিশ-শো তিরিশ সাল। মহুগ্রামে মিটিংয়ে সুদাই এগিয়ে এল—বললে—আজ থেকে আমি নেশা ছাড়লাম।

সত্যিই নেশা ছাড়লে সুদাই। পিকেটিং করতে লাগল গাঁজা মদের

দোকানে। মিটিংয়ে বক্তৃতা দিতে লাগল। সে বক্তৃতায় বলত নিজের কথা।—বলত—দেখ ভাই, আমি রোজ চার পাঁচ আনার গাঁজা খেতাম। মদও খেতাম। গাঁজা না খেলে ভাত খেতে পারতাম না। পেট ফুলত। কিন্তু দেখ ভাই, আর আমি গাঁজা খাই না। বড় খারাপ জিনিষ। তোমরা কেউ গাঁজা মদ খেয়ো না। গাঁজার পয়সা না থাকলে—আমি ঘটীবাটী বিক্রী করতাম। বাবাকে মাকে মারতাম। আমি আর গাঁজা খাই না। আমার জ্ঞান হয়েছে।

শুধু এখানেই শেষ নয়। সুদাই, আর দুটি সমবয়সীর সঙ্গে, উনিশশো তিরিশ সালের আন্দোলনে, আমাদের ওখান থেকে প্রথম গ্রেপ্তার হল। স্টেশনে সেদিন সে কি জনতা, সুদাইদের সে কি অভিনন্দন জানালে। ফুলের মালা গলায় নিয়ে, ললাটে চন্দন-তিলক নিয়ে তারা চলে গেল। সেদিন বৃদ্ধ পণ্ডিতের চোখে দেখেছিলাম জল—মুখে সে কি হাসি। ঠোঁট দুটি হাসিকান্নায় থর থর ক'রে কাঁপছিল। সে দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

সুদাইরা তিনমাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে গেল—আপিলুর সেণ্ট্রাল জেলে। সেখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ছিলেন তখন। তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ছোট তিনটি ছেলের উপর। তাদের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন। যত্ন করেছিলেন। স্নেহ দিয়েছিলেন।

সুদাইরা ফিরল সগৌরবে। তখন আমি জেলে। আমি যখন জেল থেকে ফিরলাম তখন আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এসেছে। পুলিশের নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে দেশটা ভয়ে মূক হয়ে গেছে। বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করতেও কেউ সাহসী হয় না। এই অবস্থায় একদিন পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হ'ল। পণ্ডিত কাঁদলেন, ঝর ঝর ক'রে কেঁদে বললেন—আমার অদৃষ্ট দেখ বাবা, আমার অদৃষ্ট! সুদাইটা আবার নেশা ধরেছে। আগের থেকে অনেক বেশী নেশা করছে। আমাকে ধ'রে মারছে। আমার অদৃষ্টেই বোধ হয় এত বড় আন্দোলন সব মিছে হয়ে গেল, ব্যর্থ হয়ে গেল।

এরপর খুব কমই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। উনিশশো বত্রিশ তেত্রিশ সাল থেকেই আমি সাহিত্যসাধনার পথে কলকাতায় বেশী থাকতে সুরু

করলাম, বিষয়কর্ম্মের সংশ্রব পরিত্যাগ করলাম, নইলে হয়তো গমস্তারূপী পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে দুচারবার দেখা হত। তখনও তিনি সংসারের জন্যে গমস্তাগিরি ছাড়েন নি। হঠাৎ একদিন শুনলাম পণ্ডিত মুক্তি পেয়েছেন, মারা গেছেন।

উনিশশো তেতাল্লিশ সালের মহামারীতে পণ্ডিতের সংসার সব শেষ হয়ে গেল একরকম। শ্রীধর গেল, সুদাই গেল, পণ্ডিতের স্ত্রী গেলেন, বোধ হয় এক বিধবা কন্যা, সেও গেল। রইল শুধু শ্রীধরের বিধবা স্ত্রী—তার একটি পুত্র। আর একটি কন্যা—তার বিবাহ হয়েছে আমারই এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে, তারা এবং তাদের পুত্র-কন্যারা আছে। আমার বন্ধুটি কৃতী, শিক্ষিত রসিকজন শিক্ষাব্রতী। তার বংশের জলগণ্ডুষেই বোধ হয় শিক্ষাব্রতী পণ্ডিতের জীবনতৃষ্ণা মিটবে।

সাতন পণ্ডিত মশায়কে দেশে অধিকাংশ মানুষই ভুলে গেছে। যারা মনে করে রেখেছে—তারা কি ভাবে তা জানি না। আমি প্রায়ই তাঁর কথা মনে করি। কখনও কখনও এই সকরুণ জীবনকাহিনী নিয়ে উপন্যাস লেখার কথা ভাবি। কিন্তু বুঝতে পারি না, তাঁর এই দুর্ভাগ্যকে কোন্ ব্যাখ্যানে ব্যাখ্যা করব? জন্মান্তরের কর্ম্মফল? অদৃষ্টের পরিহাস? সে আমি পারি না। তাঁর জীবনের ইতিহাসের অন্ধকারে ডুবে—তাঁর চরিত্রের যে ছিদ্র-পথে এ-পাপ ঢুকে তাঁর জীবনটাকে এমন ছিন্নভিন্ন করে দিলে তাকে আবিষ্কার করতে সাহস পাই না আমি।

তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি—ভালবাসি। তাই তাঁর জীবনকাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনার অভিপ্রায় মন থেকে মুছে ফেলেছি।

সাতন পণ্ডিত আমার ইস্কুলজীবনের প্রথম শিক্ষক। তাঁর অনুকরণে আমার ছোট নাতি দুষ্টুমি করলে বড় নাতির মাথায় চড় বসিয়ে দি।

সে বলে—ওই! আমি কি করলাম?

আমি বলি—তুমি দেখবে। তুমি দেখবে।

সাতন পণ্ডিতের পরই মনে পড়ছে ফিফ্‌থ মাষ্টার রজনী সিংহকে। আর

একজনকে মনে পড়ছে তিনিই আগে ছিলেন ফিফ্‌থ মাষ্টার। হরিচরণ রায় নাম ছিল বোধ হয়। তাঁর কাছে পড়িনি—তবে তাঁকে দেখতাম প্রায়ই। আমার জ্যেঠামশায়ের বাড়ীতে থাকতেন। সে আমলের এফ-এ ফেল ছিলেন। খুব ভাল ইংরাজী জানতেন না কি। আমার জ্যেঠামশায়ের টাকা অনেক, কৃপণ লোক, একটি সন্তান; তাই সেই সন্তানটিকে ইংরিজী শেখাবার জন্য হরিচরণ রায়কে বাড়ীতে রেখেছিলেন। আমার জাঠতুত ভাইয়ের তখন বয়স তেইশ চব্বিশ তো বটেই। অহরহ মদ্যপান করেন; হরিচরণ রায় তাঁকে স্নেহ করতেন—তাই ওই অবস্থাতেও তাঁকে ইংরিজী খবরের কাগজ পড়ে শুনিয়ে ইংরিজী শেখাবার চেষ্টা করেন। হরিচরণ রায়ের আরও একটা স্নেহ এবং আকর্ষণ ছিল ছাত্রের পিতার উপর। আমার জ্যেঠা-মহাশয় ইস্কুল কলেজে পড়েন নি। কিন্তু এমন ভাল ইংরিজী বলতেন যে যারা ইংরিজী-রসিক তারা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর ইংরিজী বলা শুনত। অনেকে শখ করে শুনতে আসত, ইংরিজীতে কথা বলতে আসত। এমনটা সম্ভবপর হয়েছিল—জ্যেঠামশায়ের পিতৃসৌভাগ্যে। বাপ ছিলেন বড় উকীল (সে আমলের বাংলানবিশ উকীল)। থাকতেন সিউড়িতে। সেই সময় এক ইংরাজ জজ আসেন, তাঁর ছোট ছেলেটির সঙ্গে উকীলবাবুর ফুট্‌ফুটে ছেলে-টির হয় অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা। শুনেছি—মেম সাহেবও তাঁকে ছেলের মত ভালবাসতেন। সেই আকর্ষণে মাতৃহারা শিশুটি দিনের অধিকাংশ সময়ই থাকতেন তাঁদের কুঠিতে। মুখে মুখে শিখলেন ইংরিজী এবং সে বলার ভঙ্গি পর্য্যন্ত তাঁদের মত খাঁটি সাহেবি। জ্যেঠামশায় যে দিন কারণ করতেন—সে দিন রক্ষা থাকত না। হরদম ইংরিজী বলতেন। হরিচরণবাবু তাঁর সঙ্গে ইংরিজীতে কথা বলে যে আনন্দ পেতেন সেই আনন্দের আকর্ষণটাই ছিল সবচেয়ে বড়। সে কাল ছিল আলাদা, তিনি মাস্টারকে বলতেন—মাস্টার এই কথাটা শুধু তোমার ছাত্রকে বুঝিয়ে দাও। একটা কথা। মদ থাক—মদ খারাপ জিনিষ নয়। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখতে হবে। ফার্ষ্টগ্লাস ফর থার্ষ্ট, সেকেণ্ড গ্লাস ফর হেল্‌থ্‌। বাস্ আর না। তারপর ফর ম্যাডনেস।

মাস্টার আরম্ভ করতেন—ছাটস্ রাইট স্যার, বাট।

বাস্—ওই সুরু হল। এবং চলতে লাগল।

হরি পণ্ডিত—তাঁকে সকলে হরি পণ্ডিতই বলত, বিচিত্র মানুষ ছিলেন—লোকে অনেকে তাঁকে বলত—কেন আর আপনি ও বাড়ীতে আছেন পণ্ডিত? লোকে নিন্দে করে।

—করুক। ওটা মানুষের স্বভাব। আমার নিন্দে না পেলে আপনার নিন্দে করবে।

—কিন্তু আপনার আর ওই বাড়ীর ভাত রোচে? হজম হয়?

—রোচে কিন্তু হজম হয় না। আমার অম্লশূলের ব্যাধি অনেক দিনের।

আর কিছু কেউ বলতে গেলে বলতেন—প্লিজ-প্লিজ। আঙুল দেখিয়ে পথ নির্দ্দেশ ক'রে বলতেন—নিজের কাজে যান।

হরি পণ্ডিতের ইচ্ছা ছিল—আমাকে পড়ান। সে অভিপ্রায়ও প্রকাশ করেছিলেন বাবার কাছে। কিন্তু আমার পিসিমায়ের অমতের জন্য সে হয়নি। পিসিমা বলতেন—হরি পণ্ডিতের স্বভাবটা হল নিন্দুকের স্বভাব। রোজ নাকি জ্যেঠামশায়ের বাড়ীতে খেতে বসে ঠাকুর থেকে কর্ত্তা কর্ত্রীকে পর্য্যন্ত তিরস্কার করতেন, তরকারিগুলি মুখে দেবার আগেই হাত দিয়ে নেড়েই সুরু করতেন—অখাদ্য, অখাদ্য। এই কি মানুষে খেতে পারে? রাবিশ, রাবিশ।

ইস্কুলেও হরি পণ্ডিত ছেলেদের নাকি অনবরত গাল দিতেন; ড্যাম রাস্কেল ননসেন্স, এসব ছাড়াও বলতেন—কুত্তার বাচ্ছা।

আপত্তি করলে বলতেন, ওরে হারামজাদ, সংসারে মানুষের বাচ্চার দুটো জাত। তা সে মানুষ বামুনই হোক আর চণ্ডালই হোক, ইংরেজই হৌক আর কাফ্রীই হোক। দুটো জাত। একটা হ'ল ময়ূরের বাচ্চা—একটা কুত্তার বাচ্চা। ময়ূরের বাচ্চা দেখেছিস—প্রথমে রোঁয়া না, রঙ না, দেখলে গা ঘিন-ঘিন করে—কিন্তু যত বড় হয়—তত তার পালকে-পুচ্ছে-রঙে-নাচে বাহার খোলে; আর কুকুরের বাচ্চা ছেলেবেলায় মোটাসোটা নাদুসনুদুস; আয় ময়না কুর কুর বলে ডাকলেই লেজ নেড়ে সারা। যত বড় হবে তত তার ঘেন্নার চেহারা খুলবে, রোঁয়া উঠবে, পাঁজরা সার হবে, মাঠে মাঠে অখাদ্য খেয়ে বেড়াবে, গায়ের গন্ধে ভূত পালাবে পাড়া ছেড়ে, কিছু বললে

দুপাটি দাঁত বের করে—গ্যাঁ—শব্দ করে কামড়াতে আসবে। এই যেমন তুই এখনি গ্যাঁ-গ্যাঁ করছিস ঠিক তেমনি। আয়না থাকলে দেখিয়ে দিতাম তোমার দাঁত-বের-করা মুখ ঠিক সেই রকম হয়েছে। কুত্তার বাচ্চা রে—তোরা কুত্তার বাচ্চা! রোঁয়া উঠতে সুরু হয়েছে, মুখে গন্ধ বেরুচ্ছে কুখাদ্যের। তামাক টেনেছিস তারই গন্ধ উঠছে। দুদিন পরে গাঁজা মদ খাবি তারই গন্ধ উঠবে। ড্যাম রাস্কেল—সোয়াইন—কোথাকার!

বাল্যকালে হরিপণ্ডিতের সঙ্গে আমার একটি মধুর সম্পর্ক হয়েছিল; রাস্তায় আমাকে দেখলেই তিনি ডাকতেন। জ্যেঠামশায়দের বৈঠকখানা এবং আমাদের বৈঠকখানা পাশাপাশি। কাজেই দেখা হ'ত নিত্য কয়েকবার, তিনি ডাকতেন—আমি যেতাম।

—ইউ বয়! কাম হিয়ার।

ইংরিজী তখন জানিনা তবু ও কথা দুটোর মানে বুঝতাম। যেতাম। তিনি আমাকে ইংরিজিতে তালিম দিতেন।—এটা কি?—হেড। এগুলো? —হেয়ার। এটা?—ফোরহেড। এ দুটো—? আই ব্রাও। তার নিচে ও দুটো? আইজ। ইয়ারস? কান দুটো ধরে নেড়ে দিয়ে বলতেন—এই দুটো। সব শেষে বলতেন—শোনো। ইংরিজীতে কবিতা আবৃত্তি করতে সুরু করতেন। সে মিল্টন কি টেনিসন, কি শেলি কি বায়রণ—তিনিই জানতেন। আমি শুধু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে সেই ধ্বনিঝঙ্কার শুনতাম।

কান্তিমাস্টার এবং হরিপণ্ডিত দুজনেই প্রায় এক সঙ্গেই চলে গেলেন ইস্কুল থেকে। এঁদের জায়গায় নতুন মাস্টার এলেন। কান্তিমাস্টারের জায়গায় এলেন—আমাদের গ্রামেরই, আমাদের প্রতিবেশী—গোবিন্দ সরকার। যেমন সুপুরুষ তেমনি দুর্লভ স্বাস্থ্য—পালোয়ানের মত চেহারা। তেমনি ছিল সুন্দর হস্তাক্ষর। ঐ কালে যাঁরা হাতের লেখা শিল্পবস্তুতে পরিণত করেছেন এবং সেই শিল্পকেই জীবিকা ক'রে নিয়েছেন—তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিভার অধিকারী—গোবিন্দবাবু তাঁদের সমকক্ষ ছিলেন। কিন্তু সেকালে

এই শিল্পের এত প্রসার হয় নি—এবং শিল্প কর্ম্ম ক'রে জীবিকার সংস্থানের কল্পনাও লোকে তখন করতে পারত না। সেই কারণে গোবিন্দবাবু সমস্তটা জীবনের কিছুটা ইস্কুলমাস্টারী কিছুটা কেরাণিগিরি করে গেলেন। গোবিন্দ-বাবু ফুটবলেও খুব বড় খেলোয়াড় ছিলেন। ব্যাকে খেলতেন। গোষ্ঠ পালকে লোকে বলত চাইনিজ ওয়াল। গোবিন্দ মাস্টারও অমনি ধরণের ওয়াল ছিলেন। তাঁর গায়ে ধাক্কা দিলে—যে ধাক্কা দিত সেই গড়াগড়ি যেত মাঠে। তেমনি ছিলেন খাইয়ে। পুরোদস্তুর খাওয়ার পর তিনি যখন মিষ্টি খেতে বসতেন তখন পঞ্চগ্রামের লোকের দৃষ্টি তাঁর উপর নিবদ্ধ থাকত। তিনি নীরবে মাথা হেঁট করে খেয়ে যেতেন। পিতলের বালতী ভরা মিষ্টি নিয়ে পরিবেশকেরা দাঁড়িয়ে থাকত। এক একবাবে দশ বারোটা ক'রে মিষ্টি পড়ত পাতে। এক দুই তিন চার বার পড়ল।

—আর? বিলিতী মাস্টার?

নীরবে সম্মতিসূচক ঘাড় এক পাশে হেলে গেল। পড়ল আর এক দফা।

—আর?

এবার কথা বললেন মাস্টার—চারটে।

সে চারটে চলে গেল।—আর?

—দাও আর চারটে।

সেও শেষ হ'ল।—আর না।

—আর চলবে না?

—অন্য মিষ্টি থাকে ত' দুটো।

পঞ্চাশ ষাটটা মিষ্টি খেয়ে মাস্টার উঠে গজেন্দ্র গমনে চলে যেতেন।—

মাস্টারের নাম ছিল বিলিতী মাস্টার। তার কারণ বিচিত্র। মাস্টারের একটি স্বভাব ছিল বিজ্ঞাপন খোঁজা। চাকরীর নয়। বিনামূল্যে জিনিষ নমুনা হিসেবে পাঠাবার বিজ্ঞাপন। সে কালে এই বিজ্ঞাপন অধিকাংশই ছিল বিদেশী পণ্যের বিজ্ঞাপন। মাস্টার সেই বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখতেন অথবা কুপন পূরণ করে পাঠাতেন। যথা সময়ে জিনিষ আসত ডাকযোগে। বিনামূল্যে তিনি জার্ম্মানী থেকে কোষ্ঠী তৈরী করে আনিয়েছিলেন। রোজ

যেতেন পোস্টাপিসে। সেখান থেকে লণ্ডন প্যারিস বার্লিনের চিঠির প্যাকেট নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। এই জন্যই তাঁর নাম ছিল বিলিতী মাস্টার।

গোবিন্দবাবুর ভাই করালী সরকার আমার থেকে বছর তিনেকের বড়। দু ক্লাস উঁচুতে পড়ত। করালীরও কিছু কিছু ওই সব গুণ ছিল।

গোবিন্দ মাস্টার মারতেন না, কিন্তু তাঁর হাতের মুঠি দেখেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যেত।

গোবিন্দবাবু মাস্টারী নিলেন—নিয়ে একটু বিপদে পড়লেন। গোবিন্দ বাবু যখন ছাত্র ছিলেন—তখন তাঁর একটি আড্ডা ছিল। নাম ছিল না আড্ডার, কিন্তু নাম দেওয়া যায়, ভাল নাম দেওয়া যায় বা যেত। ধূম্রলোক, বালাখানা, ছিলমবিলাস, টোবাকো ক্লাব। অর্থাৎ তামাক খাওয়ার আড্ডা। যারা নতুন তামাক খেতে শিখত—তাদের জন্যে দ্বার ছিল অবারিত। সে যে-বয়সেরই ধূমপায়ী হোক, আসরে স্থান দিতে আপত্তি করতেন না। এক কল্কে তামাকের অংশ পেতে হলে একটি কি দুটি পয়সা দিতে হ'ত। পূরো এক কল্কে যদি কেউ আরাম ক'রে খেতে চাইত—তবে চার পয়সা দিতে হ'ত। গোবিন্দ বাবু যখন মাস্টার হলেন—তখন করালী ওই আড্ডার সহকারী কর্ণধার হয়েছে। এবং আড্ডার সমানে ছোটদের আনাগোনা চলছে। সুতরাং মাস্টার বিপদে পড়লেন। শেষ পর্য্যন্ত আড্ডার সময় নির্দিষ্ট করলে করালী। ছেলেদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাস্টার বাইরে চলে যেতেন।

ফিফ্‌থ্ মাস্টার এলেন রজনী সিংহ।

রুগ্ন মানুষ। শীর্ণ দেহ, লম্বা চেহারা। অনবরত গোঁফ টেনে দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে কট্ কট্ করে গোঁফ কাটতেন। একটু কথা আট্‌কাতো। মাসে বোধ হয় দশ দিনের বেশী স্নান করতেন না। ভারী ভালো মানুষ, ভারী মিষ্টি মানুষ। হেডমাস্টার মশায়ের ভাগ্নে তিনি। তিনিও বোধ হয় আমাদের ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। দীর্ঘদিন আমাদের ইস্কুলে মাস্টারী করে গেছেন।

শিক্ষক হিসাবেও যোগ্য শিক্ষক ছিলেন। তাঁর কাছে যা পড়েছে তা আজও মনে আছে। অথচ তাঁকেই একসময় অযোগ্য বলে অবসর নিতে

বাধ্য করা হয়েছিল। অবশ্য অনেক দিন পরে। রজনীবাবুর হাতে আমাদের ইংরাজী এবং ইতিহাসের পড়া পড়ল।

তার আগে আমরা উঠলাম নতুন ক্লাসে—অনেক নতুন ছেলে এসে ভর্তি হল। সবই অবশ্য আশপাশ গ্রামের ছেলে। এর মধ্যে এল বৃত্তি পাওয়া ছেলে মন্মথ সিংহ। বেঁটে খাটো গোলগাল—যেন একটি বাঁটুল। আর এল ভোলানাথ পণ্ডিত, বিভূতি মিশ্র। আর এল আমাদের গ্রামের ও পাড়ার গৌরীবিলাস। আরও এল অনেক, কিন্তু তাদের সকলকে আজ মনে পড়ছে না। কিছু দিনের মধ্যেই তারা পড়া ছেড়ে দিলে বা পিছনে পড়ে থাকল।

গৌরীবিলাস যত বুদ্ধিমান তত পরিশ্রমী। ক্ষুরধার বুদ্ধি। কিন্তু বিভূতি মিশ্র বিচিত্র এবং প্রতিভাবান। বিভূতি এসেই ক্লাসে প্রতিটি ছাত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়ে দিলে। এসেই শুনলে যে, আমি পদ্য লিখতে পারি।

আমিই ক্লাসে সকলের চেয়ে ছোট। বিভূতি বিশ্বাসই করলে না প্রথমটা। বললে, লেখ পদ্য, দেখব।

আমাকে লিখতে হল। নইলে আমার সব যায়—মান-মর্য্যাদা কিছুই থাকে না!

বিভূতি পড়লে। পড়ে প্রশংসাও করলে না, নিন্দাও করলে না, চুপ ক'রে বসে রইল। ঠিক পরের দিন বিভূতি এসে বললে, আমি পদ্য লিখেছি।

সে দাঁড়িয়ে সেই পদ্য পড়লে। তার পরের দিন আবার লিখে আনলে। কিছুদিন পরেই সে ক্লাসে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে পদ্য রচনা করতে সুরু ক'রে দিলে। দেখতে দেখতে এল হাফাইয়ারলি পরীক্ষা। ফল বের হল, গৌরীবিলাস সবেতেই প্রথম, কোন বিষয়ে আমি দ্বিতীয় কোনটাতে বিভূতি। বিভূতি ইংরিজীতে বেশ কম নম্বর পেলে। এর ফলে সে দাঁড়াল তৃতীয়। বিভূতি হঠাৎ পদ্য লেখা থামিয়ে দিলে। ইংরিজী গ্রামার মুখস্ত করতে লেগে গেল। ছু পাতা তিন পাতা ট্রানশ্লেশন ক'রে আনে। বাৎসরিক পরীক্ষায় সে ইংরিজীতে আমাকে ছাড়িয়ে গেল, গৌরীবিলাসের গৌরব এক নম্বরের জন্য বেঁচে গেল।

আবার বিভূতি সুরু করলে পদ্য লেখা।

বিভূতি পদ্য লিখতে সুরু করলে—অনেক লিখলে। কিন্তু তার পদ্যের সুর, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের সুর ছাড়িয়ে নতুন কালের সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে পারলে না। রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী, কণিকা এ সব আমি তখন পড়েছি। ওই সুর তখন আমার কানে বেজেছে। আমি ওই সুরে সুর মেলাতে চেষ্টা করি। বিভূতি যুক্তাক্ষরের ধ্বনি কিছুতেই ধরতে পারত না। একদিন তাকে কথা-ও-কাহিনী দেখালাম; বিভূতি পড়লে "পঞ্চ নদীর তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে—," তার ভুরু কুঁচকে উঠল, বললে—এ লাইনে সাত অক্ষর—ও লাইনে আট অক্ষর! এ আবার কি পদ্য? আরও একটু পড়লে—জাগিয়া উঠিল শিখ! নির্ম্মম নির্ভীক! এখানে আবার আট—আর ছয়! সে সঙ্গে সঙ্গেই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ফতোয়া দিয়ে দিলে যে, এই কবিতাটি কবিতাই হয় নি।

ক্লাস দুই আরও উঠে বিভূতি একদিকে সুরু করলে নেসফিল্ড, রোজ-হিন্ট পড়তে, পড়তে নয়—মুখস্থ করতে সুরু করে দিলে, অন্যদিকে সে কবিগান গাইতে সুরু করলে। কবিতার চর্চ্চা করতে করতে সে কবিয়ালদের কবি-গানের পাল্লায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। কবিয়ালদের প্রতিভা তার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। এক একদিন সে ইস্কুলে আসে শুধু একটা খাতা নিয়ে; দুটি চক্ষু লাল; সারারাত্রি কবিগানের আসরে গান শুনে প্রায় আসর থেকেই চলে এসেছে ইস্কুলে। ক্লাসে বসেই ঢোলে। শেষে অপরাগ হয়ে শরীর খারাপ বলে ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে যায়। ক্লাসেই কবিগান করত। গালে হাত দিয়ে—কোমরে জামার উপর কাপড় বেঁধে ঠিক কবিয়ালদের মত নেচে নেচে গায়—

ক য়ে কালী কপালিনী—খ য়ে খর্পর ধারিণী—।

কবি গানের আস্বাদন বিভূতিই আমাকে প্রথম দিয়েছে। আমার কবি উপন্যাসের নিতাই কবিয়ালের 'ওই ক য়ে কপালিনী' গানও বিভূতির কাছেই শুনেছিলাম। তখন কবিগানের অবস্থা—অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁচালীর মত। এতে তখন অশ্লীল অংশ এত বেশী যে আমাদের লাভপুরের ব্রাহ্মণ ভদ্র পরিবারের কেউ কবিগানের আসরে যান না। তখন ঝুমুর এবং কবিগানে

প্রায় অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। কবিয়ালদের অধিকাংশেরই দোয়ার ছিল না, দোয়ারকি করত এই সব ঝুমুর দলের মেয়েরা।

বিভূতি কেমন ক'রে যে এই কবিগানে আকৃষ্ট হয়েছিল জানি না, কিন্তু ওতেই সে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। মনে হ'ল বিভূতি বড় হয়ে এই কবিগান করাকেই জীবনের চরম সার্থকতা মনে করেছে। সে রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে নানা পুরাণ পড়ে ফেললে; পড়ে ফেলাই নয়—প্রায় কণ্ঠস্থ করে ফেললে। অঙ্কতে সে কিছু কাঁচা ছিল—ওতেই ছিল তার বীতরাগ। অঙ্ক ছাড়া আর সব বিষয়েই বেশ সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ক্লাসের পর ক্লাস অতিক্রম করে চলেছিল। হঠাৎ একদিন বিভূতি পড়া ছেড়ে দিলে। বোধ হয় তার পিতৃবিয়োগ হ'ল।

তারপর অনেক দিন আর কোন সংবাদ পেলাম না।

শুনলাম না—নতুন বিভূতি কবিয়ালের আবির্ভাবের কথা।

ভোলানাথ পণ্ডিত—আমাদের ভোলা পণ্ডিত—পণ্ডিতজী—বরাবর সঙ্গে আছেন। সামনের দুটি দাঁত উঁচু। ওই উঁচু দাঁত দুটি এবং তার ধীর রসিক প্রকৃতিই বলে দিত—পণ্ডিতজী পড়া ছাড়বে না। সে পণ্ডিত হবেই। বিভূতি সম্পর্কে ভোলানাথের মামা। ভোলানাথের কাছে খবর পেলাম—সে এখন খুব অঙ্ক কষছে।

—অঙ্ক কষছে? বিভূতি?

—সুদ কষা। কাঠাকালী। জমিদারী সেরেস্তার যাবতীয় অঙ্ক।

বিভূতি বাপের কাজ চালাচ্ছে। তাদের নিজের কিছু আদায় ছিল, তা ছাড়া তার বাপ করতেন কোন জমিদারের আদায়ের কাজ। বেশ সন্তুষ্টচিত্তে—যোগ্যতার সঙ্গে বিভূতি ক'রে যাচ্ছে এ সব কাজ।

দেখাও হয়েছিল একদিন সেই সময়। দেখলাম খাঁটি বিষয়ী বিভূতি।

তারপর একদা পণ্ডিতজী বললে—ওহে বিভূতি প্রায় ঋষি হয়ে উঠেছে।

—মানে?

—মানে বেদ বেদান্ত উপনিষদ দর্শন চর্চ্চা সুরু করেছে। সে একেবারে তপস্যা।

অবিশ্বাস করি নি। বিভূতি সম্পর্কে অবিশ্বাস করবার কিছুই নাই। সব-পারে! সব!

বছর ছয়ের আগে—কি বছর আষ্টেক আগে বিভূতির সঙ্গে দে: হয়েছিল। একদিন নয় দুদিন। একদিন—পণ্ডিতজী তাকে নিয়ে এলে আমার বাড়ী। দেখলাম—সত্যই তপঃশীর্ণ, সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রভাবে মিষ্টভা: —বিভূতি তারও চেয়ে মধুর হেসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

তারপর একদিন একা এল।

বললে, একা তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।

—বল।

বসল। সিগারেট খেলে।

বললাম, কি বলবে বলছিলে?

সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

আমি আবার ডাকলাম—বিভূতি!

—য়্যাঁ?

—বল।

—কি?

—কি বলবে বলছিলে?

—রাগ করবে না তো?

—না। তোমার কথায় আমি রাগ করব বিভূতি?

—ভুলে বলেছি কথাটা। দুঃখ পাবে না তো?

—না। বল তুমি, দুঃখ আমি পাব না।

—তোমার লেখা পড়লাম। একটি লেখা ছাড়া বাকী আমার ভাল লাগল না।

—একটি ভাল লেগেছে তো।

—হ্যাঁ। খুব ভাল লেগেছে।

—কোনটি? কবি?

হাসলে বিভূতি। বোধ হয় তার নিজের কৈশোরের কবিয়ালীর মহড়া

দেওয়া মনে পড়ে গেল। বললে—ওটি মন্দ নয়। ভাল। লোকটি খেয়া পেয়েছে। পার হবে। আমার ভাল লেগেছে—গণদেবতা পঞ্চগ্রাম—দুইয়ে একটি বই। খুব ভাল লেগেছে। ন্যায়রত্নকে পেলে কোথা? দেখবে তুমি, ওই তোমার পুণ্যগ্রহ হয়ে থাকবে। দেখবে। আমাকে দু একজন বললে অন্তকথা। কিন্তু—। সে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলে।

আমি বললাম—আমি তোমার কথা মানি।

বিভূতি আমাকে রস সম্পর্কে সে দিন অনেক কথা বলেছিল।

সেই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। কয়েক মাস আগে বিভূতি মারা গেছে। তীর্থ করতে গিয়ে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছিল। মেয়েরা ছিল মেয়েদের গাড়ীতে। পুরুষদের গাড়ীতে সে উঠতে গিয়ে উঠতে পারে নি। ফুটবোর্ডে ঝুলে আসছিল। তাকে কোন ট্রেনের যাত্রী ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। হাসপাতালে মৃত্যুকালে কোন অভিযোগ করে নি। তার বুকে ঝোলায় ছিলেন তার নিত্য আরাধ্য শালগ্রাম শিলা, সঙ্গে বোঁচকায় ছিল কয়েকখানি কাপড় আর শাস্ত্র গ্রন্থ।

বিভূতির কথায় আবেগের বশে কৈশোর ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বে এসে পড়েছি আবার ফিরে যাই কৈশোরে।

রজনীবাবু আসতেন ক্লাসে। ইতিহাস পড়াবেন।

আগের ঘণ্টায় অঙ্ক হয়েছে। বোর্ডে লেখা রয়েছে অঙ্ক। রজনীবাবু অঙ্কগুলি মুছে দিয়ে তিন চারিটি অঙ্ক রেখে দিলেন।

৫৫৬—তার পাশে লিখে দিলেন—B. C.;—বল—তারাশঙ্কর—ঐ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে কি হয়েছিল।

—কপিলাবাস্তর নরপতি মহারাজ শুদ্ধোদনের ঔরসে তাঁহার পত্নী মায়াদেবীর গর্ভে—বুদ্ধদেবের জন্ম হয়।

—ভাবী কালে তিনি কি প্রচার করেছিলেন ?

—বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

—অহিংসা পরমো ধর্ম।

একদিন এমনি একটা ঘণ্টার পরই শুনলাম, বোর্ডিংয়ের ছেলে এবং গ্রামের ছেলেদের মধ্যে ভয়ানক ঝগড়া হয়ে গেছে।

আমার জীবনের ওই ঝগড়া একটা ঝড়। ঝড়ের মত এল।

বোর্ডিংয়ের ছেলে আর গ্রামের ছেলের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেল।

ফুটবল খেলার মাঠে হল ঝগড়া, তার জের এল ইস্কুলে। খেলার মাঠে ঝগড়াটা কি ভাবে ঘটেছিল জানি না। তখন স্কুলে তিনটে টিম—এ, বি, সি। আমরা সি-টিমে খেলি। বোর্ডিংয়ে ছোট ছেলের সংখ্যা খুব কম; মাত্র দু-একজন; সে সময় আমার সহপাঠী ওই বাঁটকুল মোনা সিং ছাড়া আর কেউ বোধ হয় ছিল না। আশপাশ গ্রামের ছেলেরাও কেউ খেলতে আসত না। আসত বোধ হয় কেবল মহুগ্রামের শরৎ চন্দ। সে আমার চেয়ে বয়সে বড় হলেও মাথায় আমার মতই ছিল—দেখতেও ছিল হিলহিলে। বাকী সব আমাদের গ্রামের ছেলে। বীরেশ্বর, বংশী, দ্বিজপদ, বদি, নারাণ, আর এক দ্বিজপদ তাকে বলতাম—বোবা দ্বিজ; তার কথায় ছিল জড়তা।

ফুটবল খেলা নিয়ে সে আমাদের কি মাতন। বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যতক্ষণ ফুটবল নজরে পড়ে ততক্ষণ খেলা চলত আমাদের। এ-টিম একটু দূরে, সেখানে কি ক'রে ঝগড়া হ'ল, কখন হ'ল সে দেখবার আমাদের অবকাশ কোথায় ? তবে ঝগড়া হ'লে শুনলাম। বোর্ডিংয়ের ছেলেদের দলপতি—মনিটার—ক্যাপ্টেন—তিনিও কিন্তু গ্রামের ছেলে। স্বর্গীয় যাদবলাল বাবুর প্রথম দৌহিত্র শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। লাভপুরেই বাড়ী—অন্তত তখন ছিল; মস্ত মনোহর তিনতলা বাড়ী। তবুও ধীরেনবাবু থাকতেন বোর্ডিংয়ে, ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়তেন তখন।

এ দিকের নেতা—শ্রীযুক্ত কালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় আর শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁদের পিছনে গ্রামের ছাত্র এবং প্রাক্তন ছাত্রেরা অর্থাৎ বেকার যুবক সম্প্রদায় পর্য্যন্ত।

তার উপর গ্রামে তখনও সমানে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব চলেছে, স্কুল-প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যাদবলাল বাবুর বংশধর এবং গ্রামের ছাত্রদের অভিভাবকদের মধ্যে।

এরও পরে—গ্রামের ছেলেরা নানা আধুনিকতম আন্দোলন, ফ্যাশন হুজুগের সঙ্গে যোগ রেখেই নিজেদের মনে ক'রে দিগ্‌গজ; পড়াশুনায় এমন অবহেলা ক'রে যে, কোন রকমে দু কুড়ি সাতের খেলাও বজায় থাকে না;—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ মার্ক তিরিশের জায়গায় মেরে কেটে পঁচিশ ওঠে। কেবল ইংরিজী এবং বাংলাতে কোনক্রমে পাশটা ক'রে যায়। তাদের চুল ছাঁটার ঢং, টেরীর বাহার, কামিজের ঝুল, ইস্কুলের অন্য ছেলেদের অন্তরে অতৃপ্তির অশান্তি জাগিয়ে তোলে।

এই দুটো কারণেই মাস্টারেরা একটু বিরূপই ছিলেন গ্রামের ছেলেদের উপর। গ্রামের বাবুদের ছেলেরা বেশ একটু বিলাসী, একটু আইনজ্ঞ, হয়তো বা একটু উচ্ছৃঙ্খলও ছিল, সেই কারণেই মাস্টারেরা বিরূপ ছিলেন। এখানে আইনজ্ঞ কথাটা একটু দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। কিন্তু স্কুলেও আইন আছে, সে আইন অন্য ছেলেরা বিশেষ জানত না এবং জানলেও কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকেরা কেউ তা লঙ্ঘন করলেও সে আইন দেখাত না। এরা তা দেখাত। একটি গল্প—গল্প নয়, সত্য কথা বলি। আমাদের 'রাধা দাদা' ছিলেন। রাধা দাদা আমাদের বাড়ীর ভাগ্নে গোষ্ঠীর ছেলে; আমাদের প্রতিবেশী; দিব্যি ফুটফুটে চেহারা, মাথায় কার্তিকের মত কোঁকড়া চুল; বাপমায়ের বড় আদরের শেষ সন্তান। রাধা দাদাই আমাদের ইস্কুলের প্রথম ছাত্র। ইস্কুলের প্রথম ছাত্রভর্তির খাতাখানি আজও আছে—তারি প্রথম পাতাতেই—No. 1. সংখ্যার পাশেই লেখা আছে তাঁরই নাম—শ্রীরাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায়। একদা কোন একটা অপরাধের জন্য মাস্টার উঠে গিয়ে রাধা দাদার চুল ধরে পিঠে গালে কিল চড় মেরে তাকে পর্যুদস্ত ক'রে বললেন—Stand up on the bench. রাধা দাদা শিক্ষকের দিকে একবার বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দিব্য বসে রইল।

মাস্টার হাঁকলেন—You, Radhashyam!

রাধাদাদা ঘাড় ফেরালে।

—Stand up on the bench. Stand up.

—ন্—ন্—নো। রাধাদাদা তোত্‌লা ছিল।

—You. Stand up.

—ন্—ন্—নেভা-ভা-র!

—আমি বলছি। রাধাশ্যাম!

—আ-আ-প প—আপনিই হোন আর যিনিই হোন—বে আইনী অর্ডার আমি কারুর শুনব না। জজ ম্যাজিস্ট্রেটেরও না। নে—নে—ভার।

—হোয়াট? বে-আইনী অর্ডার?

—ইয়েস। বে বে-বে আইনী অর্ডার।

এবার আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন মাস্টার; বে-আইনী কথা? কি বে-আইনী কথা!

—ইয়েস—বে-আইনী অর্ডার। একসঙ্গে দুটো পানিশমেণ্ট হ'তে পারে না। মেরেছেন—বাস্ হয়ে গিয়েছে। যদি না-মেরে বলতেন—Stand up on the banch—দাঁড়াতাম বেঞ্চের উপর। মার, বেঞ্চের উপর দাড়ানো—দু—দুটো পা-পা-পানিশমেণ্ট হ'তে পারে না একসঙ্গে।

এ আইন কোথায় আছে তা জানি না। তবে রাধাদাদার আইন-সম্পর্কে ধারণাটা যে সূক্ষ্ম সে সত্য অস্বীকার করবার উপায় কোথায়? অপরাধ যেখানে একটা সেখানে শাস্তি দুটো তো হওয়া উচিত নয়; পেনাল কোডে অনেক অপরাধে দ্বিবিধ শাস্তির বিধান আছে; আছে—দুটোর একটা বা দুটোই প্রযুক্ত্য হতে পারে। কিন্তু অপরাধী এ কথা বলতে নিশ্চয় পারে। যাক সে কথা। রাধাদাদা কোন মতেই দাঁড়ায় নি সেদিন।

আরও একবার—রাধাদাদা এমনি আইনের বলে প্রমোশনই নিয়ে নিলে। বছর তিনেক এক ক্লাসে থেকে—সে বছর সটান হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে বল্লে—আইন অনুসারে প্রমোশন আমি পাব এবার। আমি প্রমোশন নিলাম!

সেবার রাধাদাদা পরীক্ষাই দেয় নি। হেডমাস্টার বললেন—কি? দু-বছর পরীক্ষায় ফেল ক'রেছিস—এ বছর পরীক্ষাই দিসনি। প্রমোশন নিবি কি?

—এবার পরীক্ষা দিলে—নি-নি-নিশ্চয় পাশ করতাম। শরীর খা-খারাপ ছিল—ডা-ডা-ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে পারি আমি।

তাতে হেডমাস্টার মশায় অবিশ্বাস করলেন। তিনি নিজেই ধরতে পারেন না গ্রামের ছেলের অসুখ খাঁটি কি না। মেলা খেলার সময় মাথায় সাবান ঘষে গায়ে কাপড় মুড়ি দিয়ে ছেলে এসে দাঁড়াল—স্যার অসুখ করেছে। জ্বর এসেছে।

কপালে হাত দিয়ে স্যার দেখলেন—সত্যই জ্বর বলে মনে হচ্ছে। ছুটি দিলেন। বাড়ী ফিরে মাথায় তেল দিয়ে পুনরায় স্নান করে টেরী কেটে ছোকরা সেজে সিগারেট মুখে চলে গেল মেলা। খবরও পেলেন মাস্টার। শুনলেন—বগলে রশুন টিপে ঘণ্টাখানেক বসেছিল ছোকরা। এমন বিদ্যা অনেক জানে ওরা। অসুখে অবিশ্বাস না ক'রে মাস্টার মশায় রাধাদাদাকে বললেন—ভাল, এ বছর যে তুই ভাল ক'রে পড়াশুনা করেছিস—ক্লাস টিচারদের কাছে লিখিয়ে নিয়ে আয়।

—কতজনের কাছে ঘু-ঘু-ঘুরব আমি?

—একজনের কাছে লিখিয়ে নিয়ে আয়।

হেডমাস্টার জানতেন—কোন শিক্ষকই তা' দেবেন না।

কিন্তু তাই নিয়ে এল রাধাদাদা। ড্রিল মাস্টার—আমার মাস্টার ব্রজেন্দ্র পণ্ডিতের কাছে লিখিয়ে আনলে—রাধাশ্যাম ড্রিলে সত্যিই ভাল। এবং প্রমোশন নিলে রাধাদাদা ওরই জোরে—আইনের বলে।

রাধাদাদার মধ্যে তবু তো একটি আনন্দময় মানুষ ছিল যার জন্য তার আইন দেখানোটাও কৌতুক গুণে তিক্ত বা মর্য্যাদাহানিকর মনে হ'ত না। কিন্তু অন্য-অন্য ছেলেদের উত্তর-প্রত্যুত্তরে শিক্ষকেরা ক্রোধে আত্মহারা হয়ে যেতেন। এবং ভয়ও করতেন। আমাদের গ্রামের নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ভাল ছেলে, সে আমলে তিনিই ছিলেন আমাদের ওখানকার তারুণ্যের প্রতীক। তিনিই আমাদের ইস্কুলের প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ছাত্র। ইস্কুল খোলার বছরেই ফার্ষ্ট ক্লাসে এসে ভর্ত্তি হয়েছেন। কি অপরাধে ইস্কুল সুপারিণ্টেডেণ্ট অবিনাশবাবু তার দণ্ড বিধান করলেন—**Three Canes**,—

তিনটি বেত্রাঘাত এবং সে বেত্রাঘাত হবে ইস্কুলের হলে, সকল ছাত্রের সম্মুখে। কিন্তু সে বেত্রাঘাত করবে কে? মাস্টারেরা নীরবে মাথা হেঁট ক'রে রইলেন। তখন হেডমাস্টার ছিলেন শশী রায়। অগাধ পাণ্ডিত্য—নাস্তিক মানুষ। কিন্তু দুরন্ত ভীতু লোক। তিনি বললেন—আমি পারব না। একজন এগিয়ে এলেন। তাঁর নাম আজ ঠিক মনে নেই। তবে লচু মাস্টার বলেই তিনি পরিচিত ছিলেন। লচু মাস্টার বেত হাতে নিয়ে ইস্কুলের হলে, সর্ব্বসমক্ষে টুলের উপর দণ্ডায়মান গোপালবাবুর পিঠে—ওয়ান—টু—থ্রি বলে বেত চালালেন। এর কয়েক দিন পরেই একদিন রাত্রে লচু মাস্টার লণ্ঠন হাতে ছাত্র পড়িয়ে গ্রাম থেকে বোর্ডিংএ ফিরছেন—এমন সময় কার নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ-লক্ষ্য লোষ্ট্রাঘাতে লণ্ঠন চুরমার হয়ে গেল। কানের পাশ দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঢেলা ডাক দিয়ে বেরিয়ে গেল; লচু মাস্টার ছুটলেন, ছুটে বাঁচলেন। এবং কয়েক দিন পরেই কাজে জবাব দিয়ে চলে গেলেন।

এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছাত্র শম্ভু সরকার গোখ্‌রো সাপের বাচ্ছা ধ'রে ছুরি দিয়ে বিষ দাঁত ভেঙে পকেটে করে নিয়ে বেড়ায়। মাস্টারে কানে হাত দিলে বলে, খবরদার, গুরুর কান।

মাস্টার পিছিয়ে আসেন সভয়ে। কানে গুরু থাকলে পিঠে বাবা মহাদেবের বাহন ষাঁড় বাস করেন না—কে বললে? গালে রামভক্ত হনুমান থাকেন না কে বললে? মনে হয়তো জেগে ওঠেন গোমাতা সুরভির ছবি—প্রতি লোমকূপে বাস করেন এক এক দেবতা।

ওদের চেয়ে যারা ছোট, যারা ফিফ্‌থ্‌-সিক্‌স্‌থ্‌ ক্লাসে পড়ে, তারা বেত্রাঘাত করলে যন্ত্রণায় মাথা ঘোরানোর অছিলায় হঠাৎ পেটে ঢুঁ মেরে বসে, ব্যাপারটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যায় ব্যাখা করা যায় না; তাতে শিক্ষকের বেত্রাঘাতের সময় [illegible] মাত্রাজ্ঞান-হীনতাই প্রকট হয়ে পড়ে।

এই পটভূমিতে, মাস্টার মশায়েরা বোর্ডিংয়ের ছেলেদের পক্ষেই যদি ন্যায় দেখে থাকেন তবে ন্যায়-অন্যায়-ছেড়ে দিয়েও অস্বাভাবিক বলব কি ক'রে? এবং আজ বুঝতে পারি সে-দিন অন্যায় যদিই বা ছিল বোর্ডিংয়ের পক্ষের,

তবুও আভিজাত্যের ঔদ্ধত্যটা যে এ পক্ষের অসহনীয় পরিমাণেই ছিল তাতে কোন সন্দেহই নাই। এবং আরও একটু কিছু ছিল। সেটা হ'ল-ইস্কুল প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি মাস্টার মহাশয়ের অশোভন এবং ন্যায়হানিকর আনুগত্য। সুদীর্ঘকাল—অন্তত গোটা ইংরাজ রাজত্বের আমল ভোরই—শিক্ষকেরা সরকারী ইস্কুল হ'লে সরকারের এবং বেসরকারী ইস্কুল হ'লে—সরকার ও সরকারী কর্ম্মচারীর সঙ্গে ইস্কুল প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি যে সকৃতজ্ঞ আনুগত্য পোষণ ও প্রকাশ ক'রে এসেছেন তাতে বহুক্ষেত্রেই বিচার সূক্ষ্ম হতে পায় নাই। লাভপুরের ছেলেদের বহু অন্যায়ের সঙ্গে শিক্ষকদের মানসিকতায় এই অন্যায়টুকু নিঃসন্দেহে ছিল। তবে তা ক্রমশ-ক্রমশ কমে এসেছে। এটা কিন্তু গোড়ার দিকে বেশী ছিল।

এই সব কারণেই ঝগড়াটা একদিনেই চরমাকার ধারণ করলে। সে দিন ইস্কুলে গিয়ে হঠাৎ হেডমাস্টার মশায়ের তীক্ষ্ণকণ্ঠের ক্রুদ্ধ উচ্চ চীৎকারে একবারে হতচকিত হয়ে উঠলাম আমরা—অর্থাৎ বালক বৃন্দ।

চীৎকার উঠছিল—নিকালো। আভি নিকালো। নেহি মাংতা হ্যায় তুমকো মাফিক ষ্টুডেণ্ট—হাম নেহি মাংতা হ্যায়। Get out, Get cut.

দেখলাম লাইব্রেরী থেকে গলায় ধ'রে হেডমাস্টার মশায় রামগোপালকে বের ক'রে দিচ্ছেন।

রামগোপাল বেরিয়ে চলে গেল।

শুনলাম ফুটবল মাঠের ঝগড়ার বিচার হয়ে গেল।

সেই দিনই গ্রামে ফুটবল ক্লাবের পত্তন হয়ে গেল। দি ফুল্লরা এ্যাথেলেটিক ক্লাব। ক্যাপ্টেন—সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় ক্লাবের পত্তন হ'ল, রাত্রেই গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে বিস্তীর্ণ সমতল সবুজ প্রান্তরে মাঠ তৈরী আরম্ভ হয়ে গেল। পরদিন অপরাহ্ণে আমরা দেখতে গেলাম;—তাঁরা নিজেরাই কোদাল ধরে খেলার মাঠের দাগগুলি কাটছেন। দড়ি ধরে সোজা লাইন, সবুজ ঘাসের মধ্যে বীরভূমের লাল মাটির লালচে দাগ চলে গেছে, দুপাশে গোলপোষ্টও পোতা হয়েছে, চার কোণে চারটি লাল পতাকা উড়ছে; নতুন একটা ফুটবলও এসেছে এরই মধ্যে; কেমন ক'রে এল তা জানি না। তবে

এসেছিল। হয় তো দিনটা ঠিক পরের দিন না হয়ে আরও একদিন পরে হতে পারে। সম্ভবত কলকাতায় লোক পাঠিয়ে আনানো হয়েছিল।

গ্রামে তখন ছাত্র আর প্রাক্তন ছাত্র নিয়ে যে টিম সে প্রায় দুর্দ্ধর্ষ মোহনবাগান। সত্যই তাঁরা খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। বিশেষ ক'রে কয়েকজন। রজনীদা সেণ্টার ফরওয়ার্ড, বাঁ-পা ডান-পা সমান চলে এবং পায়ের বল চলে এঁকে বেঁকে পাশ কাটিয়ে—কারও সাধ্য হয় না সে বল স্পর্শ করে; শুধু বল গোলের পাশ দিয়ে চলে যায় এই দোষ, আর কেউ রজনীদার দিকে বাঙ্গ ঠুকে এগিয়ে গেলেই তিনি বল ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ান; ওসব গুঁতোগুতির মধ্যে তিনি নাই। আর আছে রামগোপাল—সে সত্যই দুর্দ্ধর্ষ, সে সবেই রাজী,—তাকেই সকলের বেশী ভয়। সে উত্তর জীবনে খেলার জন্যে কলকাতার G. P. O.-তে চাকরী পেয়েছিল। আর আছে ওরম্বা—ফুলব্যাক। এরা ছাড়া—সুধীরবাবু কালিকিংকরবাবু, এঁরাও ভালোই খেলেন।

দিন কয়েক, বোধ হয়, দিন সাতেক পরেই স্কুলের ভিক্টোরিয়া এ্যাথেলেটিক ক্লাবের সঙ্গে ফুল্লরা এ্যাথেলেটিক ক্লাবের ম্যাচ হয়ে গেল। সে আমাদের কি উৎসাহ! দেবে, অন্তত পাঁচ সাতখানা গোল দেবেই ফুল্লরা এ্যাথেলেটিক ক্লাব।

রাধারাঁদা খেলে না কস্মিন কালে, সে ফুল্লরা ক্লাবের উৎসাহ দাতা মোহনবাগানের ভাগ্যেও বোধ করি এমন উৎসাহদাতা দু একটির বেশী নেই। ঝিপ ঝিপ করে বৃষ্টি নেমেছে সকাল থেকে; অপরাহ্ণে খেলার আগেই প্রচণ্ড বর্ষণ হয়ে গেল। ভাগ্য মোহনবাগানের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তবে মাঠ আমাদের বিচিত্র, যতই বৃষ্টি হোক, পা পেছলাবে না। বরং একটু নরম হবে মাটি। খেলোয়াড়েরা বিয়ার খাওয়া ঘোড়ার মত বোধ হয় বুঁদ হয়ে ছিলেন; বল পেলেই ছুটবেন হলদীঘাটের চৈতকের মত। সামনে কেবল বাধা—ফুলব্যাকে গোবিন্দমাস্টার, দি ওয়াইল্ড এলিফ্যাণ্ট; তা' সকলেই চৈতকের মত জোড়া পা—তাঁর শুঁড়ের উপর তুলে দিতে বদ্ধ পরিকর। শুধু একটু কাবু হয়েছেন ঘণ্টাখানেক মুক্ত প্রান্তরে প্রবল বর্ষণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে।

জল কম পড়লে—রিমি-ঝিমির মধ্যে এল ভিক্টোরিয়া ক্লাবের দল। খেলোয়াড়েরা দাঁড়াল—দেখলাম আমাদের ক্যাপ্টেন ও সেণ্টার হাফব্যাক সুধীর বাবু মাঠের বাইরে একটা বন্দুক হাতে দাঁড়ালেন ; হুইসিল পড়বামাত্র তিনি ফায়ার করলেন একটা। তারপরই বন্দুকটা ফেলে ছুটে গিয়ে নিজের জায়গা নিলেন।

আমাদের গোলে খেলছে রামধারী তেওয়ারী ; থানার হেড কনেষ্টবল তার কাকা—তাকে এখানে ইস্কুলে পড়াবার জন্যে এনেছে। বেশ একটু টান থাকলেও বাংলা ভালই বলে। লম্বা চেহারা, চেহারার অনুপাতে হাত দুখানা আবার বেশী লম্বা—আজানুলম্বিত যাকে বলে তাই। তার নাগালের বাইরে দিয়ে বলের যাওয়া খুব সহজ নয়। আর এখানে এসে অবধি রামধারী এই সাধনাটিই নিয়মিত করেছে। তার কাকা বীরভূমেই এ-থানা ও-থানা ক'রে বেড়িয়েছে। রামধারী কাকার পরিত্যক্ত বাসায় স্বপাকে খেয়েছে, সিদ্ধি ঘুঁটেছে আর গোলে নিয়মিত গোলকীপারি করেছে আর নিয়মিত ফোর্থ ক্লাসেই পড়েছে। বোধ হয় সাত আট বছরে মাত্র তিনটি ক্লাসের পড়া শেষ ক'রে সে হঠাৎ একদা গেরুয়া প'রে বেরিয়ে গিয়েছিল। যাক। খেলার কথা বলি। খেলা সুরু হ'ল—দুর্দ্দান্ত খেলা। বেমক্কা বল ছুটতে লাগল। বোর্ডিংয়ের দলই কাবু হয়েছে কিন্তু বল গোলের দিকে যাচ্ছে না। মধ্যে মধ্যে গুঁতোগুঁতি হচ্ছে। বিলিতী মাস্টার বল ঠেঙাচ্ছেন; আবার আসছে আবার ঠেঙাচ্ছেন। হঠাৎ বলটা একবার হাফব্যাক লাইন পেরিয়ে চলে গেল ফুল্লরা ক্লাবের দিকে। বল পেলে ফুল্লরা ক্লাবের হাফব্যাক। সে বলটাকে ধাঁ ক'রে নিজেদের গোল লক্ষ্য করে মেরে দিলে। রামধারীও আশ্চর্য্য, সে ধরলে না। গোল হয়ে গেল, সেমসাইড গোল।

তখন বোধ হয় সেমসাইড গোল, গোল বলে পরিগণিত হ'ত না। অন্তত সে খেলায় হয়নি। ভিক্টোরিয়া ক্লাবের এঁরাও দাবী করেন নি। ব্যাক লাইন থেকেই বলটা মারা হল। রাধাদাদা ছুটে গিয়ে হাফব্যাককে বললে—এ—এ—কি—কি—হল ? গা—গা—গাধা কোথাকার ?

হাফব্যাক এ গোলটা ভিক্টোরিয়া ক্লাবের গোল মনে করেছিল সিদ্ধির

ঝোঁকে। অথবা পায়ের বে-ঠিকে এ-দিকে মারতে ও-দিকে মেরে দিয়েছে। সে বললে, ওদের ফরওয়ার্ড বাঘের মত এসে পড়েছিল—তাই আমিই মেরে দিলাম, আমি না-মারলে সে মেরে দিত। কি হ'ত তখন? রামধারী তো ঢুলছে।

রামধারী বললে—রামধারী ঢুলে না দাদা। সে ঠিক দেখেছে! ওরা মারত রামধারী জান দিয়ে ধরত। কিন্তু সেম সাইড বল রামধারী ছোঁবে কোন মুখে! ছো—ছো—ছো! লজ্জা নাই রামধারীর!

যাক, এই ভাবে প্রথম খেলা শেষ হ'ল।

এরই ঠিক কয়েকদিন পরেই গ্রাম-জীবনের বিচিত্র আকর্ষণে আমি পড়ে গেলাম এই দ্বন্দ্বের মধ্যে—মধ্যে নয়—ফুল্লরা ক্লাবের পুরোভাগে সকলে আমাকে খাড়া ক'রে দিলে।

ব্যাপারটা হ'ল এই।

যে জায়গায় ফুল্লরা ক্লাব খেলার মাঠ তৈরী করেছে—সে জায়গাটির মত খেলার উপযুক্ত জায়গা কদাচিত পাওয়া যায়। সবুজ ঘাস ভরা সুন্দর সমতল প্রান্তর। স্থানটি বিস্তীর্ণ। পাশাপাশি তিন চারটি খেলার মাঠ হ'তে পারে। ইস্কুলের মাঠটি ইস্কুলের কাছে কিন্তু বীরভূমের তৃণহীন রুক্ষ পাথুরে ভাঙা; সেখানে মা ধরণী ব্যাঘ্রীর মত হিংস্র। বাচ্চা আঘাত করলে বাঘিনী যেমন প্রতিশোধে কামড়ে রক্ত দেখে ছাড়ে, তেমনি ভাবেই এখানে কেউ মাটিকে আঘাত দিয়ে আছাড় খেলে মাটিতে খানিকটা মাংস রক্ত রেখে উঠতে হয়। এই সবুজ মাঠখানি ইস্কুল থেকে দূরে বলে—হেডমাস্টার মশায় এ-দিকে আসতে দেন নি। তা ছাড়া এ জায়গাটি ইস্কুল-কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি নয়। যে স্থান তাঁদের সম্পত্তি নয় সেখানে তাঁদের ইস্কুলের ছাত্ররা খেলবে এটা তাঁরাও অনুমোদন করতেন না। এবার ফুল্লরা ক্লাবের ছেলেরা এখানে খেলতে সুরু করায় বোর্ডিংয়ের ছেলেরা ধীরেন্দ্রবাবুর নেতৃত্বে এখানে এল খেলতে। খেলার মাঠ তারা দাগ দিয়ে ছ'কে গেল।

ফুল্লরা ক্লাবের ছেলেরা এসে আমাকে টেনে দাঁড় করালে সামনে।

আমি হ'লাম ফুল্লরা ক্লাবের বি টিমের ক্যাপ্টেন। এক মুহূর্তে সি-থেকে বি-এ প্রমোশন এবং একেবারে কমিশন লাভ—ক্যাপ্টেন পদ প্রাপ্তি।

এর কারণ ওই বিস্তীর্ণ মাঠটি আমাদের মহলের সীমানাভুক্ত, জমিদারের খাস পতিত।

আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে ভিক্টোরিয়া ক্লাবের সঙ্গে ঝগড়া হ'ল। ভিক্টোরিয়া ক্লাবকে স্বত্বের মামলায় পরাজিত হয়ে হ'টে যেতে হ'ল। তারা ফিরে গেল ক্রুদ্ধ হয়ে, ক্ষুব্ধ হয়ে। আমরা প্রচণ্ড উৎসাহে খেললাম সেদিন। আমি ক্যাপ্টেন। সে দিন বুঝলাম না কি হ'ল। ফুল্লরা এ্যাথেলেটিক ক্লাব আমার ঘাড়ে চাপল। বছর তিনেক এরপর সুধীরবাবু কালিকিঙ্কর-বাবুরা ছিলেন—তারপর তাঁরা চলে গেলেন। আমার ঘাড়ে ফুল্লরা ক্লাব চেপে রইল। আমি, বীরেশ্বর বংশী—নিত্য যাই, বল খেলি—বাড়ী এসে ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ি। ইস্কুলে হেডমাস্টার মশায় বিরূপ হলেন আমার উপর। গ্রাম্য দ্বন্দ্বের সূত্রে প্রচ্ছন্ন বিরূপতা একটু ছিলই। এ কথা নিঃশংসয়েই বলছি। সেটা বাড়ল, প্রকাশ পেলে এইবার। তাতে সহসা ঘৃতাহুতি পড়ল একটি ঘটনায়।

হেডমাস্টার মশায় গ্রামে-বোর্ডিংএ ম্যাচ নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন।

আমি এবং বীরেশ্বর একদিন পরামর্শ করলাম—আর তো ভাল লাগে না ভাই। শক্তি পরীক্ষা না-ক'রে আর তো থাকা যায় না। যার সঙ্গে হোক ম্যাচ খেলে তাদের হারিয়ে দিয়ে নিজেদের ধ্বজা না-ওড়ালে—বৃথাই এ জীবন!

অতএব ম্যাচ খেলা স্থির হল আমাদের গ্রাম থেকে সাতমাইল দূরের কীর্ণাহার ইস্কুলের টিমের সঙ্গে।

আমি তখন ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, বয়স বারো। বীরেশ্বর থার্ড ক্লাসে, তার বয়স চৌদ্দ। সুতরাং এ টিমের সঙ্গে কৌশলে যদি বা পারি শক্তিতে পারব কেন?

চ্যালেঞ্জ করা হ'ল। তাঁরা যুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এলেন। বেলা তখন প্রায় এগারটা। এলেন প্রায় পঁয়ত্রিশ জন। আমরা এগারো জনের

চাল ডাল মাছ তরকারী জোগাড় করেছি—পঁয়ত্রিশজনের খাদ্য বেলা বারোটায় কোথায় পাই। তবে পাওয়া গেল ; বহু কষ্টে দেবস্থান ফুল্লরাতলায় খাবার ব্যবস্থা করলাম। খেতে বেলাও গেল—কষ্টও হ'ল। আর তাঁরা এসেছেন প্রত্যেকেই আঠারো থেকে বিশ বছরের ছেলে—অর্থাৎ এ-টিম। এ দিকে বোর্ডিংয়ের ছেলেরা খবর পেয়ে এগিয়ে এলেন। মিল হয়ে গেল দু পক্ষের অর্থাৎ গ্রামে ও বোর্ডিংয়ে। একটা মিলিত টিম তৈরী হ'ল। এঁরা বেঁকে বসছেন। আমাদের যোগ্য সম্মান হয় নি। খেলব না। প্রচুর রসগোল্লা এল তাঁদের সম্মানও করা হ'ল—খাওয়ানোও হ'ল। তাঁরা খেয়ে দেয়ে শেষ মুহূর্তে চলে গেছেন, খেললেন না!

কয়েক দিন পরেই হেডমাস্টার আমাকে ডাকলেন। বেত্রাঘাত করলেন এবং জরিমানা করলেন—পাঁচ টাকা। ওদের হেডমাস্টার চিঠি লিখেছেন—তাঁর ছাত্ররা অভিযোগ করেছে। আমার হেডমাস্টার মশায় কিন্তু একবারও আমাকে আমার কথা বলবার সুযোগ দিলেন না।

পিসিমা, মা বাড়ী বসেই শুনেছিলেন।

বাড়ী থেকে লোক এল—পাঁচটি টাকা নামিয়ে দিয়ে বললে—তারাশঙ্কর বাবুর জরিমানা।

হেডমাস্টার মশায় বললেন—ফুটবল খেলা তোর বন্ধ।

আমি কিন্তু সেই দিনই যথা নিয়মে গেলাম ফুটবল খেলতে। চিত্তে বোধ হয় বিদ্রোহ এমনি করেই জাগে।

পাঁচ

সেই বোধ করি আমার জীবনে প্রথম বিদ্রোহ উপলব্ধি।

এর আগেও কি পারিপার্শ্বিকের বন্ধন, পীড়াদায়ক আদেশ, অতৃপ্তিকর অরুচিকর যা কিছু সে সমস্তকে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করি নি? করেছি—অনেকবার করেছি। বাল্যে বাড়ীর গণ্ডীর মধ্যে সে তো বারবার বহুবার ঘটেছে। শৈশবে যখন কথা ফোটেনি তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করলে, খাওয়াবার চেষ্টা করলে চীৎকার ক'রে বাড়ির শান্তি ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে কেঁদেছি, সেও বিদ্রোহ। কিন্তু তবু বলব—সে বিদ্রোহে আর এ বিদ্রোহে প্রভেদ আছে। হেডমাস্টার আদেশ করলেন—ওই গ্রামের ফুটবল টিম ফুল্লরা ক্লাবে আমি খেলতে পাব না। তিনি জানতেন আমি ছেড়ে দিলেই ওটা উঠে যাবে। ইস্কুলের ফুটবল ক্লাবে আমার খেলা বন্ধ করেন নি। সেখানে খেলতে গেলে তিনি খুসীই হতেন হয় তো। কিন্তু খেলার কথাটা তখন প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন অন্য। আমার প্রশ্ন—অধিকার নিয়ে। কোন অন্যায় করি নি, তবু কেন আমি দণ্ডিত হলাম? শুধু প্রশ্নও নয়—ক্ষোভও ছিল। ক্ষোভ এই যে, ওদের ইস্কুলের শিক্ষক—নিজেদের ছাত্রের কাছে যা শুনলেন—তাই বিশ্বাস ক'রে পত্র লিখলেন। আর আমার ইস্কুলের শিক্ষক একবারও আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন না—আমার কি বলবার আছে? তাছাড়া, ফুল্লরা ক্লাব তখন আমার কৈশোর-কীর্ত্তির কুতুবমিনার। আমি তার ক্যাপ্টেন। সেই কীর্ত্তিস্তম্ভকে কেউ যদি নিজের হাতে ভূমিসাৎ ক'রে দিতে বলে—তবে কি তাই কেউ পারে? রক্তচক্ষু আদেশ-কর্ত্তা যত জোরে উচ্চারণ করেন—ভাঙো ঠিক ততজোরেই প্রতিধ্বনি ফিরে আসে—বিদ্রোহী আদিষ্টের বুক থেকে—না।

আমার বিচারে উপলব্ধিতে আমার দিকে কোন ত্রুটি ছিল না। তাতেই পেলাম আমি অপরিমেয় শক্তি। সমস্ত দিন আমি নীরবে চিন্তা করলাম। ইস্কুলের পড়া এক বর্ণ আমার কানে গেল না। আমি ভাবলাম—শুধু

ভাবলাম। কিছুতেই আমার অন্তর ওই আদেশ পালন করতে সম্মত হ'ল না। যে মুহূর্ত্তে ভাবতে চেষ্টা করলাম—যে, না—যাব না সেই মুহূর্ত্তেই বুকের ভিতরটায় একটা প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হ'ল, সে যেন একটা ঘূর্ণাবর্ত্তে অন্তরটা মূলসুদ্ধ উপড়ে পড়বে ব'লে মনে হ'ল, চোখ ফেটে জল এল, ঠোঁট দুটি থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। একটা প্রশ্ন—শতবার শতদিকে ধ্বনিত হয়ে উঠল—কেন? কেন? কেন? কেন?

আজও মনে করতে পারি।

চোখ জ্বালা করছিল; আগুনের শিখার মত কিছু যেন আমার অন্তরকে দগ্ধ করছিল; মাথার ভিতরে চিন্তার শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; চোখের দৃষ্টিতে সব যেন অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল।

বাড়ী ফিরলাম।

জল খেলাম। তারপর বৈঠকখানায় গিয়ে যে আলমারীতে আমার ফুটবল থাকত, তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ধীরে ধীরে বলটি বের করলাম, হুইসিলটি গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। মনে তখন আর প্রশ্ন নাই, শঙ্কা নাই, চোখের সম্মুখে পৃথিবী তখন অর্থহীন নয়, বুকের ভিতর সমস্যার, অমীমাংসার কোন উদ্বেগ নাই, আমি পথের উপর নামলাম। সামনে আমাদের গ্রাম্য রাস্তা মাঠের দিকে চলে গিয়েছে, মাঠ ভেঙে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে—চললাম খেলার মাঠে। মুখের বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলেছি। ডাক দিয়ে চলেছি। এস—এস। শান্ত দৃঢ় পদক্ষেপ, ভয়শূন্য চিত্ত, চিন্তাশূন্য অন্তর, মাথা উচু করেই পথ হেঁটে এসে গ্রাউণ্ডে পৌঁছেই বলটাকে সবল পদক্ষেপের আঘাতে উর্দ্ধলোকে পাঠিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরেশ্বর এবং বংশী এসে উপস্থিত হ'ল। আরও একজন বোধ হয় ছিল—বোবা দ্বিজপদ। তারা আমার আগেই এসেছে; মনের বেদনায় তারা খোলামাঠের ওদিকে বীরভূমে প্রসিদ্ধ খোয়াইয়ের মধ্যে বসে ছিল। ভীরাক্রান্ত হৃদয়ে—তারা কেঁদেছিল হয় তো। ফুটবলের শব্দ পেয়ে তারা ছুটে এসে উপস্থিত হ'ল। তারপর বাইশজনের বদলে—চারজনে খেলা সুরু হ'ল। দল নাই, গোল নাই, শুধু ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা। সে দিনের সে

কি খেলা! বীরেশ্বরের সেদিনের কি শট। বংশীর সে কি ড্রিবলিং। উল্লাসে-আনন্দে চারজনে আমরা যেন স্নান ক'রে উঠলাম। প্রসন্ন পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

এর পর এল চিন্তার পালা।

বিদ্রোহ করেছি—এর পর কাল ইস্কুলে বিদ্রোহ দমনের বেত্রহস্ত শক্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। সমস্ত রাত্রি ঘুম হ'ল না। ভয় নয়, শুধু চিন্তা করলাম—কি বলব? কেমন ভাবে বলব? জানি বেত্রাঘাত হবে, সে বেত্রাঘাত কেমন ভঙ্গিতে সহ্য ক'রব—সেই চিন্তা করলাম—ছবি আঁকলাম। কল্পনা করলাম, আবার কাল বৈকালে বেত্রাঘাত-জর্জ্জরিত দেহে ফুটবল হাতে নিয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলব—খেলার মাঠে।

আমার পিসীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে রে? সমস্ত রাত্রিই জেগে রয়েছিস। নড়চিস, এ-পাশ ও-পাশ করছিস।

আমার পিসীমা—আমার জীবনের এক বৃহৎ অধ্যায়। আমার মা, আমার বাবার পর এই পিসীমাই আছেন আমার জীবন জুড়ে। তিনি আমার কৈশোর জীবনের ছায়াছত্র। পিতৃবিয়োগের পর, তিনিই বসেছেন আমার পিতার আসনে। আমাদের ঘর সংসার বিষয় আশয় তাঁরই অঙ্গুলি নির্দ্দেশে পরিচালিত হয়। রোগ-মৃত্যু এবং দৈব দুর্ঘটনার কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্ব্বল, কিন্তু বাস্তব পৃথিবীর অপর কিছুতে তাঁর বিন্দুমাত্র শঙ্কা ছিল না। অসীম সাহসে তিনি দাঁড়াতে পারতেন। বাবার তিরোধানের পর প্রাচীন কালের বিষয়ী ঘরের আভিজাত্য-মহিমা তাঁকে আশ্রয় করেই আমাদের সংসার অক্ষুণ্ণ এবং অটুট ছিল।

আমার বয়স তখন তের বৎসর। পিসীমা এবং আমি এক ঘরে শুই। স্নেহময়ী আপন শয্যায় শুয়েও বুঝতে পেরেছেন আমার নিদ্রাহীন অবস্থার কথা। একসময় তিনি প্রশ্ন করলেন। উঠে এসে বসলেন আমার মাথার শিয়রে।

—কি হয়েছে?

গায়ে হাত দিয়ে উত্তাপ দেখলেন। মাথায় হাত দিলেন।—শরীর খারাপ হয়েছে ?

—না।

—তবে ? ঘুম আসছে না কেন ?

চুপ করে থেকে বললাম—কি জানি ?

তিনি এবার আলো জ্বালালেন।—বল্‌তো কি হয়েছে।

—কি বলব ? হয়নি কিছুই।

—হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি তোর মুখ দেখে। বল্‌।

বলতে হ'ল। বললাম।

তিনি চুপ ক'রে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—তখনই আমি বলে-ছিলাম জরিমানার টাকাটা এমন করে দেব না। দিতে হ'লে—আমি যাব, মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করব—বিচার তিনি করেছেন কি না। তারপর দেব। কিন্তু বউ বললে, না। কোন কথা বলবার দরকার নাই। বাদ-প্রতিবাদ কিছু না-করেই টাকাটা পাঠিয়ে দাও।

তারপর আবার বললেন—বারণই যদি করেছিল মাস্টার তবে তা শুনলি না কেন ? গেলি কেন খেলতে ?

—খেলা কি অন্যায় ?

—অন্যায় নয়। কিন্তু ওখানে খেলতে বারণ করেছিল, ওখানে না খেলে ইস্কুলে খেললেই হ'ত।

—ওখানে খেলতে গিয়েও তো কোন দিন কোন অন্যায় করি নি। তবে যাব না কেন ?

পিসীমা চুপ ক'রে রইলেন।

আমি আবার বললাম—তা—ছাড়া—আমাদের গ্রামের ফুটবল টিম উঠে যাবে ?

পিসীমা বললেন—কি করবি ? কাল যদি অপমান ক'রে কি মারে ?

—মার খাব। অপমান সহ্য করব।

পিসীমা বললেন—ঘুমো। কাল যা হবার—সে কাল হবে।

আলোটা তিনি নিভিয়ে দিলেন। আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। আমি ঘুমিয়ে গেলাম। পর দিন সকালে একবার মনে হ'ল, যাব না ইস্কুল। কিন্তু সে দুর্ব্বলতা জয় করলাম। গেলাম ইস্কুলে। প্রতীক্ষা ক'রে রইলাম—কখন কেষ্ট চাকর এসে ডাকবে—তোমাকে ডাকছেন হেডমাস্টার। মনে হ'ল সারা ইস্কুলে যে গুঞ্জন উঠেছে—সে গুঞ্জনের মধ্যে আমার কথাটাই বড় হ'য়ে উঠেছে।

হঠাৎ ক্লাসে এসে ঢুকলেন—নীলরতনবাবু—থার্ড মাস্টার।

নীলরতনবাবু আমার ধাত্রী-দেবতার রামরতনবাবু মাস্টার। এক মুখ দাড়ি গোঁফ—বিশালকায় পুরুষ, সদানন্দ মানুষ, দেবতার মত চরিত্র,—বহু শতের মধ্যে এমন মানুষ মেলে। নির্লোভ, নির্ভীক, বিচিত্র। তেমনি কোমল, মধুর। লোকে বলত—পাগল। ব্রজেন্দ্রবাবু এখান থেকে চলে গেলেন যখন তখন আমি সিক্সথ্ ক্লাসে পড়ি। ফোর্থ ক্লাস থেকে আমি নীলরতনবাবুর কাছে প্রাইভেট পড়তাম। নীলরতনবাবুর সঙ্গে কিন্তু ঘনিষ্ট সংশ্রব তার অনেক দিন আগে থেকেই। তিনি আমাদের বাড়ীর পাশের বাড়ীতেই প্রাইভেট শিক্ষক হিসাবে থাকতেন। তাঁর ছাত্র দুটি পিতামাতার সমাদরের সন্তান। আদরে যে সৃষ্টি অনাসৃষ্টিতে পরিণত হয় তাই। মুষ্টী এবং রাধাশ্যাম—দুজনেই লেখাপড়া ছেড়ে দিলে। তবু তাদের অভিভাবকেরা নীলরতনবাবুকে ছাড়লেন না। মাস্টারও তখন স্নেহ-বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন। বিচিত্র মানুষ। জাতিতে ছিলেন কুম্ভকার। আপন মনে চীৎকার ক'রে ছড়া বলতেন—

কুম্ভাকারে ধূম্রাকার
ধূম্রাকারে মেঘাকার
মেঘাকারে জলাকার।

বাপু হে আমরা সামান্য নই। জলাকার বলেই না ধান হয়। বলে হা হা করে হাসতেন।

ম্যালেরিয়ার জর যখন আসত—তখন লেপ মুড়ি দিয়ে আমার বাড়ীতে পোয়াল গাদায় গিয়ে শুতেন।

সুস্থ শরীর থাকলে—শীতের দিনেও খোলা জায়গায় শুতেন। ষষ্ঠীর দাদা শীতের দিনে তাঁকে বাইরে মাত্র একখানা চাদর গায়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলেছিলেন—মাস্টার তুমি কি হে?

মাস্টার গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন—আমি মহিষ।

আমাকে বড় ভালবাসতেন। কত বিচিত্র কথা বলতেন। আমাদের গ্রাম সম্পর্কে বলতেন—মাই বয়, তোমাদের গ্রামটি ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর গ্রামের ভয়ঙ্কর মানুষ যেন হবে না। এইটিই একমাত্র শিক্ষা আমার।

তারপরই চুপি চুপি বলতেন—তবে বলি শোন্। তখন আমি আমদপুর মাইনর ইস্কুলের হেডমাস্টার। স্টেশনে যাই—দেখি—সব বাবুরা নামছে। এই চুলকাটা, এই টেরি, এই জামা, এই অলেষ্টার, এই নাইট ক্যাপ। বাপ রে—বাপ রে—বাপ রে—। সে বাবু দেখে একেবারে কেমন যেন হয়ে যাই। তারপর টগবগ—টগবগ করে জুড়ি গাড়ী আসে—। জিজ্ঞাসা করি কোথাকার বাবু? না লাভপুরের। ভাবি না-জানি লাভপুর কেমন। তারপর লাভপুরে ফোর্থ মাস্টারের পোস্ট খালি হ'ল—দিলাম একটা দরখাস্ত ক'রে। দরখাস্ত ক'রে কিন্তু ভয় হ'ল। কি জানি—যদি দরখাস্ত মঞ্জুর হয়। হে ভগবান রক্ষা কর! লাভপুরে আমি যাব কি ক'রে? আমার মোটা কাপড়, তিন বছরের পুরণো জুতো এক জোড়া, সে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, শীতের দিনে একটা চটের ওভার কোট গায়ে দি। গানি ব্যাগ কেটে সেটা আমিই তৈরি করেছিলাম নিজে! এই সব নিয়ে লাভপুর যাব কি ক'রে? হে ভগবান! Oh God! হে আল্লা! রক্ষে কর। তা বাপু—রক্ষে করলেন না তাঁরা। দিলেন ঠেলে বিপদের মুখে। মঞ্জুর হল দরখাস্ত। তা' একবার ভাবলাম—ঝক মরুক গে, দিই লিখে—আমি যাব না। কিন্তু অদৃষ্টের টান—পড়লাম এসে।

বলেই হা—হা—ক'রে হাসতেন।

জীবনে নেশা ছিল না, বিলাস ছিল না, ছিল প্রাণভরা আনন্দ, ছিল ভিতরে বাহিরে সুনির্ম্মল পরিচ্ছন্নতা। অঙ্কের মাস্টার—বেড়াতে বেরিয়ে লাল মাটির উপর কাঠি দিয়ে অঙ্ক কষতেন। প্রিয় ছিল তাঁর মিল্টনের কাব্য।

প্রিয় কবি ছিলেন তাঁর রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের অনতিদূরে—বোধ হয় মাইল তিনেকের মধ্যেই তাঁর বাড়ী। রবীন্দ্রনাথের গল্প বলতেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য তিনি ভাল ক'রে পড়েন নি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক অনুরাগ।

নীলরতনবাবু থার্ড মাস্টার মশাই এসে ক্লাসে ঢুকলেন। বললেন—তারাশঙ্কর, এস আমার সঙ্গে। ক্লাসের মাস্টারকে বললেন—দরকার আছে, ওকে একবার নিয়ে যাচ্ছি।

বেরিয়ে গেলাম। একেবারে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে পাশের আম-বাগানে গেলেন। বললেন,—হেডমাস্টার মশায়ের কাছে তোকে ক্ষমা চাইতে হবে।

আমি সবিস্ময়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

নীলরতনবাবু বললেন—পিসীমা, আমার হাতে একখানি পত্র দিয়েছেন—হেডমাস্টার মশায়কে দিতে। দেখ—পত্রখানা।

আমার মায়ের সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা পত্র।

মান্যবরেষু,

মহাশয়, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তারাশঙ্করকে আমিই কাল বৈকালে যথারীতি খেলিতে যাইতে আদেশ করিয়াছিলাম। সে এ পর্য্যন্ত ওই খেলার সূত্রে কোন অন্যায় করে নাই। অন্তত আমাদের দৃষ্টিতে কোন অন্যায় চোখে পড়ে নাই। সেই কারণে এবং গ্রামের ছেলেদের এই খেলার দলটি উঠিয়া গেলে ছেলেরা দুঃখ পাইবে—গ্রামের পক্ষেও লজ্জার কারণ হইবে, এই কারণে তাহাকে খেলিতে আমিই বলিয়াছিলাম। আপনি এই লইয়া তাহাকে শাস্তি দিলে—সে শাস্তি আমাকেই দেওয়া হইবে। ইতি—তারাশঙ্করের পিসীমা।

পত্র-রচনা আমার মায়ের কিন্তু প্রতিটি ছত্রে পিসীমায়ের কণ্ঠস্বর এবং দৃঢ় বাচনভঙ্গির পরিচয় প্রত্যক্ষ। কিন্তু পত্র পড়ে কি বলব? আমার বলবার আছে কি? আমি চুপ ক'রে রইলাম।

নীলরতনবাবু বললেন—এ পত্র আমি হেডমাস্টার মশায়কে দিই নি।

দেবও না। যা বলবার—সে আমি তাঁকে ব'লেছি। তিনি হেডমাস্টার—শিক্ষক-গুরু—সেই কারণে তোকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

আমি তবুও চুপ ক'রে রইলাম। আমার মনে সেই প্রশ্ন—কোথায় আমার অন্যায়? অন্যায় আদেশ প্রতিপালন না-করাও কি অন্যায়?

মাস্টার মশাই আমার হাতের উপরে ধ'রে বললেন—চল।

নীরবেই আমি তাঁর অনুসরণ করলাম।

গিয়ে দাঁড়ালাম লাইব্রেরী বা আপিস ঘরে। হেডমাষ্টার কিছু পড়ছিলেন, তাঁর পাসনে চশমা খুলে হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি ধীর ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম। চঞ্চল হইনি আমি। স্পষ্ট মনে আছে।

আশ্চর্য্য, কোন কথা আমার মুখ থেকে বের হ'ল না। আমি বলতে পারলাম না—স্যার, আমি মাফ চাইতে এসেছি। কিন্তু চোখে জল এল, গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। সে কান্নার কোন উচ্ছ্বাস ছিল না। ছিল শুধু চোখের জল। সে দিন চোখের জলই আমার সকল কথা ব্যক্ত ক'রে দিয়েছিল।

নীলরতনবাবু বললেন—ও আপনার কাছে মাফ চাইতে এসেছে।

হেডমাষ্টার মহাশয়ের কঠিন মুখ ক্রমশ যেন কোমল হয়ে এল। এল বোধ হয় আমার চোখের ওই ধারা দেখে। বললেন—

—আচ্ছা। এবার মাফ করলাম আমি। যাও পড়াশুনা করগে।

চলে আসছি, আবার ডাকলেন।

বললেন—এবার থেকে কোথাও ম্যাচ খেলতে হলে আগে আমার পারমিশন নিতে হবে। বুঝেছ? খেলতে হয়—আমি বন্দোবস্ত ক'রে দেব। ডু ইউ আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড?

ঘাড় নেড়ে জানালাম, বুঝেছি। স্বীকারও ক'রে নিলাম সানন্দে।

পররাষ্ট্র-নীতি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে ফিরে এলাম। ফুল্লরা এ্যাথেলিটিক ক্লাব বেঁচেছে। মরে নি।

বিদ্রোহ আমার জয়যুক্ত হ'ল।

ছয়

বিদ্রোহ আমার জয়যুক্ত হ'ল, কিন্তু সে জয় আমার সম্ভবপর হ'ল দেবতা প্রসাদেই। পিসীমা এবং মা যদি না-থাকতেন, অনুকূল না হতেন, যদি একক আমাকেই লড়াই করতে হ'ত তা' হলে আমাকে হয় হার মানতে হ'ত অথবা আমাকে আমার ভবিষ্যৎ বলি দিয়ে বিদ্রোহকে জয়যুক্ত করতে হ'ত। হয় শিক্ষকদের বিষদৃষ্টিতে পড়ে নিরন্তর গঞ্জনা এবং লাঞ্ছনা সয়ে সয়ে শিক্ষাজীবনের প্রতিই অশ্রদ্ধা জন্মে যেত। পড়া ছেড়ে দিতাম। আর একটা পথ ছিল—অন্য ইস্কুলে চলে যাওয়া। কিন্তু সেও ঠিক জয় করা হ'ত না, পলায়ন করা হ'ত। ফুল্লরা এ্যাথলেটিক ক্লাব উঠে যেত। তবে জয় আমার শক্তিতে অর্জ্জিত না হলেও তার স্বাদ আস্বাদনে হানি ঘটল না। জীবনে জয়ের তুল্য মধুরস্বাদী আর কিছু হয় না। শাস্ত্রে আছে পুত্র এবং শিষ্যের কাছে পরাজয় আরও মধুর। হয় তো মধুর, কিন্তু কল্পনায় তাকে অতি মধুর ক'রে তোলা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অর্জ্জুনের হাতে দ্রোণের পরাজয় হয়েছিল—সে পরাজয় কত মধুর সে কথা বলবার জন্য দ্রোণ বেঁচে ছিলেন না। রামের এবং অর্জ্জুনের পুত্রের হাতে পরাজয় ঘটেছিল—সেও যে মৃত্যু। এ কথা পুরাণকার গোপন করেন নি। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই সীতা এবং উলুপীর সতীত্ব পুণ্যে, অলৌকিক করুণার মহিমায় তাঁরা যখন পুনর্জীবিত হলেন তখন বিজয়ী পুত্রেরা পিতার পদানত হয়েছে। এবং তাতেই পরাজয় মধুর হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। শিষ্য ভীষ্মের হাতে পরাজিত হয়ে পরশুরাম তো চিরদিনের মত আত্মগোপন করেছিলেন। মোট কথা জয়ের আস্বাদের চেয়ে মধুর এবং তীব্র আর কিছু নাই—হয় না। সে দিন মা এবং পিসীমার স্নেহের বলে সে আস্বাদ পেয়েছিলাম। এ ক্ষেত্রে পিসীমাই ছিলেন আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।

আমার পিসীমা আমার জীবনে একটি সুবৃহৎ অধ্যায়। আমার বাবার কথা, আমার শৈশব জীবনের কথা আমার কালের কথায়, বলেছি। বলেছি—যুগসন্ধিক্ষণে তিনি যেন ছিলেন যে-কাল বিগত হচ্ছে, বিদায় নিচ্ছে তারই প্রতীক্। সেই কালের শিক্ষা অশিক্ষা, দোষ গুণ, আলো, ছায়া, উদারতা সংকীর্ণতা, পাপ পুণ্য পূর্ণ মাত্রায় তাঁর মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল। তিনি

আমার দৃষ্টিতে ছিলেন বিরাট বনস্পতির তুল্য।—আকস্মিক মহা ঝড়ে ছিন্নমূল বনস্পতির মতই উৎপাটিত হয়ে পড়েছিলেন।

আমার কাল গণনায়-যুগসন্ধিক্ষণ উনিশ শো পাঁচ সালের ৩০শে আশ্বিন। তিনি সেই বৎসরেরই পরবর্ত্তী ৯ই আশ্বিন মহাপ্রয়াণ করেছিলেন। এই নূতন কালে বাবার মহাপ্রয়াণের পর আমার পিসীমা অতীতকালের মহিমার মত আত্মপ্রকাশ করলেন। সূর্য্যাস্তের পরও যেমন পৃথিবীর বুকে তার উত্তাপ বিকীরিত হয় তেমনি ভাবে আমার বাবার প্রভাবের মতই তিনি আমাদের সংসারের সর্ব্বক্ষেত্রে আসন নিয়েছিলেন। আমার জীবনে যাঁদের প্রভাব রক্তে মাংসে, মেদে মজ্জায়, চিন্তনে মননে ধাতুগত হয়ে আছে তাঁদের মধ্যে প্রথম তিনজনের তিনি একজন; বাবা—মা—পিসীমা।

সাংসারিক ভাগ্যে তিনি ছিলেন হতভাগিনী যাকে বলে তাই। গ্রামেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। স্বামী ছিলেন সে কালের বিষয়ী ঘরের দৌহিত্র এবং পরম রূপবান। পিসীমা আমার গোড়া থেকেই ছিলেন তেজস্বিনী এবং দৃপ্তভাষিণী। এটি আমাদের বংশগত স্বভাব। বহুক্ষেত্রে দোষ, বহুক্ষেত্রে গুণ। এই কারণেই আমার পিসেমশাই পিসীমাকে নিয়ে তাঁর ভাইদের থেকে পৃথক হয়ে সংসার বাঁধতে বাধ্য হয়েছিলেন। ছুটি সন্তান স্বামী স্ত্রী নিয়ে একটি সংসার: গ্রামেই প্রতিষ্ঠাবান বংশ পিতৃকুল, শ্বশুরকুল অর্থাৎ আমার পিসীমার পিতৃকুল অধিকতর প্রতিষ্ঠাবান। যেন চন্দ্র-সূর্য্যের আলোকে আলোকিত পৃথিবী; অন্ধকারের লেশ ছিল না কোথাও। ছেলে ছুটি ছিল শুনেছি—যুগল কার্ত্তিকেয় অথবা শিশু কন্দর্পের মত সুন্দর। এই সুখের নীড়ে অকস্মাৎ হ'ল বজ্রাঘাত। স্বামী এবং বছর সাতেকের বড় ছেলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কলেরায় মারা গেলেন। পিসীমা ছোট ছেলেটিকে নিয়ে ফিরে এলেন পিত্রালয়ে। দেড় বছর পর ছোট ছেলেটিও চলে গেল; সর্ব্বরিক্ত হয়ে পিসীমা রইলেন পৃথিবীতে; —তিন তিনটি চিতার আগুন তাঁর বুকের মধ্যে অহরহ জ্বলতে লাগল।

এই শোকে সে সময় তিনি কত কেঁদেছিলেন সে আমি দেখি নি। তখন আমি জন্মাই নি। পরবর্ত্তীকালে তাঁকে কিন্তু আমি কাঁদতে দেখিনি।

আমি তাঁকে দেখেছি—আগ্নেয়গিরির মত রুক্ষ কঠোর উত্তপ্ত। তাঁর নিজের জীবনের বঞ্চনার ক্ষোভ রোষ তিনি ছড়িয়ে দিতেন অগ্নির মত, ঝড়ের মত; রুষ্ট প্রকৃতির প্রকাশের মত কুণ্ঠাহীন নির্ব্বিচার। মধ্যে মধ্যে এই ক্ষোভে বেদনায় তিনি অকস্মাৎ চেতনা হারিয়ে পড়ে থাকতেন, দীর্ঘক্ষণ পর জ্ঞান হ'ত; ঘন ঘন কয়েকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ মেলতেন।

কিন্তু অন্যদিকে জীবনে তিনি ছিলেন আশ্চর্য্য রকমের নির্লোভ। আমাদের গোটা সংসারের কর্ত্তৃত্ব তাঁর হাতেই ন্যস্ত হয়েছিল আমার বাবার মৃত্যুর পর। কিন্তু তিনি নিজের বলে একটা কপর্দ্দকও সঞ্চয় করেন নি। বুদ্ধি তাঁর তীক্ষ্ণ ছিল না কিন্তু বোধ ছিল প্রবল। জমিদারী আমাদের কিছু ছিল, বার্ষিক তিন থেকে চার হাজার টাকা আয়; সে জমিদারী পরিচালনায় তাঁর বোধের পরিচয় আমাদের সংসারকে বহু জটিলতা থেকে রক্ষা করেছে; বহুবার জয়যুক্ত করেছে। তাঁর চরিত্রের ছায়া ধাত্রীদেবতার পিসীমার উপর পড়েছে যথেষ্ট পরিমাণেই। ছুটি ঘটনার কথা ধাত্রীদেবতার মধ্যে যথাযথ ভাবেই তুলে দিয়েছি। একটি আমাদের বৈঠকখানায় বা সদর বাড়ীর সংলগ্ন পুকুরের পাড়ের উপর জরীপের শিকল ফেলা নিয়ে ঘটনা। সরকারী জরীপে অবশ্য কোন সীমানার উপর দিয়ে শিকল নিয়ে যেতে অনুমতি নিতে হয় না। কিন্তু এই জরীপটি ছিল আধা সরকারী। ছুই বিবদমান পক্ষের সীমানা নির্দ্ধারণের জন্য আদালত থেকে আমীন এসেছিল জরীপ করতে। সংকীর্ণ স্থানে শিকল টানতে অসুবিধা হওয়ায় সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে আমাদের সীমানার উপর দিয়েই তাঁরা চলেছিলেন, আমাদের কিছুই জানান নি। পিসীমা সকাল বেলা দেবতার ছুয়ারে জল দিয়ে প্রণাম সেরে, লক্ষ্মীর ঘরের মার্জ্জনা নিজে হাতে সেরে, ভিতর বাড়ীর তদারকের ভার মায়ের উপর দিয়ে নিজে আসতেন বৈঠকখানায়। বৈঠকখানা গোশালা পুকুরঘাট তদারক করতেন। সে দিন পুকুরঘাটে এসে দাঁড়াবামাত্র চোখে পড়ল ওই দৃশ্য। বিস্মিত হয়ে নিজেই ডেকে প্রশ্ন করলেন—কারা ওখানে, কি হচ্ছে? উচ্চ কণ্ঠে প্রশ্নটি করলেন কিন্তু আমাদের পেয়াদাকে সম্বোধন ক'রে। হেঁকে বললেন—কেষ্ট সিং, দেখ তো, কারা ওখানে, কি হচ্ছে? কেষ্ট সিং তাঁর

কাছেই দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওপারের জনতা ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য হ'ল। বিবদমান পক্ষের একজন চীৎকার করেই উত্তর দিলেন—ময়রা পুকুরের পাড় জরীপ হচ্ছে গো।

পিসীমা এবার একটু শঙ্কিত হলেন, ময়রাপুকুরের পাড় জরীপের শিকল আমাদের পাড়ের উপর দিয়ে চলার অর্থ তিনি অন্য রকম বুঝলেন; মনে ভাবলেন আমাদের পাড়ের খানিকটা অংশ ময়রাপুকুরের সীমানাভুক্ত ক'রে জরীপ হচ্ছে। এবার তিনি হেঁকেই উত্তর দিলেন, ময়রাপুকুরের পাড় জরীপ হচ্ছে তো আমার শাল পুকুরের পাড়ের উপর শিকল কেন? তুলে নিন, শিকল তুলে নিন!

মুহূর্তে একপক্ষ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। আমাদের গ্রামে এই ব্যক্তিটি, শুধু ওই ব্যক্তিটিই নয়, তাঁর বংশটিই ক্রোধের জন্য বিখ্যাত বা কুখ্যাত। তন্ত্রের নামে মদ্য গঞ্জিকা কুলাচার তাঁদের এবং সে আচার বেশ খানিকটা উৎকট রকমে উগ্র। ভদ্রলোক ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে গাল দিয়ে উঠলেন—আচ্ছা হারামজাদা মেয়ে তো! আমরা কি জায়গা তুলে নিয়ে যাচ্ছি না কি?

পিসীমা গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, যাও কেষ্ট সিং, ওদের ওখান থেকে তুলে দিয়ে এস। সরকারী আমিনকে বলবে, আমার পাড়ের উপর দিয়ে শিকল টানতে কি সরকারী হুকুম আছে? থাকলেও কি আমাদের খবর দেওয়ার দরকার নাই?

কেষ্ট সিংকে যেতে হ'ল না। আমীন তৎক্ষণাৎ শিকল টেবিল সরিয়ে নিয়ে, নিজে এসে ত্রুটী স্বীকার এবং দুঃখ প্রকাশ ক'রে গেলেন।

আর একবার আমাদের একটা গাছ অন্য একজন কেটে নিয়েছিলেন। সীমানা গণ্ডগোলের অজুহাতে গাছটা আমাদের অজ্ঞাতসারে কেটে ফেললেন। পিসীমা কিন্তু সুকৌশলে আমাদের অনুগত চাষীদের গাড়ী জোগাড় ক'রে রাতারাতি সেই গাছ তুলিয়ে এনে ঘরে তোলালেন। অপর পক্ষের কাটাই-খরচটা গেল, উপরন্তু সীমানার দখল আমাদের সাব্যস্ত হয়ে গেল। পরদিন তিনি নিজে তাঁদের বাড়ী গিয়ে বলে এলেন এবার আমাদের সীমানার মধ্যে তাঁদের যে সব গাছ আছে সেগুলি তিনি কাটাবেন। তাঁরা

যদি পারেন তো রোধ করেন যেন। এ ক্ষেত্রে সীমানা এবং অধিকার এমনই সুনির্দিষ্ট যে তাঁদের সেখানে যাওয়া হ'ত ট্রেসপাস।

এমনি ধারার ছোট খাটো ঘটনা নিত্যই প্রায় ঘটত। ছোটই হোক আর বড়ই হোক জমিদারী জমিদারী। বড় আর ছোট, নিত্য একই ধরণের জটিলতা সর্ব্বত্র। সে বর্দ্ধমানের রাজবাড়ী থেকে লাভপুরের বাঁড়ুজ্জেদের সাত আনীর বাড়ী পর্য্যন্ত। প্রতিটি ঘটনাতেই পিসীমা এইভাবে সে দ্বন্দ্বে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন। ভয় ছিল তাঁর ইংরেজ রাজাকে আর ভয় ছিল মৃত্যুকে। তাঁর মামার বাড়ী ছিল সিউড়ীর উত্তর-পশ্চিমে মামুদবাজার থানায় এলাকায় মহুলপুরে। বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণায় যে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল—সে বিদ্রোহ এবং ইংরেজদের কঠোর হস্তে নিষ্ঠুর বর্ব্বর অত্যাচারে সে বিদ্রোহ দমন স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাঁর মাতামহী। আমার বাবা এবং পিসীমা সেই অত্যাচারের কাহিনী শৈশব থেকে শুনে এসেছিলেন। বন্য সাঁওতালদের রক্তাক্ত উন্মত্ততার কাহিনী সে অত্যাচারের কাহিনীর কাছে সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। কাল-বৈশাখীর বজ্র নির্ঘোষের কাছে মানুষের হুঙ্কার! ইংরেজের নামে একটা জৈবিক আতঙ্ক ছিল তাঁর। পরিমাণে কম হলেও আমার বাবারও ছিল এই ভয়। কোন ক্রমেই বয়স্ক জীবনের বুদ্ধি বা সাহস দিয়ে একে সম্পূর্ণ জয় করতে পারেন নি। 'পদচিহ্নে' রাধাকান্ত চরিত্রের মধ্যে এ কথা পরিস্ফুট হয়েছে। বাল্যকালে পিসীমার কাছে আমি এই সাঁওতাল বিদ্রোহের গল্প শুনতাম। বলতে বলতে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকত, শঙ্কাতুর হয়ে উঠত। আমারও রোমাঞ্চ হ'ত মুখে সিঁদুর মেখে, হাতে টাঙি আর তীর ধনুক দিয়ে রক্তমুখ দানবের মত সাঁওতালদের নাচের কথা শুনে। শাল জঙ্গলে মাদল বাজত, মশালের আলো জ্বলত চারিদিকে—তারই মধ্যে বিদ্রোহীরা নাচত।

পিসীমা বলতেন, সাঁওতালেরা বিশুবাবুর জয় দিত। বস্তুত, বিশুবাবুই আমাদের রাজা। বিশুবাবু আমার মনের মধ্যে এমনই রেখাপাত করেছিল যে বিশুবাবুর সন্ধান আমি অনেক করেছি উত্তর জীবনে। কে ছিল

বিশুবাবু? কেমন ছিল বিশুবাবু?* কোন সন্ধান পাই নি। কালিন্দী উপন্যাস লেখার সময়েও পাই নি। কিন্তু শৈশব থেকে যে কল্পনা এই মানুষটির কীর্তি এবং নামকে অজানা এক বিচিত্র বীজের মত মনোজগতে সযত্নে জল সিঞ্চন করেছিল সেই বীজ থেকেই কালিন্দীর সোমেশ্বর উদ্ভূত হয়েছে হিংস্র কণ্টকাকীর্ণ রক্তপুষ্পময় বৃক্ষের মত।

তাঁর এই ভয় এতই প্রবল ছিল যে সে হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অচলায়তনের লৌহ কপাটের মত। তাঁর এই রাজভয় এবং মৃত্যুভয় বিশেষ ক'রে মারীভয় —এই দুইখানি লোহার কপাটকে ভাঙতে হয়েছিল আমাকে। বিদ্রোহ ক'রে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ভাঙতে হয়েছিল। বিদ্রোহ করতে তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন, জয়যুক্ত হতে তিনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন। ওই ইস্কুলে ফুটবল বিদ্রোহের কথা বলছি। কিন্তু পিসীমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সহজ ছিল না।

তাঁর ব্যক্তিত্বের কথা বলেছি, ক্ষোভের কথাও বলেছি।

আমার উপর সে ব্যক্তিত্ব কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল কতখানি আমাকে অভিভূত করেছিল সেই কথা বলি। আমার তখন বয়স সতেরো। ষোল পার হয়েছি। কিন্তু দুটো কারণে অকস্মাৎ অনেকখানি পদোন্নতি হয়ে বয়সে প্রায় বিশকে ছাড়িয়ে গিয়েছি। হঠাৎ আমার বোনের বিয়ের টানে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং বিয়ের প্রায় মাস-খানেকের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছি। এই দুটোই ষোল বছরের একটি কিশোরকে বিশ বাইশ বছরের যুবকের মর্যাদায় এবং মনোভাবে ভাবান্বিত করতে যথেষ্ট। আমার ভগ্নীপতি এবং শ্যালক লক্ষ্মীনারাণ আমারই বয়সী। বাল্যকালে মাতৃহীন হয়ে সে বোর্ডিংয়ে থাকার অবসরে সিগারেট অনেক

---

* পরবর্তী কালে স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের ইতিহাস পড়ে—সাঁওতাল বীর 'বিরসা মহারাজের' নাম পেয়েছি। বিদ্রোহী এই বীর সাঁওতাল যুবকই ছিলেন-সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেরণা। তাঁকে সাঁওতালেরা বলত—'বিরসা ভগবান'। বিশুবাবু বোধ হয় বিরসা মহারাজ। সাঁওতালেরা বিরসা মহারাজের জয়ধ্বনি দিত; এ দেশের সাধারণ মানুষ বিরসা মহারাজকে জানত না বলেই বিশু রাজা বা বিশুবাবু মনে করত।

আগেই ধরেছে। আমি এ বিষয়ে সত্যই ভালো ছেলে ছিলাম। সিগারেট তামাক ধরি নি। যা না কি সে কালে গ্রাম্যজীবনে বিস্ময়ের বস্তু ছিল। বিয়ের পর বোধ করি অষ্টমঙ্গলা উপলক্ষ্যে শ্বশুর বাড়ী গিয়েছি। শ্বশুরবাড়ী বাড়ীর দরজা থেকে হাত চল্লিশেক দূর। সেই দিন নারাণ আমাকে সিগারেট খাওয়ালে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ইস্কুলের গণ্ডী পার হচ্ছি, চোখে একটা অকাল যৌবনের নেশা লেগেছে, মনে হ'ল—নব যুবক মানাতে যেটুকু কমতি রয়েছে সেটুকু ওই ধূমায়মান সিগারেট ঠোঁটে উঠলেই পূর্ণ হয়ে যাবে। তার আগেই বিয়ে উপলক্ষ্য করেই টেরী কেটেছি। আমাদের হেডমাস্টার মশায়ের ভারী আপত্তি ছিল টেরীতে। তিনি যে সদুপদেশগুলি ছাত্রদের দিতেন তার মধ্যে প্রথম ছিল - Comb your hair everyday but don't divide into parts ;—অর্থাৎ সিঁথী কেটে টেরী কেটোনা। আমিও কাটতাম না। কিন্তু বর যখন সাজলাম তখন টেরী কেটে দিলে দশজনে মিলে। শ্বশুরবাড়ী থেকে আয়না চিরুণী তেল পমেটম দেওয়া হ'ল আমাকে। লাইসেন্স এল সমাজের শিল মোহর নিয়ে। যাক্। টেরীর পর সিগারেট। নারাণ সিগারেট ধরালে। বের করলে চৌকা একটা কৌটো,—গোল্ডেন বার্ড-সাই-এর টোব্যাকো ;—তার সঙ্গে সিগারেট বানাবার কাগজ এবং একটা কল। টোব্যাকোর গন্ধটা কিন্তু সত্যই ভালো লেগেছিল। সিগারেট খেলাম; কাশলাম, চোখ দিয়ে জল পড়ল, তবুও খেলাম। সন্ধ্যে থেকে গোটা তিনেক বোধ হয়। রাত্রে আমার দশবছরের পত্নী এসেই বললে—ও খুকী দিদি, কি বিচ্ছিরি গন্ধ, সিগারেট খেয়েছে।

খুকী দিদি আমার স্ত্রীর সম্পর্কীয়া দিদি, তিনি হেসে বললেন—মর মর মর। এরপর তামাক সেজে দিতে হবে। তখন কি করবি? চাকরে সেজে দিলেও ফুঁ দিতে হবে! বেশ করেছে সিগারেট খেয়েছে।

শ্বশুরবাড়ীতে ওই কথাটা মনে কিছু সাহস সঞ্চার করেছিল। আর সাহস ছিল পিসীমা। বাড়ীতে রূপোর ফুরসী, রূপোর কাজ করা ফুরসী, তিন চারটে গড়গড়ার সরঞ্জাম বাড়ীতে ছিল। আমার বড় ঠাকুমা গড়-গড়ায় তামাক খেতেন। পিসীমা সে সব গল্প করতেন মধ্যে মধ্যে,

বলতেন—জিনিষগুলো নষ্ট হচ্ছে ব্যবহার অভাবে। ছেলেরা বড় হ'লে তখে আবার ও সবের কদর হবে।

কখনও কখনও বলতেন,—কাছারীতে বসবি, রূপোর ফুরসীতে তামাক খাবি, সামনে বাক্স থাকবে, লোকজনে গম্ গম্ করবে বৈঠকখানা, তখন আমার চোখ জুড়োবে।

সুতরাং তামাক সিগারেটে পিসীমার আপত্তি থাকার কথা নয়। ভয় ছিল মাকে। পিঙ্গল দুটি চোখের স্থির দৃষ্টি কল্পনা করলেই বুক কাঁপত। তবে মা বাইরে বড় বের হন না সেইটাই মস্ত বড় ভরসা। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে সিউড়ী গিয়ে দিন দশেকের মধ্যে সিগারেটে পাকা হ'য়ে ফিরলাম। গোল্ডেন বার্ডসাই টোব্যাকো দুটিন, কাগজ, পাউচ কিনে নিয়ে এলাম। পাকাবার কল কিনলাম না। পাকাতে তখন হাত পেকে গিয়েছে। বাইরে বাইরে সিগারেট খাই। মুখ ধুয়ে নেবু পাতা চিবিয়ে বাড়ী ফিরি। মা আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালিনী, বুদ্ধিতেও প্রখরা কিন্তু আমি মায়েরই ছেলে। মাও সন্দেহ করলেন না।

দিন পনের পরে বোধ হয়।

আমার বোনের অকস্মাৎ প্রবল পেটের অসুখ হয়েছে।

রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে ন'টা। আমাদের গ্রামের সদর রাস্তার একটা নির্জ্জন স্থানে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি। আমার সঙ্গে নারাণ আছে, আরও দু-তিন জন বন্ধু আছে। অন্ধকারের মধ্যে সিগারেটের আগুন টানের সঙ্গে প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে। হঠাৎ কানে অনুভব করলাম কঠোর একং কঠিন আকর্ষণ। মুহূর্ত্তে বুঝলাম—আমার জননী। সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজীর মত সিগারেটটা আমার হাত থেকে অন্তর্হিত হল।

—তুই সিগারেট ধরেছিস?

মা নন, পিসীমা। কঠোর কণ্ঠে তিনিই প্রশ্ন করলেন। বিবাহিত, কলেজের দুয়ারে উপনীত-প্রায় যুবককে সকলের সমক্ষে কানে ধরে ওই প্রশ্ন করতে তাঁর সঙ্কোচ হল না, দ্বিধা হল না। আমারও সাহস হল না প্রতিবাদ করতে। শুধু চতুরতার সঙ্গে বললাম—না-তো! কোথায়?

সত্যই তো কই, কোথায়? পথে পড়ে থাকলেও তো আগুনটা অন্ধকারে দেখা যাবে। দেখাতে পিসীমা পারলেন না। সিগারেট তখন আমার জুতোর তলায় চাপা রয়েছে।

পিসীমা এবার কান ধরে মাথাটা নামিয়ে মুখ শুঁকে, দুই হাত প্রয়োগ করলেন, দুই হস্তে দুটি কর্ণ সজোরে মর্দ্দন ক'রে দিয়ে চলে গেলেন। এই ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সহজ ছিল না।

আমার পিসীমা আমার জীবনে অন্তত বিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। পূর্ব্বেই তাঁর চরিত্রের কথা বলেছি। অত্যন্ত শক্ত, অনমনীয়; বিশ্বসংসারের উপর ক্ষুব্ধ ছিল তাঁর প্রকৃতি। সমাজ ও সংসারের মৌলিক নীতিগুলির উপর ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। অন্যদিকে—ঐ অল্পবয়সে চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সকল আপনজন হারিয়ে মৃত্যুকে ছিল তাঁর প্রচণ্ড ভয়, এই কারণেই বোধ করি পৃথিবীর যত কিছু মৃত্যু-সংক্রান্ত সংস্কার তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। এই বয়সের মধ্যেই তাঁর স্বামী, দুই ছেলে, তিন বোন, বাপ মারা গেলেন। গেলেন মাত্র বৎসর তিন চারের মধ্যে। পৃথিবীতে আপনার বলতে রইলেন একমাত্র ভাই আর একটি বোন। ভাইয়ের সূত্রে ভ্রাতৃজায়া এবং তাঁদের কোলে এলাম আমি। আমার গলায় হাতে রাজ্যের মাদুলী ঝুলিয়ে দিলেন। মাথায় চুল রেখে দিলেন। ঠাণ্ডার ভয়ে গায়ে এমন জামা-জোব্বা পরিয়ে মুড়ে দিলেন যে বারো চৌদ্দ বছর পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হাওয়া কোন রকমে গায়ে লাগলেই আমার সর্দ্দি করত। স্নান বোধ হয় সপ্তাহে তিন দিন। চার দিনের তিন দিন গা মোছা অর্থাৎ ভিজে গামছা দিয়ে গায়ের তেলটা মুছে দেওয়া; একদিন কিছুই না। এ চারদিন মাথায় জল ছোঁয়ানো নিষিদ্ধ ছিল। অথচ তিনি নিত্য দুবেলা স্নান করতেন। স্নান ভিন্ন থাকতে পারতেন না। তাঁর মৃত্যুর

আগের দিনেও তিনি জ্বর সত্ত্বেও তিনি স্নান করেছেন। বলেছেন, ও কিছু হবে না। দীর্ঘকাল হয়ও নি।

এর পর ছিল রাজ্যের বাধা-নিষেধ। হাঁচি, টিকটিকি তো আছেই ; অশ্লেষা মঘা, দিকশূল, যোগিনী এঁরা ছিলেন এবং এখনও আছেন, পঞ্জিকার পাতায় ছাপার হরপে রয়েছেন। বাংলাদেশে পঞ্জিকাই সব থেকে বেশী বিক্রী হয় এবং এই সব যে পঞ্জিকায় বিশদভাবে থাকে তারই বিক্রী সর্ব্বাধিক—অন্তত বৎসরে কয়েক লক্ষ। পিসীমা আমার ছিলেন মহাপঞ্জিকা। বললেন—কৃকলাস যদি গায়ে পড়ে তবে কয়েক মাসের মধ্যেই নিশ্চিত মৃত্যু। এবং নিশ্চিত প্রমাণ দিলেন যে, তাঁর বাবার গায়ে [illegible]র মধ্যেই তাঁকে যেতে হল। তাঁর বাবা—আমার পিতামহ চুরাশী বৎসর বয়সে সে একরকম দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তার জন্য দায়ী হল বেচারা কৃকলাস। এখন এই কয়েক মাসের মধ্যে আরও অনেক কিছু তাঁর গায়ে বসেছিল ও পড়েছিল। কিন্তু ওই প্রাচীন প্রবাদবাক্যের ধারা অনুসারে কৃকলাসই হ'ল অপরাধী। এই বিশ্বাস এমনভাবে আমার মনে গেঁথে দিলেন পিসীমা যে, সে আমার মহা আতঙ্ক হয়ে গেল। কৃকলাস ছেলে বেলায় ঠিক চিনতাম না। অনেকেই চেনেন না। টিকটিকি ছাড়া সবই গিরগিটির নামে চলে যায়। এর মধ্যে বহুরূপীরা খানিকটা স্বতন্ত্র। এবং ওই জাতটার গলায় নীল রঙের যে থলিটা ফুলে ফুলে ওঠে সেটা বেশ একটু ভীতিপ্রদ। ওই ওকেই ভেবে নিয়েছিলাম কৃকলাস। এবং কত যে বহুরূপী বধ করেছি সে বয়সে, তার হিসেব ক'রে শিউরে উঠি। অন্তত শ' দুই-তিনের তো কম নয়। বৈঠকখানার সামনে ছিল বাগান—মালতী মাধবী লতার নিবিড় কুঞ্জ, আরও বড় বড় গাছ। আম পেয়ারা কাঁঠাল নেবু এবং একটি দুর্লভ ডালিম গাছও ছিল। আমার ছিল তীর ধনুক। বেশ পোক্ত তীরধনুক। ওই বহুরূপী বধ করেই লক্ষ্যভেদে পাকা হয়ে উঠেছিলাম। এই কারণে জীবনে যেদিন প্রথম বন্দুক ছুঁড়লাম সে দিন প্রথম গুলিতেই লক্ষ্যভেদ ক'রে একটি ঘুঘু মেরেছিলাম।

আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে সদর রাস্তা পর্য্যন্ত গলি-পথের ধারে

আমার জ্যেঠামশায়রা তুললেন একটা চালা। তার চালটা ছিল নিচু—মাথায় ঠেকত। যাত্রাপথে চাল মাথায় ঠেকা অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ। পিসীমা আপত্তি করলেন, চাল তুলে দিতে হবে। আজ কাল ক'রে সেটা থেকেই গিয়েছিল। হঠাৎ আমার সম্পর্কিত এক দাদা কলকাতায় সাংঘাতিক পীড়িত হলেন। টেলিগ্রাম এল। তাঁর স্ত্রী কলকাতা রওনা হলেন, বাড়ী থেকে বেরিয়েই গলিপথে ওই চাল তাঁর মাথায় ঠেকল। এবং সেই অসুখেই দাদা মারা গেলেন। পিসীমা এরপর দুর্দ্দান্ত বিরোধ সুরু করলেন। তাঁর তারাশঙ্কর বিদেশে যায় আসে, চাল কোনদিন মাথায় ঠেকবে এবং—। শিউরে উঠতেন তিনি। আমি তখন প্রাপ্তবয়স্ক, অনেক বুঝিয়েছি, ফল হয় নি। চালাখানি তুলে দিলে তিনি শান্ত হয়েছিলেন।

ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্য হয়। তিনি প্রায়ই ভোরবেলা স্বপ্ন দেখতেন এবং সে স্বপ্নের নব্বুইটি দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নের জন্য দেবতার পূজা হ'ত নিয়মিত।

আমার যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন আমরা সপরিবারে গিয়েছিলাম বৈদ্যনাথধাম। আমাদের একটি বড় মামলায় জয়লাভের জন্য পিসীমা সেবার ধর্ণা দিয়েছিলেন। স্বপ্ন পেয়েছিলেন—জয়লাভ হবে। কিন্তু হয় নি। কোর্টের পর কোর্টে মামলা চলতে লাগল। আমরা হারতে লাগলাম। জয়লাভের কথা আমাদেরই। কিন্তু আইনের বিচিত্র বিধানে মামলাটির সময় তখনও হয় নি। বাবা বুঝেও সে-কথা বুঝতে চান নি। জিদের বশেই মামলা চালিয়ে চলেছিলেন। তিন বৎসর ব্যর্থ মামলা চালিয়ে বাবা মারা গেলেন। এরপর বৎসর দেড়েক মামলা বন্ধ রইল। তারপর এল সেই সময়, এবং মামলা দায়ের করা মাত্র নিচের আদালতেই ডিক্রী হল। প্রতিপক্ষ আর অগ্রসর হলেন না। আমরা জিতলাম। সে দিন শুনলাম এ সেই সাড়ে চার-বৎসর পূর্ব্বের স্বপ্নের সফলতা। মনের গঠন অনুযায়ী তাই বিশ্বাসও করলাম। মোটা টাকার পূজাও গেল বৈদ্যনাথে।

এত ভূতের সন্ধানও জানতেন পিসীমা। কোথায় আছে ব্রহ্মদৈত্য, কোথায় গলায়-দড়ে, কোথায় গলসে ভূত, কোথায় পেত্যা অর্থাৎ আলেয়া, কোথায় গোভূত সব সন্ধান আমাকে জানিয়েছিলেন। একটা গোভূতের গল্প প্রায়ই

বলতেন তিনি। তিনি সেটা চোখে দেখেছিলেন। একদা রাত্রে তিনি পুকুরে নেমেছেন—দেখলেন ঘাটের মাথায় সেটা দাঁড়াল। বাছুর ছিল—বড় হল—শিঙ গজাল—মাথা নাড়লে। পিসীমা রাম নাম বলতে সেটা ধীরে ধীরে চলে গেল।

সব চেয়ে আতঙ্ক ছিল কলেরা এবং ইংরেজ রাজাকে।

আমার যখন ন বছর বয়স—তখন গ্রামে কলেরা হল। আমার জীবনে গ্রামে কলেরা হতে সেই প্রথম দেখলাম। আমার বাবার মৃত্যুর ছ-মাস পর। ষান্মাসিক শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডকরণ হবে; আয়োজন হয়েছে। গ্রামে সুরু হ'ল কলেরা। পিসীমা ভয়ে শুকিয়ে গেলেন। এবং সমস্ত পরিবারটিও তাঁর সঙ্গে আতঙ্কিত হয়ে উঠল।—কি হবে? প্রথম দিনেই ব্যবস্থা হ'ল—শ্রাদ্ধের আয়োজন সংক্ষিপ্ত করা হবে। গ্রাম থেকে পাড়া নিমন্ত্রণ। দ্বিতীয় দিন প্রভাতে শ্রাদ্ধের দিন শোনা গেল আরও কয়েক জনের কলেরা হয়েছে, আমাদের পাড়াতেও হয়েছে। শ্রাদ্ধ বন্ধ করা চলে না, অগত্যা দ্বাদশ জনের মধ্যে নিমন্ত্রণ সীমাবদ্ধ ক'রে, কোন ক্রমে শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ হ'ল। আমি গোয়াল ঘরের মধ্যে শ্রাদ্ধ করছি, পিসীমা এলেন, ভয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছেন তিনি। পাড়ায় আমাদের বাড়ীর কাছে এসেছে রোগ। শ্রাদ্ধ শেষ হ'ল—শ্রাদ্ধ ক'রে সে দিন কোথাও যাত্রা নিষিদ্ধ। সারা রাত্রি জেগে কাটিয়ে ভোর বেলা তিনি আমাদের নিয়ে পাশের গ্রাম, আমাদেরই একটি মহলে, এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বাইরের বাড়ীতে এসে উঠলেন। সেই বাড়ীতে আমাদের রেখে তিনি নিজে ফিরে গেলেন গ্রামে। তিনি সেখানেই থাকবেন। কিন্তু তখন তিনি ভিন্ন আমার ঘুম আসত না, তিনি সন্ধ্যায় না এলে আমি চলে যাব—এই ভয়ে সন্ধ্যার সময় এই গ্রামে আসতেন। সকাল বেলা চলে যেতেন। একদিন রাত্রে বাইরে কুকুরের দুরন্ত চীৎকার শোনা গেল। পিসীমা সভয়ে উঠে বসলেন। তাঁর ধারণা কলেরা এই গ্রামে ঢুকছে তাই কুকুরেরা এমন চীৎকার করছে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বললে—মা এ গাঁয়ের গ্রাম দেবী মা-কালী বড় জাগ্রত। এ গ্রামে একশো দুশো বছরেও কখনও কলেরা ঢোকে নি। মায়ের ভয়ে ঢুকবার উপায় নাই।

পিসীমা দুদিন পরে স্বপ্ন দেখলেন—তিনি যেন এই গ্রাম থেকে যাচ্ছেন লাভপুরে, গ্রামের মুখেই শুনলেন কার শাসন-বাক্য। আর কার কান্না। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন—টকটকে লাল পেড়ে শাড়ী পরা একটি কালো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় সিঁদুর, পিঠ-ভরা চুল, হাতে লাল শাঁখা, কালো হলে কি-হবে, দেখে মনে হয় এমন সুন্দরী আর হয় না। তিনি হাত বাড়িয়ে আঙুল দেখিয়ে বলছেন—যা—যা—। বেরো। বেরো।

ওদিকে এই কঙ্কালসার একটা মেয়ে, পরণে কালো দুর্গন্ধময় কাপড়। সামনে ঠোঁটের উপর দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে, চোখে ক্রুর দৃষ্টি, হাতে বড় বড় নখ; মাথায় খাটো খ্যাঙরা কাঠির মত চুল—সে দুপা'-দুপা' ক'রে পিছু হটছে।

এই সময় রায়জী বলে একজন চাপরাশী ছিল আমাদের। প্রৌঢ় মানুষ, মস্ত ভুঁড়ি, থপ থপ ক'রে হাঁটত, আমাদের বাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক তিন পুরুষের, জাতে ছত্রি। মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতে কাজ করত। যখন আমাদের চাপরাশী না থাকত তখনই রায়জীকে খবর পাঠানো হ'ত, রায়জী এসে কাজে লাগত। আবার তার অভাব হলেও সে বলত, এখন কিছু দিন আমাকে রাখতে হবে পিসীমা। এই রায়জীটি ছিল এমনি গল্পের একটি জাহাজ। ওই যে কলেরা-রূপিণী নারী-মূর্ত্তি, ওটি রায়জীই কয়েক দিন আগে বর্ণনা ক'রে পিসীমার এবং আমাদের মনে খোদাই ক'রে এঁকে দিয়েছিল। বলেছিল কোন গ্রামের কলেরার গল্প। সে গ্রাম নাকি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেই গ্রামেই নাকি কলেরা হবার পূর্ব্বে এমনি একটি নারীকে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল। হাতে ঝাঁটা, বগলে শবদেহ জড়ানো শ্মশানে পড়ে-থাকা চ্যাটাই, কঙ্কালসার দেহ, দন্তুর, জ্বলন্ত-দৃষ্টি চোখ, হ্রস্ব পিঙ্গল-কেশী একটি নারী সন্ধ্যার মুখে গ্রামে প্রবেশ করেছিল। গ্রামের লোকে ভেবেছিল—পাগলিনী। পরদিন সকালে আর তাকে দেখা যায় নি কিন্তু তখন একজন কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। তারপর গ্রাম প্রায় শ্মশান হয়ে গেল। তখন একদা একজন ভোর রাত্রে দেখলে সেই মেয়ে বেরিয়ে গেল গ্রাম থেকে। বগলে চ্যাটাই, হাতে ঝাঁটা।

যাক। আমারও সেই ন' বছর বয়সের কাঁচা মনে কলেরা রাক্ষসীর ছবি আঁকা হয়ে গেল। এর ছর দুয়েক পরেই আবার লাগল কলেরা।

এবার পিসীমার আগেই আমি ভয় পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে পিসীমাও কাঁপতে লাগলেন। এবং সেই দিনেই পালিয়ে গেলাম পাশের গাঁয়ে। এবার অন্য গ্রাম। এ গ্রামের মা-কালীও খুব জাগ্রত।

পালাত প্রায় সকলেই। স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর বাড়ী এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। তাঁর মেজ ছেলে স্বর্গীয় অতুলশিব একজন আদর্শ চরিত্রের সদাশিব মানুষ ছিলেন, বিদ্যোৎসাহী, পড়াশুনাই ছিল জীবনের বিলাস, সহৃদয়, সত্যবাদী মানুষ। কিন্তু দুরন্ত ছিল তাঁর মৃত্যুভয়। কলকাতায় যেবার প্রথম প্লেগ হয় সেই বারই তিনি বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছেন। কয়েক পেপার দিয়েছেন, এমন সময় খবর পেলেন কলকাতায় প্লেগ সুরু হয়েছে। রইল পরীক্ষা, তিনি সেই দিনই চলে গেলেন লাভপুর। তিনি আফিং খেতেন; কেন খেতেন ঠিক জানি না; মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে মারা গিয়েছিলেন, সুতরাং আফিং খাওয়ার বয়স হয় নি। মদ্য কোন কালে স্পর্শ করেন নি যে মদ ছাড়বার জন্য আফিং ধরেছিলেন। হজম শক্তি, স্বাস্থ্য দুইই ছিল ভাল—সুতরাং সে দিক দিয়েও প্রয়োজন ছিল না। তবে আমার অনুমান এবং এই অনুমান সত্য বলেই আমার বিশ্বাস যে, পাছে তরল মল হয় সেই জন্যই তিনি আফিং খেতেন। সরল উদারহৃদয় মানুষটির এই ভয় নিয়ে লোকে তাঁর সঙ্গে রহস্য করত—বাবু, পাশের গাঁয়ে কলেরা হয়েছে শুনছি। অতুলশিববাবু রূপোর আফিংয়ের কৌটাটি বের করে—খানিকটা আফিং মুখে ফেলে বলতেন গৌরদাস—জল আন। এই অতুলশিববাবু সর্ব্বাগ্রে সপরিবারে রওনা হতেন—হয় সিউড়ি, নয় কলকাতা।

তাঁর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পালাত রাধাদাদা—রাধাশ্যাম—যিনি ছিলেন আইনবিদ্ ছাত্র—বলতেন—একসঙ্গে দুটো পানিশমেণ্ট হতে পারে না।

তিনি পরবর্ত্তী জীবনে হয়েছিলেন খবরের ডিপো। বসে থাকতেন—আর তাঁর কাছে রাজ্যের ছেলেরা আসত তামাক খেতে, তবলা বাজানো

শিখতে, ফিষ্ট করতে, চা খেতে। রাধাদাদা দিনে চা খেতেন বিশ-পঁচিশবার। আর পাশা বা দাবা খেলতেন। অবশ্য এক চা-খাওয়া ছাড়া কোনটাতেই তিনি মাস্টার ছিলেন না। এই রাধাদাদা নিজে পালাতেন কলকাতা, নয় ধানবাদ, নয় অন্য কোন ভাল জায়গায়। গ্রামে কলেরার খবর পাওয়া মাত্র তিনি বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে পথেই অতুলশিববাবুর কাছারীর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকতেন—ম-ম-মধ্যম বা-বা-বাবু।

কণ্ঠস্বর শুনেই মধ্যমবাবু অতুলশিব বুঝতে পারতেন। তিনি আফিংয়ের কৌটো খুলতে খুলতেই উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলতেন—রা-রা-রাধাই।

রাধাদাদা হাতের একটি আঙুল ইসারা ক'রে দেখিয়ে—ঘাড়টি দুলিয়ে বলতেন—হুঁ।

—লে—লে—লেগেছে?

—পা-পালান। এ-একসঙ্গে দ্—দ্—দ্ তু' জ্-জ্-জন।

—ত্—ত্—ত্—তুই ক্ ক্ ক্ কবে যাবি?

—আ-আজই।

অতুলশিববাবু উঠতেন—ম্ ম্ ম্ ম্যানেজারবাবু, তি-তি-তি-তিনটের ট্রেনে গাড়ী চাই। আ-আ-আস্তাবলে বলে পাঠান। অতুলশিববাবু এবং রাধাদাদা—দুজনেই ছিলেন তোতলা।

এর পরই রাধাদাদা আসত আমাদের বাড়ী। আমার পিসীমা ছিলেন তাঁর ভিক্ষে মা। পৈতের পর মুখ দেখেছিলেন। রাধাদাদা নিজের বাড়ী না-ঢুকে আসত আমাদের বাড়ী। পিসীমাকে তার ভয় ছিল, রহস্য করত না, গম্ভীরভাবেই বলত, ভিক্ষেমা, গ্—গ্ গাঁয়ের খবর খারাপ। ময়রা পাড়ায় এই—এই হয়েছে। মধ্যমবাবু যাচ্ছেন ক্-ক্-কলকাতা, আমিও-যা-যা যাচ্ছি। তোমরাও সব।

রাধাদাদাদের বাড়ীর মেয়েরাও অনেকে আমাদের সঙ্গে যেতেন।

বৎসর খানেক পর আবার কলেরা হ'ল, আবার পালালাম।

এর পরই বোধ হয় এল আমার সেই কৈশোরের জাগরণ। সেই আগুন নিভিয়ে বাড়ী ফেরার লগ্ন। সেবা-সংঘের কাজে লাগলাম। বিবেকানন্দের

বই পড়লাম। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-ধর্মের কথা শুনলাম, পড়লাম। কলেরা সম্পর্কে তথ্য পড়লাম, জানলাম। তবু কলেরা সম্পর্কে আতঙ্ক গেল না। সে কি আতঙ্ক। কলেরা হয়েছে শুনলে আমার হাত পা-ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

এর পর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলাম। তার আগেই হল বিয়ে। তখন বয়স ষোল, ঠিক এই সময় গ্রামে লাগল কলেরা। বোধ হয় বিয়ের মাস-খানেক পরেই। সরে যেত হবে, নইলে কলেরায় মৃত্যু হবে। রাধাদাদা পালালেন যেন কোথায়। তখন অতুলবাবু নাই। তিনি মারা গেছেন ক'বছর আগে। বোধ হয় তৃতীয় বার কলেরার কিছুদিন পর। এবং নিয়তির পরিহাসের মত ব্যাপার এই যে, অতুলশিব মারা গেলেন ভেদ বমি করেই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

যাক। এবার স্থির হল যে আমরা যাবো পাটনায় আমার মামার বাড়ী। আমার বিয়ের সময় দিদিমা আসতে পারেন নি, দাদামশাই পক্ষাঘাত রোগে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন দীর্ঘকাল, সুতরাং মা এবার ছেলে-বউ মেয়ে-জামাই নিয়ে পাটনা যেতে চাইলেন। কিন্তু আমার শ্বশুর পক্ষ থেকে দিদিশাশুড়ী স্বর্গীয় যাদবলাল বাবুর স্ত্রী বললেন, এতদূর আমার নাতি-নাতবউ পাঠাব না।

মা আপত্তি করলেন না। কি করবেন?

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় দূত এল যে, তাঁর নাতনী, আমার পত্নী নিতান্ত নাবালিকা, দশ বছরের মেয়ে, তাঁর কাছ ছাড়া ঘুম হয় না, তাকে যেন এতদূরে নিয়ে যাওয়া না হয়।

লেগে গেল কলহ।

প্রথমে স্বামীত্বের দাবী নিয়ে আমি। মায়ের ম্লান মুখ দেখে আমার পৌরুষ জেগে উঠল। বললাম—নিয়ে যাবই।

যাদবলালবাবুর গৃহিণী ও অঞ্চলে প্রবল প্রতাপান্বিতা মহিলা ছিলেন। জমিদারী চালাতেন। নিজের ছেলেদের বলতেন—মারব গালে চড়। তিনি আমার মত ষোলবছরের একছটাক ছেলে নাতজামাইয়ের দাবী শুনবেন কেন? বলে পাঠালেন—আমি বিয়ে দিয়েছি নাতনীর, নাতনী বিক্রী করি নি।

এবার উঠলেন পিসীমা। ফণা তুলে উঠলেন। হোক বড়লোক, তবু এ বাড়ীই বা খাটো কিসে? আমরা পুরাতন। আমাদেরও মৃত গেল।

কিন্তু সে কথা থাক। পরে সে কথা। কলেরার কথা বলি।

সেবার পাটনা গেলাম। যাদবলাল-গৃহিণীই অগ্রযুক্তা হয়েছিলেন সেবার। আমার বোন, আমার স্ত্রী ওরা ওঁদের পরিবারের সঙ্গেই গেল। আমরা তিন ভাই গেলাম মাকে নিয়ে পাটনা।

এর পর, বছর কয়েক পর আবার লাগল কলেরা।

সে কলেরার আক্রমণ ভীষণ। সর্ব্ব জেলাব্যাপী। অনাবৃষ্টির বৎসরের পরবর্ত্তী বৈশাখে। দেশ জলহীন। কলেরা লাগল আগুনের প্রতাপে। প্রখর গ্রীষ্মে খড়ের চালের গ্রামে আগুন লাগল যেন। ধাত্রীদেবতায় এই মহামারীর ছবি আছে। একবিন্দু অতিরঞ্জন নাই। ডোমপাড়ায় ফ্যালা ডোমের বউ কলেরায় আক্রান্তা হয়ে পড়ে আছে, বাড়ীর সকলে পালিয়েছে। দেখেছি—শকুনের পাল বসে আছে ভাঙা পাঁচীলের উপর।

এবার মনকে বাঁধলাম। পালাব না। এই কি জীবন? শুধু পালাব না নয়, সেবাসংঘের আমিই তখন সম্পাদক, সেবার স্বাদ আমি তখন পেয়েছি; বিবেকানন্দের মূর্ত্তি চোখের সামনে ভাসত। এর একটা আরম্ভ আছে। মনে মনে যেটা আরম্ভ হয় মাটীর তলায় বীজের অঙ্কুরিত হওয়ার মত সে বৃত্তান্ত অপ্রকাশিতই থাকে, এই প্রকৃতির নিয়ম। তার প্রকাশের দিন থেকেই তার ইতিহাস হয় স্বরু। সেই স্বরুই কথাই বলি।

আমাদের সেবাসংঘের দুটি বিভাগ ছিল। একটি হ'ল মুঠির চাল সংগ্রহ করা। আমার আগে এটি চালাতেন রাধাদাদা। চাল তুলে জমা রাখতেন এক বড় দোকানীর দোকানে। চাল কেনা-বেচার কারবার ছিল তাঁর। সর্ত্ত ছিল প্রয়োজন মত চাল তিনি দেবেন। তখন এমন অবস্থা ছিল না দেশের। অনাহার এমন ছিল না। ভিক্ষুক যারা ছিল তারা ছিল পেশাদার ভিক্ষুক। মধ্যে মাঝে অসুস্থ লোকের সংসারে অভাব ঘটত। সেবাসংঘ থেকে তাকে সাহায্য দেওয়া হ'ত। পাঁচ সের, দশ সের। বছরে চাল আদায় হত পনের-কুড়ি মন। এর মধ্যে পাঁচ সাত মন রাধাদাদা খরচ

করতেন গ্রামের চব্বিশ প্রহরে। রাধাদাদা ওরও পাণ্ডা ছিলেন। মদ মাংস সবই খেতেন, শাক্ত বংশের সন্তান রাধাদাদার ওটা ছিল আনন্দ বিলাস। হরিনাম সংকীর্ত্তন, কীর্ত্তন হত, লোকে শুনত, রাধাদাদা পোয়াখানেক গাঁজা এনে হামানদিস্তের মধ্যে ফেলে ছেঁচতেন; আর লোককে ডেকে খাওয়াতেন। ভাল তামক থাকত, তার সঙ্গে মেশাতেন। যে গাঁজা খেতে আপত্তি করত, তাকে ঐ তামাক খাওয়াতেন।

—বেশ, তামাক খাও। খাস বালখানার তামাক।

যে খেত সে কিছুক্ষণ পর ভাম হয়ে যেত। রাধাদাদার এক খুড়ো কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংস্‌-এ চাকরী করতেন। তিনি গরুর গাড়ীতে আমদপুর গিয়ে ট্রেণ ধরবেন, কলকাতা আসবেন। রাধাদাদা তাঁকে বললেন —সে কি হয়। গ্‌ গ্‌ গাঁয়ে চ্‌ চ্‌ চব্বিশ প্রহর হচ্ছে, আপনি চলে যাবেন!

—দূর, কি সব যাচ্ছেতাই কীর্ত্তন এনেছিস—।

—ব্‌ ব্‌ বেশ, তামাক খেয়ে যান।

চব্বিশ প্রহরের ভাণ্ডার-ঘরের সামনে গাড়ী আটকে কথা বলছেন রাধা-দাদা।—ব্‌ ব্‌ বালাখানার ত্‌ ত্‌ তামাক।

খুড়ো ঠিক না-জানা ছিলেন না রাধাদাদার কীর্ত্তিকলাপ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে রাধা যে রহস্য করবে এ ধারণা তাঁর ছিল না।

তামাক খেলেন তিনি। রাধাদাদা গাড়োয়ানটাকেও খাওয়ালেন। পুরো একটি কল্কে সেজে তাকে দিলেন। রথী কাৎ হ'ল না—সারথী কাৎ হ'ল—সে সেইখানেই শুয়ে পড়ে বললে, সেই ভাল গো বাবু, কাল পরশু যাবেন! আমি মশাই আজ আর পারব না। গরু দুটোকে চার আটি খড় দিয়ো গো বাবা! আমি ঘুমুচ্ছি।

খুড়ো গাড়োয়ানকে ঠেলা দিয়ে বললেন—এই, এই বেটা ওঠ! এই!

সে বললে—উঁহু। ভাড়া তো নি নাই গো যে চল বললেই যেতে হবে আমাকে! যাব না।

খুড়ো এবার পায়ে ক'রে ঠেলা দিলেন—গাড়োয়ান খিল খিল ক'রে হেসে উঠে বললে—কি যে কাতু কুতু দিচ্ছেন মাইরি।

খুড়ো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, রাধাদাদা তাঁকে এবার কীর্ত্তনের আসরে টেনে এনে বসিয়ে সিগারেট দিয়ে বললেন—একটু কীর্ত্তন শুনুন, আমি মাথায় জলটল দিয়ে বেটাকে খাড়া করছি না হয়।

চমৎকার নেভিকাট টোবাকোর হাতে-পাকানো সিগারেট। রাধাদাদা তাতেও ভিয়েন করে রেখেছেন। সিগারেট খেতে খেতে খুড়ো মশায়ের কীর্ত্তনের ভাব লাগে। মাথা দোলে। কিছুক্ষণ পর রাধাদাদা এসে বলেন, বেটাকে টেনে তুলেছি কোন রকমে।

খুড়ো রাধার পিঠে চাপড় মেরে বলেন—বাহ্‌বা, আচ্ছা কীর্ত্তন এনেছিস। বহুত আচ্ছা। ও বেটাকে আর টানিস না। যাব না আজ। গাইছে ভাল, শুনি।

রাধাদাদা আর একটা সিগারেট তাঁকে খাইয়ে এসে ভাণ্ডারের দাওয়ায় বসেন, দোসরা লোক খোঁজেন।

এই রাধাদাদার হাতে সেবাসংঘ চলছিল কোন রকমে। রাধাদাদা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এই সংঘটিকে, এর জন্যই আমি অন্তত আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। লাভপুরও থাকবে। রাধাদাদার হাত থেকে নিয়ে এতে আগুন নেভানো বিভাগ খোলা হয়েছিল। তারপর এল আমার হাতে। একদিন আমাদের গ্রামের স্টেশনে ট্রেন থেকে নামালো একটি জোয়ানের আহত দেহ। জোয়ানটি একটা ব্রিজের উপর একপাশে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন পাস করছিল; সেই সময় লোকটা ব্রিজ থেকে পড়ে গেছে, বেশ গুরুতর আহত হয়েছে। আমাদের এখানে হাসপাতালে পাঠানো গার্ডের অভিপ্রায়। নইলে সেই কাটোয়া। কাটোয়া পৌঁছুতে আড়াই ঘণ্টা। এখানে হ'লে এখনি চিকিৎসা হতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর যা-হয় ব্যবস্থা হবে। গার্ড মোট কথা নিজের ঘাড়ের বোঝা নামাতে চায়। আহত লোকটা পড়ে রইল প্লাটফর্মে। স্টেশনে লোক নাই, হাসপাতালে ব্যবস্থা নাই, লোকটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, লোকে ভিড় ক'রে চারিদিকে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখছে।

আমার ভিতরে সেই জাগল! যে জেগেছিল সে দিন আগুন লাগার রাত্রে।

কেমন যেন হয় এ সময়। পাশের মানুষ চোখে পড়ে না, বাধার কথা মনে থাকে না, পায়ে কাঁটা ফুটলে গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না। একটা দৃঢ় সংকল্প জাগে, কাজের পথে বেগবান হয়ে ছুটি, সামনে বাধা এলে অবলীলা ক্রমে লাফ দিয়ে পার হই, কারও সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তার মুখের দিকে চকিতের জন্য প্রসন্ন হাসি-ভরা মুখে তাকাই, তারপর আবার ছুটি। সে দিন ওই লোকটিকে নিয়ে গেলাম হাসপাতালে। স্ট্রেচার তৈরী করেছিলাম নিজে।

তারপর একদিন খবর এল—বাজার-পাড়ার নালার মধ্যে এক বৃদ্ধ পড়ে আছে, লোকটি বোধ হয় বাঁচবেনা। গেলাম। এক সোত্তর আশী বছরের ভিক্ষুক—এক টুকরো কাপড় কোমরে জড়ানো, পড়ে আছে নর্দ্দমার মধ্যে, পাশে লাঠিটা পড়ে আছে; একটি দাওয়ার উপর তার ঝুলিটা। ওই দাওয়ায় শুয়ে ছিল রাত্রে, সেখান থেকেই পড়ে গেছে। সমস্ত গায়ে কাদা আর তেমনি দুর্গন্ধ। লোকে নাকে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। গায়ে তার কাদা শুধু নয়, বিষ্ঠা। দাওয়াটা বিষ্ঠায় নোংরা হয়ে রয়েছে।

আমার সঙ্গে ছিল শ্যামু। শ্যামু আজ নাই। কিন্তু তার এতে যেন জন্মগত দীক্ষা ছিল।

শ্যামু আর আমি তাকে তুলেছিলাম নর্দ্দামা থেকে। হাসপাতাল তাকে নিলে না। কি যেন হয়েছিল। তাকে সেবাসংঘের ঘরে এনে জল গরম ক'রে সর্ব্বাঙ্গ ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে শুইয়ে দিলাম। সেই হ'ল সেবা-বিভাগের সুরু।

তার পরই এই কলেরা।

সেবাসংঘের দায়িত্ব নিয়ে কলেরা-আক্রান্ত পাড়ায় ঢুকলাম। বুকটা মুহূর্ত্তের জন্য কেঁপে উঠেছিল। তবু ঢুকলাম।

পিসীমা ছুটে এসেছিলেন খবর পেয়ে।

—যেতে পাবি নে।

—না পিসীমা। যাব। যেতে হবে আমাকে।

—আমি মাথা খুঁড়ব।

—না। সে তুমি পাবে না।

এই!
াই যেতে
খল ক'রে

প্রচণ্ড বিরোধ সুরু হল।

—আমি কাশী যাব।

—যাও। আমি যাব। আমাকে যেতেই হবে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বিস্মিত হলেন। বিরোধ চলছিল। এমন সময় কলকাতা থেকে এলেন দুজন মেডিকেল স্টুডেণ্ট স্বেচ্ছাসেবক। আমাদের বাড়ীতে এসেই উঠলেন।

পিসীমা তবু আশ্বস্ত হলেন। আমারও সাহস বাড়ল। দাওয়া থেকে পড়ে গেছে কলেরার রোগী, বাড়ী থেকে সকলে পালিয়েছে, তাকে পাঁজা কোলা ক'রে তুললাম। ব্লিচিং পাউডার গোলা জলে হাত ধুয়ে শিয়রে বসলাম, বাড়ীতে কেউ নাই, মুখে জল দিতে হবে।

পিসীমা দাঁড়িয়ে দেখলেন সব। তিনি যেন পাথর হয়ে গেলেন।

সাত

ঠিক এমনি ভাবেই পাথর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি আর একদিন। উনিশ শো সতের সালে যে দিন কলকাতা থেকে পুলিশের নির্দ্দেশে বাড়ী ফিরে যেতে হ'ল। বাক্স প্যাঁটরা বিছানা নিয়ে রাত্রি ন'টায় বাড়ী গিয়ে পৌছুলাম। উনিশ শো সতের সালের শেষ। তখন আমাদের ওদিকে ট্রেন হয়নি। লুপলাইনে বোলপুরের একটা স্টেশনর পর দ্বিতীয় স্টেশন আমদপুরে নেমে সাতমাইল পথ গোরুর গাড়ীর ব্যবস্থা। খবর একটা গিয়েছিল আগেই। [illegible] ভাসাভাসা। স্কুল-জীবনের থার্ড ক্লাস কি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি, উনিশ কথা নি[illegible]য়ালের যুদ্ধ লাগল, সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় খবরের কাগজে সংবাদ বের প্লাটফ[illegible] কোম্পানীর আমদানী-করা মশার পিস্তল এবং গুলি বাক্স বাক্স কাতরা[illegible]। এবং সে কাজ বাংলার বিপ্লববাদীদের। তখন দেশে বাংলা অ[illegible]গজ ছিল না। ইংরিজী অমৃতবাজার আসত হেডমাস্টার মশায়ের রাত্রে [illegible] সেই সংবাদটা যখন শুনেছিলাম তখন রক্তে জোয়ার ধরেছিল।

নূতন কাল এসেছে তখন।

আমার কালের কথায় যে কালের আবির্ভাবের কথা লিখেছি। ১৯০৫ সালে যে কালকে আবির্ভূত হতে দেখেছিলাম। সেই কাল। পৃথিবীর বাতাবরণের বিপুলায়তনের কোথায় একটি স্থানে ঝড় ওঠে প্রথমে, সেই ঝড় ক্রমে আপন গতিবেগে ছড়ায় দূর দূরান্তরে। পৃথিবীর সৃষ্টিতে নূতনকে এনে দিয়ে যায়। তেমনি ভাবেই মহানগরীর কেন্দ্র হ'তে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার সাধনার প্রতিটি ঝড় একে একে পৌছে পৌছে এই কালকে প্রসারিত করছিল। মাণিকতলা, দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞের শোভাযাত্রায় বোমা, ঘটনাগুলি ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রেই রেখেছিল।

এইখানে আমাদের ওখানকার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। ঘটনাটি আমার মনে গভীর ছাপ এঁকে গেছে। নতুন থার্ড মাস্টার এলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বোধ হয় পাঁচ সালেই। অগ্নিশিখার মত দীপ্ত একটি তরুণ। বয়স তখন কুড়ি বাইশ। তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ, খড়্গের মত নাসা, তীক্ষ্ণ দুটি চোখ। তিনি ভুবন মোহিনীপ্রতিভার কবি ডাক্তার নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো। তিনি বক্তাও ছিলেন ভাল। পাঁচ সালের পর একদিন তিনি বিলিতী কাপড় পুড়িয়েছিলেন। চোখের সামনে আজও ভাসছে—স্তূপীকৃত কাপড় পুড়ছে, চারি পাশে লোক দেখছে, মানুষ ছুটে এসে সেই বহ্নিকুণ্ডে সমিধ দানের মত নিজের বিলিতী কাপড় এনে নিক্ষেপ করছে। আমার মা আমার হাতে প্রথম রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই আমার উপনয়ন। দ্বিজেনবাবুর এই বহ্ন্যুৎসব আমার জীবনে প্রথম যজ্ঞ, নিত্যগোপালবাবুর শারদীয়া পূজার কবিতা—'দেবাসুর সংগ্রামের এই তো সময়' বোধ হয় প্রথম মন্ত্রপাঠ! উনিশ শো চৌদ্দ সালের ওই মশার পিস্তল লুঠের ঝাপটা একেবারে সোজা এসে লাগল বীরভূমে। হঠাৎ শুনলাম রামপুরহাটে দুকড়িবালা দেবী নামে একজন মহিলা গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর বাড়ীতে সেই পিস্তলের পিস্তল পাওয়া গেছে। তাঁর বোনপো, তাঁর প্রায় সমবয়সীই, নাম নিবারণ ঘটক, তিনিই এনে রাখতে দিয়েছিলেন। শুনলাম ধরা প'ড়ে তিনি 'বন্দেমাতরম্'

ধ্বনি দিতে দিতে পুলিশের সঙ্গে গিয়েছেন হাসিমুখে। তখন একটা গান ছিল

যায় যাবে জীবন চলে
'বন্দেমাতরম্' ব'লে।

আজকাল ইনকিলাব জিন্দাবাদে বিপ্লবের আয়ু বাড়ে কিনা, বিপ্লববহ্নি বর্দ্ধিততর শিখায় জ্বলে কিনা সন্দেহ আছে; মনে হয় বিপ্লববহ্নির, সে কালের অগ্নিদেবতার মত যজ্ঞহবি ক্রমান্বয়ে পান ক'রে অগ্নিমান্দ্য হয়েছে। ধ্বনি শুনে শুনে কানে ঘাঁটা পড়ে গিয়েছে। সে কালে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উঠলে অগ্নিতে যেন 'স্বাহা' বলে ঘৃতাহুতি পড়ত।

উত্তেজনায় মনের আবেগে বাড়ীতে লুকিয়ে রামপুরহাট গেলাম। কেন গেলাম জানি না। যুক্তি ছিল না। তবু গিয়েছিলাম। দুকড়িবালা তখন জেলে। রামপুরহাটে নেমে ভয় হ'ল, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না তাঁর কথা। ফিরে আসবার পথে স্টেশনে বিচিত্রভাবে আলাপ হল নলিনী বাগচীর সঙ্গে। তিনি তখন কলেজের ছাত্র। যাচ্ছেন নলহাটির পথে, নলহাটি থেকে ব্রাঞ্চ লাইন হয়ে নিমতিতা। আমার থেকে বয়সে বড়। স্টেশনের পিছনে মুসাফেরখানায় তিনি পানিপাঁড়ের সামনে হেঁট হয়ে হাত পেতে জল খাচ্ছিলেন। আমিও জল খাবার জন্য পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি জল খাওয়া শেষ করে আঃ বলে হাতের অঞ্জলির উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট জলটুকু দিলেন ছড়িয়ে। একটা তৃপ্তি এবং একটা উল্লাস ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁর মনের ভিতর বোধ হয় কোন হেতুতে উচ্ছ্বসিতই হয়ে উঠেছিল। কারণ যাই হোক, জলের অঞ্জলির সবটুকুই আমার মুখে এসে পড়ল। আলাপের সূত্র ওই জলের সূত্র থেকেই। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়েছিল। বোমা পিস্তলের কথা নয়। তাঁর কথাও বেশী নয়। আমিই কথা বলেছিলাম বেশী। নিমতিতার কথা থেকে সুরু। বললাম—নিমতিতা জানি! ওখানকার গৌরসুন্দর বাবুরা খুব বড় জমিদার। তারপরেই বললাম ওঁরা আমাদের পত্তনীদার।

কৌতুক অনুভব করেছিলেন তিনি। খুদে একটি জমিদার বা জমিদার-তনয়ের এমন কথা নিশ্চয় কৌতুকজনক। বলেছিলেন—তোমরা জমিদার?

—হ্যাঁ। আমাদের ১০৭২ নম্বর হুদা শ্যামপুর শাসন করতে না পেরে

গৌরসুন্দরবাবুকে বেচে পত্তনী দিয়েছিলাম। খুব শাসন করেছেন কিন্তু গৌরসুন্দরবাবু

এই ভাবে আলাপে এগুতে এগুতে নিজের সব গুণপনার কথাই প্রকাশ করেছিলাম। আমি পদ্য লিখতে পারি। খুব ভাল পদ্য বলতে পারি। ইস্কুলে ক্লাসে সেকেণ্ড থার্ড হই। তিনি আমাকে কাগজ পেন্সিল দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন—লেখ তো একটা পদ্য। লিখেছিলাম বারো লাইন। কি লিখেছিলাম মনে নেই, তবে মাইকেলের 'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ-লতিকারে',—এই কবিতার ছন্দ ধ'রে লিখেছিলাম। আমাদের সাহিত্য-পাঠে এই ছন্দের কবিতার প্রাদুর্ভাব ছিল বেশী। পূজোতে তখন কবিতা লিখি; বাড়ীতে নিয়মিত লিখি দুর্লভ একসারসাইজ বুকে; আমাদের লাভপুরে তখন মাসে মাসে সাহিত্যসভা বসে। প্রতি অধিবেশনে কবিতা লিখে পড়ি। বাড়ীতে তখন এক মহাকাব্য ফেঁদেছি। নাদির শাহের ভারত অভিযান ছিল বিষয়বস্তু। সমস্ত রচনার মধ্যে এই ছন্দের রচনাই বারো আনা। এবং ভারতের দুঃখে বিলাপ থাকত বেশী। সেদিন যে কবিতাটি বারো লাইন লিখেছিলাম সেটির মধ্যেও ওই ছন্দ এবং ওই বিলাপ ছিল। তিনি খুসী হয়েছিলেন। বলেছিলেন—তোমাকে চিঠি লিখব, উত্তর দিয়ো, কেমন ?

তারপরই আসল কথাটি ফাঁস হয়ে পড়ল। প্রশ্ন করলেন—কোথায় এসেছিলে ?

প্রথম বললাম—ফুটবল খেলা দেখতে।

কিছুক্ষণ পর কেমন যেন অপরাধ বোধ করলাম—বললাম আসল কথা। চুকড়িবালার বাড়ী দেখতে এসেছিলাম।

আলাপের বন্ধনটা দৃঢ় হয়ে গেল। তিনি নিজের কথা কিছু বললেন না কিন্তু বললেন অনেক কথা, যার মধ্যে বিপ্লববাদের আভাষ ছিল। চিঠিপত্র কয়েকখানা লিখেছিলাম। চার পাঁচখানা। তার বেশী নয়। দেখাও হয়েছিল আর একবার। এবার দেখা করার স্থান ছিল—সাঁইথিয়া, ময়ূরাক্ষীর তীর। সেদিন তিনিই অনেক কথা বলেছিলেন। স্পষ্ট কথা।

এর মধ্যে আরও এমন সংঘটন হয়েছিল, যাতে আমার অন্তরের এই আকর্ষণটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল। বংশের কীর্ত্তির যেমন একটা আকর্ষণ আছে, তেমনি আকর্ষণ। যার মধ্যে আছে একটা কর্ত্তব্যবোধ। আমার সেজমামা হঠাৎ প্লেগে মারা গেলেন। তার আগে পত্রে বারকয়েক সংবাদ পেয়েছিলাম যে তিনি বাড়ী থেকে পালিয়েছেন এবং কাশী থেকে তাঁকে প্রায় ধ'রে আনা হয়েছে। মৃত্যুর পর সংবাদ পেলাম তিনি কাশীর বিপ্লবী দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। স্বর্গীয় শচীন্দ্র সান্যালের কাছেই পালিয়েছিলেন। প্রতিবারই সেখান থেকেই ধ'রে আনা হয়েছিল। বড়মামা প্রায় বিস্তৃত বিবরণই জানিয়েছিলেন। এবং মা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেছিলেন—গুগু (সেজমামার ডাকনাম) যদি ফাঁসী যেত প্লেগে না মরে, তবে যে সে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যেত।

এই ভাবেই আমার মনে সেদিন নূতন কালের সাধনার বেদী বাঁধা হয়েছিল। কিন্তু যোগাযোগের অভাবে প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞবহ্নির সম্মুখীন হয়ে সমিধ যোগাতে পারি নি। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে পড়তে এলাম। মাস ছয়েক পরে এই ঘটনা ঘটল।

পিসীমা একদা প্রায় জীবনের সর্ব্বস্ব হারিয়ে অর্দ্ধোন্মাদ অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন পিতৃগৃহে। তাঁর পৈতৃক সংসারও ছিল বৃহৎ সংসার; বহুজনের সংসার; বহুজনের সমারোহ ছিল সে সংসারে। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হয়েছিল, পিতা ছিলেন পরম স্নেহপরায়ণ। তিনিই ধরেছিলেন সংসার। পাঁচ বোন এক ভাই ক্রমে যখন বড় হয়ে উঠলেন তখন বিশৃঙ্খল সংসার আবার সুশৃঙ্খল হয়ে উঠল, তারুণ্যের আনন্দে উল্লাসে মুখর হয়ে উঠল। সেকালের সম্পন্ন কুলীনের ঘর। মেয়েদের বিবাহ হ'ল কুলীনের সঙ্গে, কুলীনের মেয়ের শ্বশুরবাড়ী কদাচিৎ ভাগ্যে জুটত; তবে সম্পন্ন শ্বশুরের ঘর হলে জামাতারা সেখানে বৎসরে অন্তত মাস ছয়েকের জন্যে বসবাস করতেন। বাকী ছয়-মাস অন্যান্য শ্বশুরগৃহে পরিভ্রমণ ক'রে কর্ত্তব্য পালন করতেন; তার সঙ্গে প্রাপ্য আদায় পেতেন জামাতা বিদায়, কাপড়, নগদ টাকা; এদিকে সম্পন্ন

শ্বশুরঘরেও পোষ্য হওয়ার অনাদর কোন ক্রমেই মাথা তুলে উঠতে পারত না। তাঁরা সুব তীক্ষ্ণদৃষ্টি ব্যক্তি ছিলেন—ভাতে ঘিয়ের অভাব হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেন না, পরিমাণে কম হয়ে এলেই ক্যাম্বিসের ব্যাগে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে একদা শ্বশুরকে প্রণাম ক'রে বলতেন—আমাকে একবার যেতে হবে।

পিসীমার পৈতৃক সংসারেও জামাতাদের বাস ছিল। প্রথম দুই কন্যার এমনি কুলীন জামাতার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার পর আমার পিতামহ বাকী তিনটি কন্যার অবস্থাপন্ন কুলীনের ঘর খুঁজে বিবাহ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে আমার ধাত্রীমাতা এই পিসীমাই প্রথমা। তিনি যখন স্বামীপুত্র হারিয়ে পিতৃগৃহে ফিরলেন তখনও সে সংসার জমজমাট। তার পর বৎসর-চার-পাঁচের মধ্যেই এ সংসারও বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল। পাঁচ বোনের তিন বোন গেলেন। ভাইয়ের সংসার ভাঙল। প্রথমা স্ত্রী গেলেন। তারপর গেলেন বাপ। এই দুর্ভাগ্যের ঝড়-ঝঞ্ঝা ভোগ ক'রে সংসারে বাঁচবার এবং প্রিয়জনকে বাঁচাবার যে একটি পথ তিনি পেলেন বা মনে মনে রচনা করলেন সেই পথে চলতে তিনি আমার কাছেই পেলেন প্রথম বাধা। এবং আমাকে হার মানাতে না পেরে তিনি নিজে হার মানবার ভয়ে ক্রমে ক্রমে আমার কাছ থেকে দূরে স'রে গেলেন। কিন্তু এই সরে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব তাঁর হয়েছে তাতে আমিও কম ক্ষত-বিক্ষত হই নি।

আমার সাহিত্যে নবদম্পতির বা তরুণতরুণীর রাগ-অনুরাগ, বিরহ-মিলনের কথা ও চিত্রের অভাব আছে। বাইরে থেকে এ অভিযোগ আছে এবং এ অভিযোগ সত্য বলেই আমি স্বীকার করি। তার কারণ আমার প্রথম যৌবনে পিসীমার সঙ্গে ওই দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব এমনি উত্তপ্ত এবং কঠোর হয়ে উঠল যে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার জীবনের সম্পর্কের সকল মাধুর্য্য ও সরসতা প্রায় ঝলসে গেল, কঠিন হয়ে গেল। জীবনের প্রথমে তরুণ-তরুণীর জীবনে যে মধুর দিবা-বিভাবরী আসে, সে এল না বা আসে নি বললেই ঠিক বলা হবে।

আমার প্রথম সন্তান সনতের জন্মের পর পিসীমা তাকে কোলে তুলে নিয়ে খানিকটা সহজ হলেন বটে, কিন্তু আমাদের স্বামীস্ত্রীর মিলিত জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সরস সহজ হ'ল না।

উত্তাপটা তাঁর পড়েছিল একদিকে বধূর উপর অন্যদিকে আমার কর্ম্ম-জীবনের উপর। আমি আমার কাজ নিয়ে যে কঠোরতার সঙ্গে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছি, সে অনেকটা এই আঘাতে। যে সংসারে আমার জন্ম, আমার স্ত্রীর জন্ম, তাতে এই ভাবে নিজেদের সুখ ও আনন্দের দিকটাকে বিসর্জ্জন দিয়ে এ আঘাতের প্রতিঘাত দেওয়ার পদ্ধতিটাই ছিল একমাত্র মহত্ত্বপূর্ণ পদ্ধতি। তিনিও বোধহয় তাই শেষ জীবনে আমার খ্যাতি, আমার প্রতিষ্ঠা, আমার নাগরিক জীবনকে দূরে রেখে লাভপুরের পল্লীজীবনে একান্তভাবে পৈতৃক ঘরদুয়ার নিয়েই কাটিয়ে গিয়েছেন। এখানে যখন মধ্যে মধ্যে আসিতেন তখন একখানি ঘরের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতেন; শুচিতার বাতিককে বড় ক'রে তুলে আমাদের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ ক'রে রাখতেন।

দেনা-পাওনার মামলায় এবং হিসেবে আমার বঞ্চনাটা বড় নয়; তাঁর বঞ্চনাটাই বড়, অনেক বেশী, অনেক ভারী। জীবনে তিনি শুধু দিয়েই গেলেন অভিমান বশে। তিনি একমাত্র যাকে বঞ্চনা ক'রে গেছেন তিনি হ'লেন আমার মা। নিয়ে যা কিছু গেছেন, তিনি তাঁর কাছ থেকেই। এবং এর জন্যে দায়ী যদি কেউ হয় তবে সে তাঁর ভাগ্য দেবতা। তা ছাড়া আর কি নামে তাঁর জীবনের কর্ম্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতাকে অভিহিত করব?

তাঁর মৃত্যুর কথা বলে পিসীমার কথা শেষ করব।

উনিশ শো পঞ্চাশ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় এলেন। তখন চোখের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছেন। চোখের দৃষ্টি কমে যাচ্ছে। এখানে দেখানো হ'ল, ডাক্তার দেখে বয়স জিজ্ঞাসা করলেন। আশী পার হয়েছে বা হচ্ছে শুনে হাসলেন, বললেন, বাইরেটা দেখার বয়স ফুরিয়ে আসার সময় হয়েছে যে, ভিতরের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। তিনি বললেন, বাবা, ভেতরের দিকে উপরের দিকে চোখ রেখে বাঁচা চলে পাহাড়ের গুহায় ব'সে, বায়ু আহার ক'রে। মাটির উপর হেঁটে চলতে হয়, ভাতের থালাটা টেনে নিয়ে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে হয় যে আমাদের মত মানুষকে। হুঁচোট খাব,

ভাতের থালায় হাত দিতে মাটীতে হাত দেব—এই জন্যেই দেহটা যত্নে আছে। চোখটা ততদিন সর্বাগ্রে চাই। ও বাবা, রত্ন; স্বামী পুত্র সবার অধিক। আমার বাবা স্বামী পুত্র নাই, কিন্তু আমার ভাইপো—তাকে তো তুমি জান—সে আমার নিজের সন্তানের অধিক। সংসারে যাদের ছেলে আছে তাদের দশা তো দেখেছি, সে থাকা না-থাকা সমান। আমার ভাইপো আমার নিজের সন্তানের অধিক। সে, তার বউ, ওদের ছেলে পুত্রবধূ আমার যে সেবা করবে সে আমি জানি, কষ্ট আমার হবে না; কিন্তু ওই ভাতের থালায় হাত দিতে মাটীতে হাত দেব,—এক পা হাঁটতে গিয়ে হুঁচোট খাব, এ আমি পারব না বাবা।

ডাক্তার ওষুধ দিলেন। খেয়ে তাঁর উপকারও হল। দুপুর বেলা মহাভারত পড়তে সুরু করলেন। এই পরই ব্যস্ত হলেন লাভপুর ফিরবেন। আমি বললাম—না। এখন থেকে এখানেই থাক। বুঝিয়ে বললাম, দেখ, এত বয়স হ'ল, সেবার দরকার, তা ছাড়া হঠাৎ যদি তোমার কিছু হয় তবে হয় তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। কলকাতায় গঙ্গা রয়েছেন, গঙ্গা তীরে তোমার শেষ কৃত্য হবে, লাভপুরে আর যাওয়া উচিত নয়, যেয়ো না তুমি।

ছেলে মেয়েরা সকলেই ধরলে তাঁকে।

তিনি বললেন—ওরে, বউকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। অর্থাৎ আমার মাকে।

মা বললেন—বেশ, আমিও এখানে থাকব। মাসে একবার লাভপুর গিয়ে ঠাকুর দেবতার পূজার ভোগের ব্যবস্থা দেখে শুনে আসব।

পিসীমা এবার বললেন—বেশ তাই হবে। তবে একবার তো যেতে হবেই।

—কেন?

—কেন? হাসলেন তিনি। তোদের বাসন-কোসন জিনিষ-পত্র এতকাল আমি রেখেছি, তোর মা পর্য্যন্ত জানে না কি আছে কি নেই, কার কোন্‌টা। আমি গিয়ে সব দেখিয়ে দেব। তোদের তিন ভাইয়ের পৈতে, বিয়ে, তোদের ছেলেদের অন্নপ্রাশন, পৈতের বাসন পৃথক ক'রে দেব।

জিনিষপত্র দেখিয়ে বুঝিয়ে দেব। আর—। আর বাবা আমার দেনা পাওনা ?

পরে শুনলাম—যে টাকা আমি পাঠাতাম তাঁকে নিজস্ব খরচের জন্য তাই থেকে তিনি কিছু কিছু ধার দিয়ে থাকেন।

বললেন—লোকে অভাবে চায়, দিই। বলি—একেবারে তো পারব না, এগুলি আমি রাখছি—ছেলেদের দিয়ে যাব, আমার শ্রাদ্ধ করবে তো—তাতেই দেবে।

এই কারণ দেখিয়েই তিনি সে মাসে লাভপুর ফিরলেন। সেখানে গিয়ে সকলের কাছেই বললেন—আসছে মাসে আমি কলকাতায় যাব, দেহটা সেখানেই রাখতে হবে—ছেলের হুকুম। যাবার সময় দেখা ক'রতে পারি-না-পারি বিদায়টা নিয়ে রাখছি ভাই। দিনও আর নাই। সে আমি বুঝছি।

জুন মাসের শেষ দিকে আসবেন জানালেন।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই হঠাৎ এখানে খবর পেলাম—আমার ছোট ভাই যিনি লাভপুরে থাকেন তিনি রাজনৈতিক দলাদলির এমন জটলায় জড়িয়ে পড়েছেন যে তা থেকে হয় তো আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিরোধের সৃষ্টি হবে, হয়তো বা মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তাঁদের দলের মিটিং আসন্ন—যে মিটিং-এ এই জটলার জটা বিস্ফোরণ হয়ে বিরূপাক্ষের আবির্ভাব হবে। আমি টেলিগ্রাম ক'রে ছোটভাইকে কলকাতায় আনালাম। ছোট ভাই কলকাতায় এল যেদিন সেদিনও পিসীমা সহজ এবং সুস্থ। তারপর দিন বেলা দুটোয় তাঁর জ্বর হ'ল। পরদিন বেলা তিনটেয় তিনি দেহ ত্যাগ করলেন। হাসি মুখে। মৃত্যুর মিনিট কয়েক আগে পর্য্যন্ত বলেছেন—ভাল আছি। যাচ্ছেন বুঝতে পেরেছিলেন। কোন খেদ করেননি। অথচ খেদ করবার ছিল। সংসারের মধ্যে তিনটি ভাইপো, তারা ঘটনা চক্রে সকলেই সেই ক্ষণটিতে বাইরে। শুধু পদশব্দ শুনলেই ফিরে তাকিয়েছিলেন। বুঝতে পারি, প্রত্যাশা করেছিলেন—আমরা এসেছি। নিঃশব্দে, তাঁর জীবনের প্রিয়তমা সখী ভ্রাতৃবধূ, আমার মায়ের হাতে হাতটি রেখে মহাপ্রয়াণ করলেন।

এই আমার পিসীমা। আমার ধাত্রীদেবতা। তাঁর কথা শেষ করবার সময় ধাত্রীদেবতার পরিশিষ্ট উদ্ধৃত ক'রেই তাঁকে প্রণাম জানাব।

'সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বাস্তু। সেই বাস্তুর মূর্তিমতী দেবতা তুমি, তুমিই তো আমায় বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে। আশীর্ব্বাদ কর, ধরিত্রীকে চেনা শেষ ক'রে যেন তোমাকে চেনা শেষ করতে পারি।'

আট

আমার দাম্পত্য জীবনের নিরসতার জন্য দায়ী কিন্তু একা পিসীমা নন। আমার জীবনে যেমন তিনি, তেমনি আমার স্ত্রীর জীবনে ছিলেন একজন; তিনি তাঁর দিদিমা।

অথচ এই দুটি মহিলাই একদা উদ্যোগী হয়ে আমার কৈশোরে এবং আমার স্ত্রীর প্রথম বাল্য-জীবনেই এক খাঁচাতে দুটি পাখী পোষার শখের মত শখে দুজনকে বেঁধে দিয়েছিলেন। ভাল হয়েছিল কি মন্দ হয়েছিল সে কথা আজ তুলব না। শুধু একটি কথাই বলব, সেই কৈশোরে বিবাহ না-হলে আমার জীবনে আমি সাহিত্যিক খুব সম্ভব হতাম না; জীবনের প্রবাহ রাজনৈতিক খাতেই নিঃশেষিত হ'ত। বন্দী-জীবনে পড়াশুনা ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিও উত্তীর্ণ হতাম এবং আজকের এই প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের দিনে ভোট-প্রার্থী হয়ে জোরালো বক্তৃতা ক'রে বেড়াতাম। বিধান সভায় বা লোক সভায় আমার কণ্ঠস্বর শোনা যেত।

সে কথা থাক। বলি আমার বিয়ের কথা, কৈশোরেই যে ঘটনাটি আমাকে ডবল প্রমোশন দিয়ে যৌবনের সিংহদ্বারে খাড়া ক'রে দিলে। অকালে পেকে উঠবার যোগ বা সুযোগই হোক আর দুর্যোগই হোক, এনে উপস্থিত করলে। যোগটা এল অতি অকস্মাৎ। ষোল বছর বয়স, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি, ম্যালেরিয়ায় ভুগি ঠিক পনের দিন অন্তর। অর্থাৎ বারো মাসে বারোটা জ্বরের পালা বাঁধা। এক এক পালায় ছ-সাত দিন। বিয়ের কথাটা

অবশ্য বাল্যকাল থেকেই শুনে আসছিলাম। সাত আট বছর বয়স থেকেই শুনে আসছিলাম আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে আছে। মেয়েটির পিতামহ এবং আমার বাবা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি ছিলেন সে আমলের একজন নামজাদা পুলিশ কর্ম্মচারী! ওই মেয়েটি ছিল তাঁর প্রথমা পৌত্রী। মেয়েটির অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলেন বাবা, সেই সময়েই এ প্রস্তাব দুই বন্ধুতে উত্থাপন এবং সমর্থন করে এসেছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর বাবার মাতুল এসে আমাদের বাড়ীতে কর্ত্তা হলেন। তিনি আনলেন আর এক সম্বন্ধ। এক উকীলের পৌত্রী, উকীলের পুত্রী। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম; বাবার মাতুলের প্রভাবে এই সম্বন্ধটিই ক্রমে প্রাধান্য লাভ করলে। আমার যখন এগারো বছর বয়স তখন আমার এই পিতামহ (বাবার মাতুল) আমাকে তাঁর নিজের গ্রামে নিয়ে যাবার পথে ওই উকীলের বাড়ীতে উঠলেন, আদালতে কাজকর্ম্মও ছিল এবং তাঁর অন্য অভিপ্রায়ও ছিল। আমাকে মেয়ে দেখাবার না হোক, উকীল বাবুদের তাঁর এই নাতি-রত্নটিকে দেখাবার অভিপ্রায় যে ছিল সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমার সে কি পরীক্ষা! কন্যার পিতামহ খ্যাতনামা উকীল আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে চললেন। চতুর প্রবীণ উকীল, তাঁর প্রশ্নে আমার নাড়ী নক্ষত্র সব বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তাতে আমি খুব গলদঘর্ম্ম হই নি। বৃদ্ধ এমনই প্রসন্ন হৃদ্যতার সঙ্গে গল্পের ছলে কথা বলেছিলেন যে আমি বিন্দুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিনি। কয়েকটা প্রশ্ন আজও মনে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন—দিনে তো দশটার সময় খাও, ইস্কুল যাও। রাত্রে? রাত্রে ক'টার সময় খাও?

আমি উত্তর দিলাম—ন'টা সাড়ে ন'টার সময়। পড়া শেষ করে।

—কে-কে খাও একসঙ্গে?

—মোলপুরের দাদা (আমার পিতামহ, বাবার মামা), আমি, মায়েব। আমরা তিনজনে একসঙ্গে খাই।

—তোমার মাস্টার? বাড়ীতে মাস্টার নাই?

—আছেন। তিনি বাড়ীতে খান না।

—ও। আর চাকর টাকর পরে খায়! কে? কে?

—হ্যাঁ।, চাকর আর চাপরাশী।

—কে খেতে দেন? মা না পিসীমা।

—না। সাতন দিদি।

—দিদি? কি রকম দিদি?

—আমাদের বাড়ী রান্না করেন, আমি দিদি বলি।

—বাঃ। তাই তো উচিত। ঝিকে কি বল? দিদি?

—হ্যাঁ, যমুনা দিদি বলি।

—ক' জন ঝি?

—যমুনা দিদি আর সোনা পিসী, সে বাউরী, বাসন-টাসন মাজে।

এই ভাবে শুধু বাড়ীর কথাই নয় আমার লেখাপড়ার কথাও জেনে নিয়েছিলেন। এমন কি কয়েকছত্র কবিতা লিখিয়ে নিয়ে আমার হস্তাক্ষর এবং আমি কবিতা লিখতে পারি এই কথাটি সত্য কি না তাও পরখ করে নিয়েছিলেন। এর পর পিঠে হাত বুলিয়ে তারিফ ক'রে কানে কানে বললেন —একটি মেয়েকে দেখাচ্ছি দাঁড়াও, এক্ষুণি আসবে, বলতো কেমন মেয়ে।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণা একটি মেয়ে, চোখ দুটি পিঙ্গল, বোধ হয় বছর আষ্টেক বয়স, বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে দেখালেন।

এবার কথাটা মনে করে এগারো বছর বয়সে লজ্জিত হলাম খুব।

আসল পরীক্ষা কিন্তু এর পরে।

সে দিন ছিল শনিবার। সেখানে পৌঁছেছিলাম সকাল দশটায়। তখন দেখেছিলাম আমার থেকে বছর-চারেকের বড় একটি ছেলে বই বগলে ইস্কুল গেল। আলাপ হয়নি। বেলা দুটো, আমি একা দাঁড়িয়ে আছি বাড়ীটির ফটকে রাস্তার দিকে চেয়ে; প্রতীক্ষা করছি কখন মোলপুরের দাদা ফিরবেন। এমন সময় ফিরল সেই ছেলেটি। ঠিক বোনের মতই চেহারা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, পিঙ্গল চক্ষু। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—তুমি তারাশঙ্কর?

—হ্যাঁ।

—এস আমার সঙ্গে। আমি……।

সঙ্গে গেলাম। একখানি ছোট ঘরে টেবিল চেয়ার আলমারী। বুঝলাম পড়ার ঘর। ছেলেটি বললে—চেয়ারে বস। কোন ক্লাসে পড়?

—ফোর্থ ক্লাস। (আজকালকার ক্লাস সেভেন)

—ইংরিজী কোন্ বই পড়ান হয় ক্লাসে ?

—Blakie's Indian Reader.

ব্লাকি'স ইণ্ডিয়ান রীডার তখনকার দিনে বোধ করি দু-যুগ ধরে ছিল। ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাসে ছিল ওয়েভার্লী নভেল।

বলবামাত্র ছেলেটি আলমারী খুলে তার পড়ে শেষ করা ব্লাকিস ইণ্ডিয়ান রীডার বের করলে। একটা জায়গা বেছে বের ক'রে বললে—রিডিং পড়।" তারপর বললে—মানে কর।

তারপর বইখানা নিজের হাতে নিয়ে বললে—বানান কর। কঠিন একটা শব্দ—নিউমোনিয়া গোছের।

তারপর বইখানা আবার হাতে দিয়ে বললে—পার্সিং কর।

এর পর খাতা পেন্সিল হাতে দিয়ে ডিক্টেশন।

এরপর টেনে বের করলে—এ্যালজেব্রা এবং জ্যামিতি। তার সঙ্গে ব্যাকরণ কৌমুদী প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। মাসটা ছিল বোধ হয় মার্চ্চের প্রথম, গায়ে তখনও সকালে গরম জামা পরতে হয়, আমি এক গা ঘামে প্রায় নেয়ে উঠলাম।

বীজগণিত জ্যামিতির পরীক্ষা শেষ হয় হয় এই সময় এলেন আমার মোলপুরের দাদা। তিনি আবার ছিলেন এই ছেলেটির ভিক্ষেবাবা। অর্থাৎ উপনয়নের পর তিন দিনে ব্রহ্মচর্য্য পর্ব্ব শেষ হবার পর দিন ধুতি চাদর জামা জুতায় গৃহীর বেশ পরিয়ে তাঁর ধর্ম্ম-পিতার গৌরব এবং পুণ্য অর্জ্জন ক'রেছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকে এক গাল হেসে সেই ছেলেটিকে বললেন—কেমন দেখছ ? পারছে বলতে ?

এবং আমার দিকে চেয়ে বললেন—দেখছ ? পড়াশুনায় কেমন দড় ?

এরপর চেপে ব'সে বললেন নাও—তোমরা পড়, আমি শুনি।

ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে ব্যাকরণ কৌমুদী তুলে নিলে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—আমার মাথা ধরেছে।

মোলপুরের দাদা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—মাথা ধরেছে?

মাথা ধরে নাই কিন্তু মাথায় যেন খুন চেপেছিল। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গলায় আঙুল দিয়ে ব'সে পড়লাম একটা জায়গায়। বেলা বারোটায় খেয়েছিলাম। তার ঘণ্টা চারেক পরে গলায় আঙুল দিয়ে বিশেষ কিছু বের করতে পারলাম না, কিন্তু মাথাটা ধরিয়ে ফেললাম সত্য সত্যই। অপর দিকে ইংরিজি-অঙ্ক-জ্যামিতিতে আমার অক্ষমতার ত্রুটি বেরিয়ে পড়ে নি, যাতে ক'রে এটাকে অক্ষমতার লজ্জা ঢাকা দেওয়ার অপচেষ্টা বলে মনে হয়। এবং ব্যাপারটা এমনি আকস্মিক যে, তেমন কিছু সন্দেহ করবার মত অবকাশও তাঁরা পান নি। আমার ক্রোধ ক্ষোভ আমাকে নির্য্যাতিত করলে নীরবে। তাতেও পরিত্রাণ পেলাম না, ডাক্তার এলেন একজন, হজমের ব্যতিক্রম সন্দেহ ক'রে ওষুদ দিলেন, তাও খেলাম। সমস্ত রাত্রিটা প্রায়োপবেশন করে ক্ষিদের জ্বালায় বিনিদ্র হয়ে পড়ে রইলাম, সকালে উঠেই বললাম—বাড়ী যাব।

এমনি ভাবে বিবাহের কথাবার্ত্তা এবং পাত্রী পক্ষের সঙ্গে পরিচয় ছেলে বেলা থেকেই আমার ছিল। ওদিকে পুলিশ কর্ম্মচারীটি পুলিশ সাহেব হয়ে আমাদের জেলায় এসে আমাদের বাড়ী যাওয়া আসা করছিলেন। ওই দুই জায়গার একজায়গায় আমার বিবাহ হওয়ারই কথা। কিন্তু আমার বোনের বিবাহ না-হওয়া পর্য্যন্ত কোন স্থানে পাকা কথা কওয়াটা আমার মা পিসীমার কাছে ছিল অন্যায় অধর্ম্মের সামিল। এ দিকে বাবার মাতুল মারা গেলেন। মা-পিসীমা আমার বোনের বিবাহের জন্য চিন্তিত হয়ে উঠলেন। কে দেখে শুনে পাত্রের খোঁজ করে? এবং টাকা-কড়িরও অনটন হয়ে গেল হঠাৎ। বাবার মাতুলের মৃত্যুতে তাঁর উইল অনুযায়ী তাঁর সম্পত্তি আমরাই পেলাম। উইল প্রবেট নিতে এবং জমিদারের খারিজ ফি দিতে হাতের নগদ টাকা শেষ হয়ে গেল। আসলে কর্ম্মচারী যাঁরা, তাঁরাই আত্মসাৎ করলেন অধিকাংশ টাকা। এই অবস্থায় একস্থানে আমার বোনের সম্বন্ধ স্থির হ'ল।

বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ঘর, ছেলেটি ভাল, স্বাস্থ্যবান, তখন আই-এ পড়ছে, সেই বারই পরীক্ষা দেবে। পাত্র পক্ষ মেয়ে দেখতে এলেন কার্ত্তিক মাসে।

এই সময়ে আমার পিসীমার সঙ্গে স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর স্ত্রীর বেশ অন্তরঙ্গতা জন্মেছে। যাদবলালবাবুর স্ত্রীর ও অঞ্চলে ডাকনাম ছিল গিন্নী মা।

পিসীমা ডাকতেন গিন্নী।

আমার মাও বলতেন গিন্নী। গ্রাম সম্পর্কে আমার মা হতেন গিন্নীর মামী শাশুড়ী। গিন্নী বলতেন বাঁকিপুরের মামী।

গিন্নীর সঙ্গে বাঘের পিছনে ফেউয়ের মত আসত তাঁর মা-মরা নাতনী। দশ বছর বয়স, দেখে মনে হ'ত আট বছরের মেয়ে। রংটা ফর্সা, যত্নের অভাব দেহের শীর্ণতায় এবং বেশভূষায় পরিস্ফুট। দামী শাড়ী, কিন্তু সে ময়লা, নতুন অথচ ছেঁড়া। মেয়েটিকে লোকে বলত কট্‌কটে। অর্থাৎ মুখরা।

গিন্নী প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে চোখের জল ফেলতেন মৃতা কন্যার জন্যে। প্রকাণ্ড বাড়ী, শূন্য পড়ে আছে। নাবালক চারটি ছেলে এবং মেয়েটি মানুষ হচ্ছে তাঁর কাছে। বাপ আবার বিবাহ করেছেন কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর শোকে এমনই মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়েছেন যে প্রায় অমানুষে পরিণত হয়েছেন। বাড়ী বিষয় সম্পত্তি প্রথমা স্ত্রীর নামে বলে আলাদা বাড়ী ক'রে বাস করছেন। এদের সম্পত্তি দেখেন মামারা। বড় ছেলে লক্ষ্মীনারাণ আমারই বয়সী। সে বোর্ডিংয়ে থাকে। আমার শৈশবের বন্ধু। গিন্নীর বাসনা—নারাণের বিয়ে দিয়ে ওদের সংসার পাতিয়ে দিয়ে কর্ত্তব্য শেষ করেন। মেয়েটির জন্য ভাবেন না, শৈশব থেকেই ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে রয়েছে। গ্রামেরই একটি কুলীনের রূপবান ছেলে, কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান, বিষ্ণুঠাকুর বংশের পাণ্টিঘর। এর জন্য মায়ের উইলে ব্যবস্থা আছে—ভাইদের সঙ্গে সম অংশে মেয়ে ভাগ পাবে। বিষয় কম নয়; জমি, জমিদারী, কলিয়ারী ইত্যাদিতে বছরে বিশ একুশ হাজার টাকা আয় এবং নগদ মজুদ বোধ হয় দেড় লক্ষের কাছাকাছি।

ইনিই যে একদা আমার জীবনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবেন এ কথা

ভূ-ভারতে কেউই কল্পনা করে নি; আমি তো করিই নি। আমরা স্থির জানতাম বংশীর (সেই ছেলেটির নাম) সঙ্গেই বিয়ে ওর আঠার আনা নিশ্চিত। মুখরা বলে এবং বন্ধুর ভগ্নী বলে বকেছি, দু চার ঘা না-মেরেছি এমনও নয়। যে কার্তিক মাসের কথা বলছি সেই আশ্বিনে অর্থাৎ মাস খানেক আগের কথা বলি। পূজোর ঠিক আগেই, বোধ হয় দিন দুই তিন আগে হঠাৎ নারাণের মেজভাই চন্দ্রনারাণ আকস্মিক মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত হল। বিচিত্র রোগ। নির্ণয় হ'ল না কি রোগ। ওদের বাড়ীতে পূজোর ভিয়েন হচ্ছিল, অর্থাৎ মুড়কী, নারকেল নাড়ু প্রভৃতি তৈরী হচ্ছিল। দেশে তখন ম্যালেরিয়া ঢুকেছে, চন্দ্রনারায়ণ ম্যালেরিয়ায় ভোগে, দুর্ব্বল শরীর, সে ঘরের মধ্যে ঢুকে খানিকটা মুড়কী নিয়ে লুকিয়ে খেতে গিয়ে হঠাৎ পড়ল মুখ গুঁজে। জ্বর নেই, কিন্তু অচেতন, শুধু একটা গোঙানী ছাড়া কোন সাড়া নেই। কেউ বলে ধনুষ্টঙ্কার, কেউ বলে কিছু—কেউ বলে কিছু। যথা-সাধ্য ডাক্তার বৈদ্যের ত্রুটি রইল না। হয়তো ভুল বললাম—আর্থিক সাধ্য বিচার করলে কলকাতা থেকে খুব বড় ডাক্তার আনার সাধ্য ছিল তাঁদের, কিন্তু সময় ছিল না। সিউড়ী থেকে ডাক্তার যখন এলেন তখন রোগীর শেষ অবস্থা; নাড়ী ক্ষণে ক্ষণে ছেড়ে যাচ্ছে। ডাক্তার বলে গেলেন সাধ্যাতীত। রাত্রির মধ্যেই—।

এই অবস্থায় গিন্নী শিয়রে বসে কাঁদছেন, বাইরে শব সৎকারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ চলছে; নারাণ নীরবে ম্লান মুখে ব'সে আছে, আমিও বসে আছি তার কাছে। হঠাৎ কি কারণে মনে নেই, বাড়ী আসবার জন্য উঠলাম। একটি গলি-পথ ধ'রে অল্প একটু পথ। সেই গলিতে দাঁড়িয়ে এই মেয়েটি আর একজনকে বিজ্ঞভাবে বুঝিয়ে বলছে—মেজদা আর বাঁচবে না। রাত্রির মধ্যেই মরবে—।

সম্ভবত তখনও মৃত্যু যে কি সে জ্ঞান মেয়েটির হয় নি। পরবর্ত্তী জীবনে এমন মৃত্যু-ভয়াতুরা—হয় তো ভুল বলছি—এমন উদ্বেলিত মমতাকাতর নারী আমি খুব কমই দেখেছি। সে মমতা রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় পৃথিবীর মত মমতা। আপনার জন যেখানে যে কেউ আছে এই

মেয়েটি অহরহ তাদের দুহাতে আঁকড়ে ধ'রে যেন বসে আছেন, আর আর্ত্তস্বরে বলছেন—'যেতে নাহি দিব'। অহরহ যেন অনুভব করছেন মৃত্যুর আকর্ষণ ক্ষণে ক্ষণে সবল থেকে সবলতর হয়ে উঠছে। থাক সে কথা।

সে দিন ওই কথা শুনে আমার রাগের আর সীমা রইল না। হৃদয়হীনা মেয়েটা অবলীলাক্রমে বলছে—রাত্তির মধ্যেই মরবে!

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম—পাজী মেয়ে কোথাকার? ফের ওই কথা বললে মুখ ভেঙে দোব তোর। মরবে? কে বললে তোকে?

মেয়েটা মুখরা। সে সইবার পাত্রী নয়, ফোঁস ক'রে উঠল—কই দাও দিকি মুখ ভেঙে! মুখ ভেঙে দেবে?

—বললেই মুখ ভেঙে দোব।

—বলবই তো। আমার দাদা মরবে তো তোমার কি? বেশ করবে মরবে। হাজার বার মরবে। নিশ্চয় মরবে।

সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথায় আমি কয়েকটা চড় মেরেছিলাম। মুখ ভাঙতে পারি নি। ওটা বিধাতা আমার জন্যেই আমার হাত থেকে সেদিন বোধ হয় রক্ষা ক'রেছিলেন। এমনি প্রহার আরও করেছি বিবাহের পূর্ব্বে; সব মনে নেই।

এখানে চন্দ্রনারাণের কথাটা বলে আগে শেষ ক'রে নি। ওঁকে নিয়েই পরে ঘটনাচক্র বিস্ময়করভাবে পাক খেয়েছিল। চন্দ্রনারাণ কিন্তু সে রোগে মারা যায় নি। সে যেমন অকস্মাৎ অচেতন হয়ে পড়েছিল তেমনি অকস্মাৎ আরোগ্য লাভ করলে। সেই দিন রাত্রে প্রায় তিনটের সময় মুমূর্ষু অবস্থায় বার দুয়েক বমির আক্ষেপে খানিকটা গাঢ় শ্লেষ্মা তুলে ফেলেই অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠল—দিদি! তারপরই চোখ মেললে। ঘণ্টা ছয় সাতের মধ্যেই আর কোন রোগ রইল না।

এই ঘটনা থেকেই গিন্নী উঠে প'ড়ে লাগলেন—নারাণের বিয়ে তিনি দেবেনই, এই বৎসরেই দেবেন।

পাত্রীও ঠিক হ'য়েই ছিল। ওঁদেরই আত্মীয় নারাণদের পাল্টিঘর,

কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান, খ্যাতনামা কর্ম্মবীর রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। কাত্তিকমাসেই আশীর্ব্বাদ হবে।

এই সময়েই আর একটি ঘটনা ঘটেছিল যেটি আমি কোন মতেই ভুলে যাই নি। ভুলে নাই [illegible] তাই উল্লেখ করব। এবং আমার জীবনে এই টুকরোটুকুই একমাত্র পূর্ব্বরাগ।

উমার, অর্থাৎ নারাণের এই বোনটির মারাত্মক ভূতের ভয়। একা উমার নয়, গিন্নীর বাড়ীতে তাঁর পৌত্রীও তখন গুটি তিন চার, সব প্রায় এক-বয়সী, সব ক[illegible]নেই সন্ধ্যে হলেই ভূতের ভয়ে হতচেতন হয়ে যায়। পূজোর পর কাত্তিক [illegible] তখনও আসেনি, বাড়ীর ভিতর রোয়াকে বসে আছি। গিন্নী ব্রিগেড—এই মেয়ে ক'টিকে গিন্নীর চেলা কোং বলত সকলে,—এসে আমাদের বাড়ীতে হুড়মুড় ক'রে ঢুকল।

কি ব্যাপার? না—সন্ধ্যে হয়েছে, বাড়ী যাবে, কিন্তু পথে যদি ভূতে ধরে, তাই রক্ষীর প্রয়োজন। একটু দাঁড়িয়ে দাও গো!

দাঁড়িয়ে দেবে আমাদের ঝি, তার হাতে কাজ রয়েছে, সন্ধ্যে জ্বালছে।

অতএব একটু অপেক্ষা করতে হবে। হঠাৎ বোধ করি উমাই আমাকে বললে—তুমি দাও না।

কে যেন, বোধ হয় আমাদের পাচিকা ঠাকরুণ [illegible]—তুমি কি না? কে হয় তোর? সম্বন্ধ ধ'রে বলতে পারিস নে?

সম্বন্ধটা একটু কৌতুকের। ষোল বছরের আমি দশ বছরের মেয়েটির গ্রাম সম্পর্কে দাদামশাই হই। দাদা বলতে বাধে না, কিন্তু ওর সঙ্গে মশাই যোগ করতে বাধে।

উমার মামাতো বোন বললে—ওইটুকু আবার ঠাকুরদাদা হয়?

তাদের আমি ঠাকুরদাদা।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। এবং এই উমা আমার পিছন দিক থেকে পিঠে ধরে ছড়া কাটতে সুরু করে দিলে—

ঠাকুর দাদা গালে কাদা বাগবাজারের দই
ঠাকুর দাদার সঙ্গে দুটো মনের কথা কই।

এরই ঠিক পনের কুড়ি দিন পর। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়ে গেল। আমার বোনকে দেখতে এলেন রামপুরহাট অঞ্চল থেকে সেই পাত্র পক্ষ—যাঁদের কথা আগে বলেছি। ছেলেটি আই-এ পড়ছে, মধ্যবিত্ত ঘর, ছয় সাত ভাই, সব ভাইগুলিই উদ্যমশীল; বড় ভাই এসেছেন দেখতে। দেখা হল, কন্যা পছন্দ হ'ল, দেনাপাওনাও স্থির হয়ে গেল। বিবাহের দিনও স্থির হল অগ্রহায়ণের শেষে। ভদ্রলোক বললেন, আমি তা'হলে কন্যা আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই। পঞ্জিকাতে দিন দেখেই তিনি প্রস্তাবটি করলেন। সেই দিনটি না কি বহু শুভকর্ম্মের পক্ষে প্রশস্ত ছিল। দেখে বললেন—এমন ভাল দিন যখন পাওয়াই গেছে তখন এ কাজটি আমি সেরে যাই। আপনারা কয়েকদিন পর আমাদের ওখানে গিয়ে পাত্র আশীর্ব্বাদ করবেন।

আমার মা-পিসীমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেবতার চরণে প্রণতি জানাচ্ছেন। কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাচ্ছেন, বংশ ভাল, পাত্র ভাল, ঘর ভাল; এর চেয়ে কাম্য আর কি হ'তে পারে! পুরুষ-অভিভাবকহীন সংসার, তার উপর বাবার মাতুলের উইল প্রবেট নিতে এবং ঐ সম্পত্তি দখল নিতে সংসারের সঞ্চয়ের ভাণ্ডার নিঃশেষিতপ্রায়; এ ক্ষেত্রে যখন মধ্যে মধ্যে অল্পবয়সী মৃতদার পাত্রের কথা মনে ওঠে, তখন এমন পাত্র যে কল্পনাতীত! তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন; যিনি বৈঠকখানা থেকে পাত্রপক্ষের প্রস্তাব বহন করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি বোধ হয় আমাদের নায়েব। পিসীমা তাঁকে বললেন—দাঁড়াও বাবা, আগে ঠাকুরদের প্রণামী তুলে রাখি!

ঠিক এই সময় স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর স্ত্রী গিন্নী আমাদের বাড়ী ঢুকলেন, পিসীমা হাসিমুখে বললেন—অ গিন্নী, মেয়ের বিয়ে পাকা হয়ে গেল। ওঁরা আজই আশীর্ব্বাদ করে যাবেন।

গিন্নী বললেন, সেই শুনেই তো আসছি গো। কথা আছে তোমাদের সঙ্গে। বাঁকীপুরের মামী কই? এই যে! চল গোপনে বলব।

মা-পিসীমার বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। আশীর্ব্বাদের মুখে গোপন

কথা? কি সে কথা? কালটা গণনায় বিংশশতাব্দী হলেও পল্লীসমাজে তখন গাঁই, গোত্র, নিকষ ভঙ্গ; পাল্টীঘর, কুলের খুঁত ইত্যাদির প্রভাব চার আনা গিয়েও বারো আনা বর্ত্তমান।

ঘরের মধ্যে গিয়ে গিন্নী বললেন—আশীর্ব্বাদটা বন্ধ রাখতে হবে বাছা।

—কেন? পাংশু হয়ে গেল মায়ের মুখ।

গিন্নী বললেন—কোন ভয়ের কথা নয়। ভাল কথাই বটে। আমি আমার নাতি নারাণের বিয়ে দেব, মাঘ মাসেই বিয়ে দেব। ওদের সংসার পাতিয়ে না দিয়ে আমার মরণেও সুখ হবেনা। আমি বাছা একটি সদ্বংশের সুশীলা কর্ম্মক্ষমা মেয়ে চাই। বাঁকীপুরের মামীর মত মায়ের মেয়ে বুড়ী (আমার বোনের ডাক নাম) আর ও যে কেমন কর্ম্মক্ষমা সে আমি নিজের চোখে নিত্য দুবেলা দেখছি। মনে আমার মাঝে মাঝে কথাটা ওঠে। ওই মেয়েকে যদি ঘরের বড় বউ ক'রে সংসার পেতে দিতে পারি তবে ছোট দেওরগুলি সুখে থাকবে। বলতে পারি নি—অবিনাশের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়ে রয়েছে, আর নারাণের বিয়েও এত শীগ্‌গির দেবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এবার চন্দ্রনারাণের অসুখের পর আমি মত বদলেছি। নারাণের বিয়ে আমি এবারই দেব। ঘণ্টাখানেক ছেলেটা অচেতন হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইল, কেউ দেখলে না! কাল সন্ধ্যেতে শুনে গেলাম তোমাদের মেয়েকে দেখতে আসছে, সারারাত্রি কথাটা ভেবেছি। আমি তোমাদের মেয়েটিকেই নিতে চাই। অবিনাশ আমার বোন পো, কিন্তু সে এখন বড়লোক। বড়লোকের মেয়ে আমি আনব না। আমি মনস্থির করেছি, অপেক্ষা শুধু ষষ্ঠীর মতামতের। তাকে আসতে আমি পত্র দিলাম। কাল পত্র পাবে, পরশু আসবে। তার মতও হবে। তোমরা আশীর্ব্বাদটা হ'তে দিয়ো না।

মা পিসীমা আশাতীত সৌভাগ্যে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেলেন।

নারাণদের বাৎসরিক আয় পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা, দেড় লক্ষাধিক নগদ টাকার মালিক। নারাণের দেহ-বর্ণ কাঁচা সোনার মত, মুখশ্রী দেহসৌষ্ঠবে সে প্রিয়দর্শী। লেখাপড়াতে সে ক্লাসে ফার্ষ্ট হয়। এ যেন সেই

গল্পের কথা; গরীবের মেয়ের ভাগ্যগুণে রাজপুত্রের বাড়ী থেকে এসে হাজির হ'ল চতুর্দ্দোলা।

গিন্নী আরও বললেন—দেনা পাওনার জন্যে ভয় করো না, ওদের যা দিতে রাজী হয়েছ তাই দিয়ো নারাণকে। তাই নেব আমি।

কথা হয়েছিল সর্ব্বসাকুল্যে দেড় হাজার টাকা। কিন্তু অনিশ্চিতের প্রত্যাশায় নিশ্চিত ধ্রুবকে ছাড়বেন কি ব'লে।

গিন্নী বললেন—জবাব দিতে তো বলছি না। ওঁদের বল, আমাদের বংশে আশীর্ব্বাদ আগে থেকে হ'তে নিষেধ আছে। আশীর্ব্বাদ হয় বিবাহের আসরে, বিবাহে বসবার প্রাক্‌কালে। কথা যেমন স্থির তেমনিই রইল। যদি নারাণের সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়ে যায় তবে তখন পত্র লিখে জবাব দেবে।

তাই ব্যবস্থা হ'ল। কথাটা ঘুণাক্ষরে অন্য কেউ জানে না। পাত্রপক্ষও দেনাপাওনার ফর্দ্দ করে ফিরে গেলেন, তিনিও কোন সন্দেহ করলেন না। এ দিকে আশীর্ব্বাদ বন্ধ করেও মা পিসীমা নারাণের সঙ্গে বিবাহের প্রত্যাশায় আস্থা রাখতে পারলেন না। ছুটি দিন ননদ এবং ভাজ বিনিদ্র হয়ে রাত্রে পরস্পরকে শুধু প্রশ্নই করে গেলেন।

—বউ।

—এ্যাঁ

—জেগে আছ?

—রয়েছি ঠাকুরঝি।

—কি হবে বল তো?

—আমার তো মনে হয় না। কিন্তু আমি ভাবছি—

—কি?

—এখানকার পাত্রেরা যদি কোন ভাল পাত্রী পায়—! আমরা যেমন বাঁধা নেই তেমনি তো তারাও নেই!

তৃতীয় দিন সকালে বড় ছেলেকে, আমাদের ও অঞ্চলের বড়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে গিন্নী এলেন আমাদের বাড়ী। বললেন—ফেলুকে সঙ্গে এনেছি।

পাকা কথা দিতে এসেছি। কোষ্ঠীর মিলের অপেক্ষা শুধু। গ্রহাচার্য্যকেও আনতে পাঠিয়েছি! কাল সকালে যোটক বিচার হবে।

ষষ্ঠীকিঙ্করবাবু বললেন—আমি খুব খুসী মনে মত দিয়েছি বাঁকীপুরের দিদি। এ বিয়ে হলে নারাণ সুখী হবে। আমি সুখী হব।

পরের দিন সকালে কোষ্ঠীর যোটক বিচার হল। বিচারে প্রায় রাজযোটকই হ'ল, শুধু একটি খুঁত দেখা গেল। গ্রহাচার্য্য বললেন—এই পাত্রের জন্মলগ্নে গ্রহসংস্থানের প্রভাবে কন্যাটির কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে, রোগে ভুগবেন।

আমার মা বললেন—ভুগুক। এত বড় ভাগ্য পেতে যদি সে রুগ্নই হয় তবে সেটুকু সে সহ্য করবে। আর আমার মেয়ে—ওকে আমার রোগ ভোগ বোধ হয় এমনিই করতে হবে, আমি অম্লশূলের রোগী।

কথা পাকা হবার অল্প একটু বাকী রইল। অবিনাশবাবুকে জবাব দিতে হবে। নারায়ণের বিবাহ দিতে গিন্নী বদ্ধপরিকর হয়েছেন শুনে তিনি নাকি কয়েকদিন পরেই এখানে আসছেন—তাঁর কন্যার সঙ্গে যে সম্বন্ধের কথা হয়ে আছে বহুদিন থেকে, সেই কথা পাকা করবেন। নারায়ণকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবেন।

অপরাহ্ণে আবার তাঁরা এলেন মাতা পুত্রে। আরও কয়েকটা কথা আছে।

—কি বলুন?

—নারায়ণের বিয়ে দেব, তার আগে বা তার সঙ্গে তার বোনের বিয়েও—

—বেশ তো। তার বিয়ের কথা তো স্থির হয়েই আছে।

—না, ওটিকে আপনাদের নিতে হবে। তারাশঙ্করের সঙ্গে ওর বিয়ে দিন।

মা পিসীমা বিস্মিত হলেন।—সে কি? আমরা তো তোমাদের পাল্টী ঘর নই। ঘর-হিসেবে নারাণেরা বিষ্টু ঠাকুরের সন্তান, শ্রেষ্ঠ কুলীন, ওদের পাল্টী হল কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তানেরা। আমরা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান,

কেশবের সঙ্গে একই বংশ হ'লেও মান্যে, প্রতিষ্ঠায়, গণনা-গৌরবে ছোট ঘর। আমার কন্যা দিচ্ছি উঁচু ঘরে, তাতে বাধে না, তোমরা কন্যা নিচ্ছ তোমাদেরও বাধে না। কিন্তু কন্যা তোমরা দেবে কি ক'রে?

—সে আমরা দেব। আমরা অনেক ভেবে ঠিক করেছি।

গিন্নী বললেন—বিয়ে দিয়ে কন্যা জামাইকে ঘরে অংশীদার ক'রে আমি রাখব না। তাতে ভাই বোনে বিবাদ হবে। তা ছাড়া তোমরা আমাদের কাছে বাঁধা রইলে, আমরা তোমাদের কাছে বাঁধা রইলাম। মেয়েটি একটু কটকটে। আমার চোখের সামনে থাকবে। আর বাপু, আমার ভারী ইচ্ছে হয়েছে।

বিচিত্র ইচ্ছাটির মূলের স্বরূপ কি এবং কোথায় সে কথা গিন্নী বোধ করি নিজেও জানতেন না, ষষ্ঠী বাবুও না। নইলে যে ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়েছিল তার সঙ্গে আমার তফাৎ কি ছিল? তুলনা করলে ছেলেটি রূপে রূপবান ছিল। আমার রূপ ছিল না।

গুণে অবশ্য প্রভেদ কিছু ছিল—আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিচ্ছি সে বছর; সে তখন ক্লাস-তিনেক নিচে পড়ে। বয়স দুজনেরই এক। কিন্তু এটুকু আর কতটুকু? তাছাড়া এই দিকের বিচারটা তাঁদের অর্থাৎ গিন্নীর এবং বড়বাবুর করারই কথা নয়। তাঁরা এটাকে একটা বিশেষ বাঞ্ছনীয় গুণ বলে মনেই করেন না।

যেখানটায় তাঁদের বিচারের তফাৎ ছিল—সেটা হ'ল—পাত্রের বৈষয়িক মূল্যের তফাৎ। সে ছেলেটি কুলীন গৃহজামাতার পুত্র। কিন্তু গৃহস্বামী ছেলেটিকে তাঁর অর্দ্ধেক সম্পত্তি উইল ক'রে দেবেন এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। সেই অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমার প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তির তুলনায় মূল্যে কিছু কম।

যাই হোক, কোন্ বিচার তাঁরা তখন করেছিলেন তাঁরাই জানেন, তবে ইচ্ছাটাই সমস্ত বিচারকে প্রভাবিত করেছিল নিঃসন্দেহে। এখানে এক কথায় রেহাই পাওয়া যায় প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ব'লে। সে কালে লোকে তাই বলেছিল। লোকে অবশ্য আরও একটা কথা বলেছিল; কন্যাপক্ষের অভিভাবকদের উপর বৈষয়িক বুদ্ধির দোষারোপ করেছিল। তখন আইন

হয়েছে যে অবিবাহিতা কন্যা মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে, সে ক্ষেত্রে মায়ের সম্পত্তিতে ছেলেদের অধিকার থাকবে না। এখানে মায়ের উইল ছিল, উইলে বিধান ছিল, জামাই যদি সম্পন্ন অবস্থার না-হন তবে মেয়ে ভাইদের সঙ্গে সম অংশে অংশীদার হবে; আর সম্পন্ন ঘরে বিবাহ হ'লে নগদ টাকা পাবে পাঁচ হাজার। তখনকার দিনে পাঁচ হাজার টাকাটা একটা মোটা অঙ্ক। সাধারণ সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের বিবাহ হাজার থেকে দু হাজার টাকার মধ্যেই হয়ে যেত। আড়াই হাজার হলেই সে বিয়েতে বড়লোকী ছোঁয়াচ লাগত। তিন হাজারে কথাই নেই, চার হাজারের উপরে উঠলে সে হ'ত রাজকীয় বিবাহ। যাই হোক, লোকে বললে—সুকৌশলে কন্যাটিকে একভাগ থেকে বঞ্চিত করলেন অভিভাবকেরা। আর বললেন—অন্যত্র বিয়ে হ'লে আরও ভয় আছে; পাত্রপক্ষ হয়তো ভবিষ্যতে এই উইল নাকচ করবার চেষ্টা করতে পারে। এখন এমন ভাবে বিনিময় করে বিয়ে হ'ল যে, সে আশঙ্কা আর রইল না। নারায়ণের বড় মামার বৈষয়িক বুদ্ধির কুটিলতার অপবাদ আছে। ভদ্রলোক কুটিল না হোন বৈষয়িক বুদ্ধিতে জটিল তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা শপথ করেই বলব যে এ ক্ষেত্রে তাঁর বা তাঁর মায়ের এমন কোন অভিপ্রায় ছিল না। আপন সংসারের পুত্র-কন্যাদের উপর এমন অগাধ অপরিমেয় স্নেহ সচরাচর দেখা যায় না। আমি যা বুঝেছি তাতে এই বিবাহের ব্যাপার আকস্মিক, এই ইচ্ছেটাই বড়। হঠাৎ মনে হয়েছে এই সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন সমাধা করলে কি হয়? তারপরই এসে যোগ দিয়েছে—উৎসব, আড়ম্বর, আনন্দের কল্পনা। ধনী মানুষের প্রকৃতিই ওই, ধনসম্পদের ধর্ম্মই ওই। উৎসব আরম্ভ হ'লে তাকে যতখানি বড় ক'রে প্রসারিত করা যায় তাই করলেন তাঁরা। শুধু ধনীর কথাই বা কেন, মানুষেরই স্বভাব হ'ল আনন্দের সন্ধান করা।

থাক কারণ অনুসন্ধান। মোট কথা ওঁরা বললেন—ওঁরা আমাদের মেয়ে নেবেন, বিনিময়ে তাঁদের মেয়েটিকেও আমাদের নিতে হবে। না হ'লে কথা এইখানেই থাক।

তখন পিসীমার মনেও ছোঁয়াচ লেগেছে। ষোল বছরের ছেলের সঙ্গে দশ বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে পরিণত বয়সে পুতুল খেলার নেশা ধরেছে মনে। বললেন কুষ্ঠী দেখানো হোক।

মা শুধু আপত্তি তুললেন। বললেন—ছেলেও ছোট, মেয়েও ছোট, বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে থাক; বিয়ে দু'বছর পরে হবে।

সে কথা গিন্নী এবং পিসীমা নাকচ করে দিলেন।

গিন্নী বললেন—আমার নারায়ণেরই বা বয়স কি? সে তো তারাশঙ্কর থেকে তিন মাসের ছোট গো।

পিসীমা বললেন—ইংরিজী ফেশান। আমার দাদার বিয়ে হয়েছিল ানের বছর বয়সে।

মাকে চুপ করতে হ'ল। কারণ, না হ'লে ওই ঘরে কন্যার বিবাহ হয় না।

কোষ্ঠীর যোটক বিচারে বসলেন গ্রহাচার্য্য।

বিচারের দেখা গেল—যোটক হয় না। মেলে না কোন রকমেই।

আবার এলেন নতুন গ্রহাচার্য্য। তিনি সব দেখে শুনে বললেন—মিল য়েছে বই কি। মিল যদি না-হবে তবে কন্যাপক্ষ পাত্রপক্ষ উভয়পক্ষের নের এমন মিল হয় কেমন ক'রে? তা যখন হয়েছে তখন এ বিবাহে কান বাধা নেই। তবে—

—কি তবে?

—এই মানে, পাত্র এবং কন্যাতে ঝগড়া-ঝাঁটী হবে। ইনি বলবেন আমি বড়, আমার হুকুম মেনে চলতে হবে, উনি বলবেন—আমি বড়, আমার হুকুমে চলতে হবে; এই আর কি। ইনি যদি বলেন, দাও তো তেলের বাটিটা সরিয়ে, উনি বলবেন, নাও না [illegible] টেনে, আমি পারছিনা। ইনি অম্বল খেতে চাইলে, উনি ঝোল খাইতে চাইবেন। এই আর কি!

হাসির কলরোল উঠে গেল। এবং পাকা হয়ে গেল কথা।

গ্রামে কথাটা প্রচার হতেই অপবাদ রটে গেল আমার এবং নারাণের নামে। রটল—নানুরে চণ্ডীদাসের ভিটা দেখতে গিয়ে আমরা নিজেরাই এই বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে এসেছি। সেখানে শপথ ক'রে এসেছি।

ঘটনাটি এইরূপ—

মাস কয়েক আগেই আমাদের বাইসিক্ল হয়েছে। নারাণ এবং আমি একসঙ্গে বাইসিক্ল চাপা শিখেছি এবং একসঙ্গে এক কোম্পানীর একরকম বাইসিক্ল কিনেছি। ছেলেমানুষের পা যত শক্ত হয় ততই সে বেশী হাঁটতে চায়। আমাদের বাইসিক্ল হ'তেই ভ্রমণ-বাসনা উদগ্র হয়ে উঠেছিল। পূজোর ছুটিতে, চন্দ্রনারাণ সেরে ওঠার পরই নারাণ এবং আমি দুজনে পরামর্শ ক'রে গেলাম নানুর চণ্ডীদাস। আমাদের গ্রাম থেকে এগারো বারো মাইল পথ। নানুর দেখে এলাম, কিন্তু হলপ ক'রে বলতে পারি পরস্পরের ভগ্নীকে বিবাহ ক'রে বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখবার শপথ নেওয়া দূরে থাক, এমন কল্পনাও আমাদের মনে ওঠে নি।

বৃদ্ধ গ্রহাচার্য্য যিনি তিনিও হেসে বললেন—ও কথা আমি মুখ দেখেই জানতে পেরেছিলাম।

বৃদ্ধ বহুদর্শী ছিলেন—ত্রিকালদর্শী না-থাকুন। তিনি যে উভয়পক্ষের আগ্রহ লক্ষ্য ক'রে তারই উপর নির্ভর ক'রে এই বিবাহে যোটক বিচারে খুঁতগুলি উপেক্ষা করেছিলেন তার কারণ তিনি পরবর্ত্তীকালে বলেছিলেন। বলেছিলেন—এমন ধরণের বিবাহ, যে বিবাহে কন্যাদুটি একেবারে নিরাপদ—মানে এ বাড়ীতে বউ বকুনী খেলে এ বাড়ীর বেটী ও বাড়ীতে গঞ্জনা খাবে;—ও বাড়ীর বউয়ের গয়না হ'লে এ বাড়ীর সাধ্য যদি নাও থাকে তবে ও বাড়ীর বেটী হিসাবে ও বাড়ী থেকেই এ বাড়ীর বউয়ের জন্যে গয়না আসবে। এ বিবাহে যখন দু পক্ষের এমন আগ্রহ তখন কি সামান্য ওই সব খুঁতের জন্য অমত করতে আছে? ওই রাজযোটক। ঝগড়া-ঝাঁটী—ও আর ক'দিন করবে বাবা? বাবা, জল আর পাথর, জলে পাথর কেটে নিজের পথ ক'রে নেয়;—পাথর দুই বেড় দিয়ে তাকে ধ'রে থাকে। তেমনি করেই জলে পাথরে মিলে মানিয়ে নেবে; দু'বছর 'পাঁচ বছর' বড় জোর দশ বছর! কত ঝগড়া করবে? শেষকালে ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত দেবে।

বিয়ের দিন স্থির হল দশই-বারোই মাঘ। দশই মাঘ নারাণের বিয়ে, বারোই মাঘ আমার।

নয়

ছেলেবেলায় আমার এক সঙ্গী ছিল—আমার সম্পর্কীয়া এক ভাইঝি। চারু তার নাম। আমার চেয়ে বয়সে সে বড়। তার কথা 'আমার কালের কথা'য় বলেছি। চারুর এক সঙ্গিনী ছিল তার নাম দুর্গা। 'দুগো' বলে ডাকত তাকে। যে দিকের সম্পর্কে চারু আমার ভাইঝি সেই দিকের সম্পর্কে দুর্গা ছিল আমার নাতিনী। দুর্গার মা ছিলেন আমার ভাইঝি। ঠিক চারুর মতই ভাইঝি। চারু এবং দুর্গা মাসী-বোনঝি কিন্তু সমবয়সী, পরস্পরের খেলার সঙ্গিনী। সে দিক দিয়ে ওদের সম্পর্ক ছিল—বেয়ান। দুর্গার ছেলে-পুতুলের সঙ্গে চারুর মেয়ে-পুতুলের বিয়ে হ'ত; চারুর ছেলে-পুতুলের বিয়ে হত দুর্গার মেয়ে-পুতুলের সঙ্গে। বিয়েতে খুব ধুমধাম হ'ত। গড়ের বাদ্যি থেকে দিয়তাং ভোজ্যতাং ভোজ। অবশ্য টিনের গড়ের বাদ্যি আর ধুলো কাদার লুচিমণ্ডা। তা হ'লেও হ'ত! আমি টিন বাজাতাম এবং খেতাম। তারপর খেলা শেষ হতেই লাগত দুই বেয়ানে ঝগড়া। ঝগড়ার কারণ অবশ্য প্রতিদিনই নতুন কিছু থাকত, কিন্তু পরিণতি হ'ত এক। বিয়ে ভেঙে দিয়ে যে-যার পুতুল নিয়ে বাড়ী চলে যেত। নিজের পুতুল পরের বাড়ী—হোক সে বেয়ান—প্রাণ ধরে কিছুতেই পাঠাতো না তারা। তার চেয়ে হোক বিয়ে বাতিল।

আমার বিয়ের পরই যে বিবাদটি বাধলো পাত্রপক্ষে আমার পিসীমায়ের সঙ্গে কন্যাপক্ষে উমার দিদিমার—সে বিবাদটিও আসলে ওই বিবাদ। ষোল বছরের বর, দশ বছরের কনে। পাত্রপক্ষ যখন বলেন—বউ আমাদের ঘরে থাকবে, তখন পাত্রীপক্ষ বলেন—সে হবে না বাছা, এটা কি একটা কথা হ'ল? ওই দশ বছরের মেয়ে, ও কি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে, না, আমি ওকে ছেড়ে থাকতে পারি! সে হবে না। আবার পাত্রী-পক্ষ যখন কোন উপলক্ষ্য দেখে জামাইকে প্রথামত নিজেদের বাড়ী নিয়ে যেতে চান দু-চার দিনের জন্য, তখন পাত্রপক্ষ বলেন—বলো কি বাছা? এ আবার

কি কথা? ষোল বছরের ছেলে; শ্বশুরবাড়ী যাবে কি? দিনে নেমন্তন্ন করে, যাবে-খাবে চলে আসবে। ও সব হবে টবে না।

ওদিকে মেয়েটি ইস্কুলে পড়ে; গ্রামের পথ দিয়ে ইস্কুলে যায়, পথে কত শ্বশুর ভাসুরের সঙ্গে দেখা হয়। বিয়ের পর বউমানুষ ইস্কুলে যাবে, এ এক সমস্যা। এ সমস্যাটা হঠাৎ একদিন একটি ঘটনায় গুরুতর হয়ে উঠল। গ্রামে এলেন ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি ছেলেদের ইস্কুল, মেয়েদের ইস্কুল পরিদর্শন করলেন। তাঁর সঙ্গে গ্রামের ভদ্রলোকেরা পার্ষদের মত সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার এক সম্পর্কিত দাদা। উমা ইস্কুলে মেয়েদের সারিতে দাঁড়িয়ে টেনে দিলে হাতখানেক ঘোমটা। ঘটনাটা গ্রামে একটি সরস হাস্যরসাত্মক গল্প হিসেবে মুখে-মুখে ফিরতে লাগল। এতে ষোল বছরের বরটি পেলে দারুণ লজ্জা। এবং নিজেকে অপমানিতও বোধ করলে। সে দিলে মাথা নাড়া। বউ মানুষ ইস্কুলে পড়া আর হতেই পারে না। না, কখনই না।

আবহাওয়াটা ক্রমশ কাল বৈশাখীর ঝড় ওঠার আগের গুমোট আব্-হাওয়ার মত হয়ে উঠল। ঝড়ও এল একদিন। মাঘ মাসে বিয়ে হল, মাঝে ফাল্গুন-চৈত্র গেল বৈশাখী দুপুরের মত; তারপরে বৈশাখের অপরাহ্নে এল সেই ঝড়।

হঠাৎ গ্রামে আরম্ভ হ'ল কলেরা।

রাধাদাদা হৈ চৈ তুললেন—মহামারী। মহামারী। পালাও পালাও। আমার মা এই সুযোগটি ধ'রে পিসীমাকে বললেন—আমি তা হ'লে ছেলে বউ, মেয়ে জামাই নিয়ে একবার পাটনা ঘুরে আসি। মা-বাবাকে দেখিয়ে আনি। এ কামনাটুকু তাঁর অন্তরের এবং বাঙলার মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক।

আমার মাতামহ এর প্রায় বৎসর দুয়েক আগে থেকেই শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। মাথার শিরা ছিঁড়ে শরীরের একটা দিক পঙ্গু হয়ে গেছে। দিদিমাকে অহরহ তাঁর শিয়রে প্রয়োজন। এবং আমার মামাদের বাড়ীতে তখন নানান বিশৃঙ্খলা এবং আর্থিক অবস্থাও অস্বচ্ছল। এই

কারণেই আমাদের বিয়েতে তাঁদের কেউই আসতে পারেন নি। এক্ষেত্রে ছেলে বউ মেয়ে জামাই নিয়ে বাপের বাড়ী যাওয়ার সাধটা মেয়েদের একটা বড় সাধ। ভালো জামাই হয়েছে, রূপবান ছেলে, সম্পদশালী ঘরের সন্তান, লেখাপড়াতে ভাল, বউটি সুন্দরী নয়, কিন্তু তা বলে অসুন্দরী বা কালো কেউ বলতে পারবে না, ধনীর ঘরের মেয়ে; বউ এবং মেয়ের গায়ে এক গা-গহনা। সুতরাং দেখাবার অভিপ্রায়ের মধ্যে অহঙ্কার না থাক, গৌরব অনুভবের হেতু আছে। এই আশা নিয়েই ওঁদের বাড়ীতে আমার মা নিজেই গেলেন; সবিনয়েই জানিয়ে এলেন অনুরোধ। ওঁরা বললেন— ভেবে দেখি।

ভেবে চিন্তে উত্তর পাঠালেন—মেয়ে আমাদের ছোট, অত দূর পাঠাতে পারব না বাপু।

মা বললেন—বেশ, বউমা এখন আপনাদের কাছে থাকুন। নারাণ এবং বুড়ীকে পাঠিয়ে দিন। এর পর বউমা অবশ্যই পাঁচবার যাবেন, যাবার সুযোগ হবে। কিন্তু নারাণ-বুড়ীর যাওয়া হয়তো ঘটবে না। ওদের নিয়ে যেতে চাই আমি।

আবার ভেবে চিন্তে উত্তর পাঠালেন—উঁহু। সে হবে না।

এবার পিসীমা গর্জ্জে উঠলেন—তা-হলে আমাদের ছেলে বউ যাবে।

—না! তোমাদের ছেলে তোমরা নিয়ে যাও। আমাদের মেয়ে পাঠাবো না।

—তা হ'লে আমাদের মেয়েও পাঠিয়ে দাও। আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে যাব।

—উঁহু। তোমাদের ছেলের উপর জোর নেই। কিন্তু তোমাদের মেয়ে আমাদের বউ, তাকে পাঠাবো না।

ভালো রে ভালো! এতো দেখি গায়ের জোরের কাণ্ডের মত কাণ্ড! আমাদের বউ পাঠাবে না, বলবে আমাদের মেয়ে; আবার আমাদের মেয়েও পাঠাবে না, বলবে আমাদের বউ—তা হলে চলবে কেন? হয় আমাদের বউ দাও নয় তো আমাদের মেয়ে দাও।

—উঁহু, মেয়েও পাবে না, বউও পাবে না। আমাদের মেয়ে ছোট, বড়

হোক তবে যাবে। তোমাদের মেয়ে আমাদের বউ, সেয়ানা, সে বাপের বাড়ী যাবে কি? শ্বশুরবাড়ীতে থাকবে।

—একবার তার দাদমশায় দিদিমাকে দেখতে যেতেও দেবে না?

—না। বড় মেয়ে তাঁকে আর দাদামশায় দিদিমার আদর নিতে যেতে হয় না।

—হয় না?

—না। আমাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমরা সপরিবারে সিউড়ী যাচ্ছি। সে আমাদের সঙ্গে যাবে।

বউ তার আগেই পালিয়েছে আমাদের খিড়কির পুকুরের কলা বাগানের আড়াল দিয়ে, ছাঁই গাদা আঁস্তাকুড় মাড়িয়ে, পুকুরের জল-নিকাশী নালা-পথ ধ'রে।

—ওর বাক্স-টাক্সগুলো দাও তবে।

এইবার বরটি উঠল ক্ষেপে। কি? এত বড় অপমান! আমাদের একটা কথাও থাকবে না?

যিনি বউয়ের বাক্স নিতে এসেছিলেন তিনি যাদবলালবাবুর স্ত্রী গিন্নীর আশ্রিতা, মানুষটি বড় ভাল; বাল-বিধবা, গিন্নীর সেবা যত্ন করতেন; উমাকেও খুব ভালোবাসতেন। তিনি বললেন—কি করব? আমাকে যেমন বলেছেন—

—বেশ। তবে শুধু বউয়ের বাক্স-পেঁটরা গয়না-গাঁটীই নয়, সব—সব—বিয়েতে আমাকেও যা কিছু দিয়েছ—তাও নিয়ে যাও! বউয়ের উপরেই যখন কোন জোর নেই, অধিকার নেই, তখন চেন ঘড়ি আংটি শাল এ সব নিয়ে কি হবে? যাও, সব নিয়ে যাও।

হিড় হিড় ক'রে টেনে বাক্স পেঁটরা, গয়নার বাক্স, বরকে দেওয়া বাক্স ঘড়ি চেন শাল আংটি সব বের ক'রে দিলাম আমি।

—যাও, নিয়ে যাও। যাও।

ধূমায়মান অবস্থাটা হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল দাউ দাউ ক'রে। ব্যাপারটা যত আকস্মিক তত রূঢ়। এ যেন বিয়ে ফেরত হওয়ার ব্যাপার।

সকলে হতভম্ব হয়ে গেলেন। আমার পিসীমা পর্য্যন্ত। সকলে স্তব্ধ। হঠাৎ বাড়ীর বাইরে থেকে বাড়ী ঢুকবার রান্নাঘরের গলি পথ বেয়ে গিন্নীর কঠিন কণ্ঠস্বর ভেসে এল—যাও গৌরদাস নিয়ে এস, সব নিয়ে এস। যাও।

গিন্নী বাইরের দরজার মুখে সন্ধ্যার অন্ধকারে এসে কখন দাঁড়িয়েছিলেন, শুনছিলেন সব কথা।

গৌরদাস নামক ভৃত্যটি এসে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে লাগল।

আমি দেখিয়ে দিলাম—এই যে!

—নিয়ে এস, গৌরদাস।

আমিই তুলে দিলাম সব গৌরদাসের মাথার উপর। গৌরদাস একে একে বয়ে নিয়ে গেল। দুই বাড়ী প্রায় পাশাপাশি। দুই বাড়ীর মধ্যে আছে আমাদেরই ঠাকুরবাড়ী এবং এই ঠাকুরবাড়ীর ভিতর দিয়েই ওঁদের বাড়ীর সদর রাস্তায় যাবার পথ। এই পথে গিন্নি এরপর থেকে নিত্যই যতবার যাওয়া আসা করেছেন ততবারই একবার ক'রে থমকে দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করেছেন কি কথা হচ্ছে আমাদের বাড়ীতে। এবং এই ঝগড়াঝাঁটি নিত্যই বেড়েছে। এর ফলে আমাদের বাড়ীতে হাসির শব্দ শুনলে সন্দেহ করেছেন হয়তো সর্ব্ববাদীসম্মত কোন জবর ফন্দির হদিস এরা নিশ্চয় পেয়েছে যাতে তাঁরা জব্দ হবেন। কথান্তর শুনতে পেলে সন্দেহ করেছেন এই নিয়েই মতভেদ হওয়ার ফলেই এই কথান্তর সুরু হয়েছে।

উপরের ঘটনা 'ধাত্রী দেবতা'য় প্রায় হুবহু দেওয়া আছে। এমন কি গৌরদাস এবং শ্রীপুরের বউ নাম দুটি পর্য্যন্ত।

আজকে পরিণত বয়সে পিছনের দিকে চেয়ে সমস্ত ঘটনাটাকেই হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে। এবং এর স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে দুর্গা এবং চারুর পুতুল খেলার শেষের ঝগড়ার সঙ্গে কোন প্রভেদ চোখে পড়ে না। মনে হয় মানুষের শৈশব থেকে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মনের খেলা একই খেলা; ওর আর দুই নেই। তফাতের মধ্যে যত বয়স হয় তত যুক্তিতর্ক-রূপ ছদ্মবেশের বহর বাড়ে। আসলে ওটা ওই দুর্গা-চারুর ঝগড়া।

আমরাই সে দিন হারলাম। ওরা জোর ক'রে মেয়ে বউ দুই-ই নিয়ে চলে গেল। আমরাও তিন ভাই এবং মা চলে গেলাম পাটনা। পাটনায় আমার মামার বাড়ীর সংসার একটি আশ্চর্য্য সাধনার সংসার এবং আশ্চর্য্য উদার সংসার। সেথানে আমার বড় মামার কঠোর শাসনে বাড়ীর ছেলেদের চারিদিকে একেবারে কঠোর কৃচ্ছ-সাধনের গণ্ডী। ছেলেরা পড়ছেই, পড়ছেই, পড়ছেই। আর উদারতার দিকে এই বাড়ীটিতে অভাব অনটন স্বত্বেও যে আত্মীয়, যে স্বজন এসেছেন কারুই স্থানের অভাব হয় নি। অভাবের মধ্যে যা জুটেছে তাই সকলে মিলে সমান ভাগে ভাগ ক'রে খেয়েছেন।

এখানে এসে সঙ্গী পেলাম আমার ন-মামাকে। আমার চেয়ে বছর দুয়েকের কি তিনেকের বড়; সোনার মত গায়ের রঙ, তেমনি প্রিয়দর্শন। আই-এ পরীক্ষা দিয়েছেন। ছুটির অবসরে দুজনের অন্তরঙ্গতা গাঢ় হয়ে উঠল। ইতিহাসে যেমন তাঁর অনুরাগ তেমনি ছিল তাঁর পড়াশুনা, জানাশুনা। পাটনার সিপাহী বিদ্রোহের আমলের ঐতিহাসিক স্থানগুলি থেকে সুরু ক'রে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আবিষ্কৃত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে ভূগর্ভস্থ রাজধানীর সমস্ত কিছু তিনি দেখেছিলেন, জেনেছিলেন। সে সবগুলি আমাকে তিনি দেখাতে সুরু করলেন। এবং মুখে বলে যেতেন ইতিহাস। বড় বড় নজীর ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। সেই সব তিনি বলতেন আমাকে, শেখাতেন, বাড়ীতে পড়তে দিতেন।

তখন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের একশো স্তম্ভ দিয়ে গড়া সুবৃহৎ সভাকক্ষ মাটি খুঁড়ে বের করা হচ্ছে। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। শত শত শ্রমিকে মাটি খুঁড়ে বের ক'রে চলেছে অতীত কালের বাড়ী ঘর সভাগৃহ। মনে কল্পনার রথ ছুটে চলত। কত কাহিনী, কত রোমাঞ্চকর গল্পকথা মনে উঠে মিলিয়ে যেত।

সভাকক্ষের একশো স্তম্ভের যতগুলি অক্ষত ছিল সেগুলির কতক গিয়েছিল বোম্বাইয়ের যাদুঘরে, কতক ছিল পাটনার যাদুঘরে। ভাঙা স্তম্ভ-

গুলি পড়েছিল ওই খোঁড়া জায়গার গর্ত্তের মধ্যে। কি বিপুল তার পরিধি। দু'জন লোকে হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে পারত না। আরও বিস্ময় বোধ করেছিলাম সেদিন আর এক কারণে। এই স্তম্ভগুলি নাকি স্থাপিত ছিল মজবুত কাঠের মঞ্চের উপর। সেই কাঠগুলির কিছু কিছু পাওয়া গিয়েছিল। কাঠ নয়, বিশাল আয়তন শাল গাছের গুঁড়ি। শাল্মলী বনস্পতি না বললে মন যেন ভরে ওঠে না। অবাক হয়ে দেখেছিলাম প্রথম দিন। দেখতে দেখতে কি মনে হয়েছিল, হাত দিয়েছিলাম, প্রায় দু'হাজার বছর আগেকার গাছের গুঁড়ি। কত শত বৎসর মাটির নিচে ছিল চাপা। সে পচেছে। হাতখানা ঢুকে গেল যেন সদ্য জলশূন্য কোন দীঘির পঙ্কস্তরের মধ্যে। সে স্পর্শে দেহ শিউরে উঠেছিল। সভয়ে বের ক'রে নিয়েছিলাম হাত। আমার হাতের দৈর্ঘ্যে তাকে পরিমাণ করাও সম্ভবপর ছিল না। তারপর একখানা বাখারী নিয়ে সেটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। এবার পেলাম শক্ত অংশের সন্ধান। বাখারী দিয়েই প্রায় শিশুর মত অথবা উন্মত্তের মত ছাড়াতে লাগলাম পচা অংশটাকে। পচা অংশ ছাড়িয়ে ফেলতে গিয়ে জামা কাপড় নষ্ট হয়ে গেল। মুখে লাগল তার দাগ। জিভে অনুভব করলাম তার স্বাদ। শেষে বের করলাম সেই কঠিন অংশটুকুকে। দু'হাজার দেড় হাজার বৎসরেও এই সার অংশটুকুকে কাল জীর্ণ করতে পারেনি। রক্তচন্দনের মত বর্ণ সে অংশটুকুর। কোথাও পরিধিতে দু'ফুট, কোথাও তিন চার ইঞ্চি—কোথাও বা সবটাই পচে গিয়ে পরবর্তী অংশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে এই অংশটাকে। ওজনও তেমনি।

ন-মামা বললেন—হিমালয়ের শাল। নেপালের নিচে তরাই থেকে আনা হয়েছিল এই সব কাঠ।

হিমালয়ের পাদদেশে দু'হাজার বছর আগে বিশাল পল্লব মেলে দাঁড়িয়ে থাকত—এই শাল্মলী বনস্পতি। সূর্য্যকে বন্দনা করত।

সেই টুক্‌রোটুকু হাতে ক'রে সেদিন বাড়ী এসেছিলাম। পথে ন-মামা এবং আমি কঙ্করবাগের নির্জ্জনতায় স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। মন সেদিন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। কঙ্করবাগের আমগাছের তলায় তলায় তখন

অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। সন্ধ্যা নেমেছে দিগন্তে, কঙ্করবাগেও রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

কঙ্করবাগ নবাবী আমলের প্রমোদ কানন। পরিত্যক্ত, নির্জ্জন।

আমার সেজমামা প্রথম কলেজ জীবনেই বিপ্লবী দলভুক্ত হয়েছিলেন, উত্তর ভারতের বিখ্যাত বৈপ্লবিক নেতা রাসবিহারী বসুর দলে মিশেছিলেন। স্বর্গীয় শচীন্দ্র সান্যালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। দু-দুবার তিনি ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন; একেবারে সকল সংশ্রব ছিন্ন ক'রে এই দলের কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার অভিপ্রায় ছিল তাঁর। কিন্তু দু-দুবারই তাঁর ছোট ভাই, আমার ন-মামা তাঁর উদ্দেশ্য আবিষ্কার ক'রে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুসরণ ক'রে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁকে। কাশীতে সান্যাল মশায়ের বাড়ী থেকেই ধরে এনেছিলেন। এর পরই তিনি, প্লেগে মারা যান! তাঁর মৃত্যুর পর বিপ্লবী দলই মামাদের জানিয়েছিলেন যে, একটি রিভলবার তাঁদের বাড়ীতে থাকার কথা। সেটি নাকি ছিল আমার মৃত মামার কাছে। তাঁরা সেটি ফেরত পাবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বাড়ীতে কিন্তু পাওয়া যায় নি সেটি। পরে অনুসন্ধান ক'রে তাঁর খাতাপত্রের মধ্য থেকে পাওয়া গিয়েছিল এর খোঁজ; 'কঙ্করবাগে রইল' এমনই ধারার কথা এই ন-মামাই বোধ হয় আবিষ্কার করেছিলেন। সে কথা তাঁদের বলেও দিয়েছিলেন। বিস্তীর্ণ ভেঙে-পড়া-কঙ্করবাগের ভিতর থেকে তাঁরা সেটি উদ্ধার করতে পারেন নি। অজ্ঞাত গুপ্ত স্থানেই সেটি থেকে গিয়েছে।

সে দিন সন্ধ্যায় কঙ্করবাগে ব'সে ন-মামা সেই কথাটি আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এই সংবাদটি আমার মনে বিচিত্র এক রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছিল। ন-মামা সেদিন পাটনার নবাবী আমলের সমৃদ্ধ কঙ্করবাগের গল্পও বলেছিলেন। কাহিনীগুলি ভুলে গিয়েছি আজ, কিন্তু সু-সমৃদ্ধ কঙ্কর-বাগের আলোকোজ্জ্বল সারেঙ্গী-নূপুর-ঝঙ্কার-মুখর রাত্রির স্বপ্ন-কল্পনা মন থেকে আজও মুছে যায় নি। সেই ষোল-সতের বৎসর বয়সে ভাঙা কঙ্করবাগেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল নবাবী আমলের ঐশ্বর্য্য বিলাসের সঙ্গে। এই

ষোল বছর পর্য্যন্ত আমি লাভপুরের বাইরে বিশেষ কোথাও যাই নি। কয়েকবার সিউড়ি ছাড়া দশ বছর বয়সে গিয়েছিলাম বিহার শরিফে। আমার মাতামহ বিহার শরিফে চাকরী করতেন। বিহার শরিফেও বড় আমীর মুসলমানের বাড়ী বাগান আছে—সে আমি দেখি নি। বিহার শরিফের তুটি জায়গার স্মৃতি মনে আছে। বিহার শরিফের উত্তর দিকে খুব বড় কয়েকটি মাটির স্তূপ আছে। কেউ বলেন—ওই স্তূপের তলায় আছে বৌদ্ধ বিহার; কেউ বলেন ওর তলায় পোঁতা আছে কামান বন্দুক। পাদপ গুল্মহীন সেই মাটির স্তূপের দিকে বিস্ময় এবং কৌতূহল ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম অপরাহ্ণের পর অপরাহ্ণ। নিত্য অপরাহ্ণে সেদিকে যেতাম; ওই দিকেই ছিল বিহার স্কুলের খেলার মাঠ। আর মনে আছে বেহারের পশ্চিম দিকে কয়েক মাইল দূরে একটি ছোট পাহাড়, সেই পাহাড়ের উপর একটি মসজিদ। মসজিদের গম্বুজের চারিদিকে ছোট ছোট খুপরীতে অসংখ্য টিয়া পাখীর বাসা। আর পাহাড়টির একটি দিক আশ্চর্য্য রকমের খাড়া সোজা, মনে হয় কেউ যেন পাহাড়টির ওদিকের [illegible] অস্ত্র দিয়ে কেটে তুলে নিয়ে গিয়েছে। এক খাঁ খাঁ করা প্রান্তরের মধ্যে সেই পাহাড়-টির উপর সেই মসজিদটি যেন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যলোকে একটি সরাইখানার স্মৃতির মত আমার মনের মধ্যে বাসা গেড়ে রয়েছে। বেহারের আর একটি কথা মনে পড়ছে। বেহারে ছিলাম আমরা তিন সঙ্গী। তিন জনের মধ্যে আমি আছি আর তুজন নেই। একজন আমার মাসতুত ভাই মণি, সে আমার থেকে ছ-মাসের ছোট, আর একজন আমার পঞ্চম মাতুল বৈদেহী-নাথ, আমার থেকে বছর খানেক কি দেড়েকের ছোট। আমরা তিন জনে তর্ক করতাম;—বাঁড়ুজ্জেরা বড় না মুখুজ্জেরা বড় না চাটুজ্জেরা বড়? চাটুজ্জে মণির খুঁটী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, মুখুজ্জে বৈদেহীর মুখাগ্রে ছিল আশুতোষের নাম, আমার খুঁটি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র। আমার মেজমামা হাসতেন তাঁর কাছেই তখন জেনেছিলাম ডব্লু. সি. ব্যানার্জ্জীর নাম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শাণ্ডিল্য গোত্রীয়, বাঁড়ুজ্জেদের দলে পড়েন। কিন্তু এত প্রবল বল সত্ত্বেও আমার উচ্চতা খর্ব্ব হয়ে যেত নন্দলাল বাড়ুজ্জের নামে। নন্দলাল

বাড়ুজ্জে পুলিশ ইন্‌সপেক্টর যিনি মোকামা স্টেশনে প্রফুল্ল চাকীকে ধরতে গিয়েছিলেন।

আমরা তিনজনে সেই সময়েই একটি বিপ্লবীর দল গঠন করেছিলাম। এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—কিংসফোর্ডকে আমরা মারব। কিংসফোর্ডের অপরাধ আমরা জানতাম না, তবে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী যখন তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর অপরাধ ছিল অতি গুরুতর। একদিন এই নিয়ে গোপন পরামর্শ শুনে ফেলেছিলেন আমার মাতামহ নিজে। এবং খুব একচোট হেসে শেষে শাসন করেছিলেন। বলেছিলেন, কে কোথায় শুনবে। আমার সরকারী চাকরীটি তোরা খাবি।

আমাদের দলের আর একটি কর্ম্ম ছিল চুরি। বাড়ীর পাশেই ছিল একখানি ক্ষেত, পাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে প্রচুর শালগম এবং ফুলকপি হ'ত। আমরা নিত্য দ্বিপ্রহরে কাঁচা শালগম এবং কপি তুলে ভক্ষণ করতাম। আর দরজা জানালা বন্ধ ক'রে নিয়মিত ডন বৈঠক ক'রে শক্তি সঞ্চয় করতাম। মণি এবং মামা বৈদেহী বলতো বেহারীদের কাছে বাঙালীর দৈহিক দুর্ব্বলতার জন্য মুখ পাতবার উপায় নেই। দুর্ব্বল ভেতো বাঙালী। এ নিয়ে প্রতিবাদ করলেই ওরা হাত চেপে ধ'রে বলে, এসো, প্রমাণ কর। একদিন সারা সকাল এই নিয়ে আমাদের উত্তপ্ত আলোচনা হ'ল। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীর নজীরেও আমরা জিততে পারলাম না। বাড়ীর সামনে থাকত পাগ্‌লা যাদ্দু বাবু, সেই যাদ্দু বাবু আমাদের হারিয়ে দিলেন। বললেন—আরে পিস্তৌল আউর বোম নিয়ে লড়াই তো যার খুসী করতে পারে। মেইয়া লোকেও পারে। উসমে শরীরের তাগদের পরিচয় কোথা? কিঙ্কর সিং, গোলাম, গামা, রাম মূরত—এঁদের তাগদের কথা জান। এরা চার ঘোড়ার আট ঘোড়ার গাড়ী বাঁ হাতে ধরে রুখে দেয়, বুকের উপর হাঁতী চাপায়। সাহেব লোকের স্যাণ্ডো ওণ্ডো যত্ত বড় বড় তাগদওলা আছে সবকোইকে কড়ে আঙুলে ক'রে পটকে দেয়। আরে এরা যদি ইচ্ছে ক'রে তবে আংরেজ লোকক্কে এক কনুইয়ের গুঁতোতে ভাগিয়ে দিতে পারে। শুধু বলেই ক্ষান্ত হলেন না যাদ্দু বাবু—

বাড়ীর পাশ থেকে ডাকলেন এক পালোয়ানকে, তাঁর বিশাল দেহ দেখিয়ে বললেন—দেখ না এদের কাছে লাগো তোমরা? তোমাদের বাংগালী লোকের যে কোন আদমীকে ডেকে আন। ডেকে আন তোমার মামাদের, এমন কি তোমাদের বুড়াবাবু দাদামশায়কে ডাক না। ও স্রেফ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে। তার প্রমাণ দেবার জন্যই বোধ করি যাদ্দুবাবু কোন ইঙ্গিত করলেন সেই পালোয়ানকে।

যাদ্দু বাবুর ইঙ্গিতে পালোয়ান বার-কয়েক বাই ঠুকে জানুতে চাপড় মেরে এমন বিপুল শব্দ তুললে যে আমাদের তিনজনের কল্পনার বোমার শব্দও তার কাছে হার মেনে মাথা হেঁট ক'রে স্বীকার করলে—নাঃ, এতখানি শব্দ আমরা ফাটালেও হবে না। হার মেনে ফিরে এসে তিনজনে পরামর্শ করলাম—শক্তি সঞ্চয় ক'রে এ দুর্নাম মোচন করতেই হবে! উত্তেজনা সে দিন এতখানি হয়েছিল যে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তখন কার্ত্তিকের শেষ, ইস্কুল কাছারী কলেজ খুলেছে; বড় মামারা ইস্কুল কলেজে, দাদামশায় কাছারীতে; মাসীমা দিদিমা এঁরা বাড়ীর ভিতরে গল্প করছেন; আমরা মুক্ত স্বাধীনের মত বেরিয়ে পড়লাম। পুরানো শহর বেহার শরীফ, সংকীর্ণ রাস্তা, বিশেষত বাজারের ভিতরটায়। দেখলাম একখানা সাইকেলে চ'ড়ে আসছে একটি নব্য বেহারী তরুণ। দেখেই আমার যাদ্দুবাবুর গল্প চার ঘোড়ার জুড়ি আটকানোর কথা মনে পড়ে গেল। আমি বললাম—আমি ওই সাইকেল আটকাব।

মণি এবং বৈদেহী প্রথমটা অবাক হয়ে গেল। বললাম—সাইকেল আটকে অভ্যেস করলে বড় হয়ে চার ঘোড়া কেন, আট ঘোড়ার জুড়ীও আটকাতে পারব।

মণি বললে—কিন্তু ও যে মেজমামার বন্ধু। আমাদের চেনে। মেজ-মামাকে বলে দেবে!

আমি বললাম—আমাকে তো চেনে না। তোমরা স'রে দাঁড়িয়ে থাক। ব'লেই আমি দাঁড়ালাম প্রস্তুত হয়ে। গাড়ী কেমন ক'রে আটকায় কখনও দেখিনি। আটকাতে হলে সামনে দাঁড়িয়ে আটকানোর কথাই সেদিন

দশবছর বয়সের আমার মাথায় এসেছিল স্বাভাবিক ভাবে। ওদিকে সাইকেলটি কাছাকাছি এসে পড়েছে। ঘণ্টা পড়ছে। আমি খুঁট নিয়ে দাঁড়িয়ে ঠিক হ্যাণ্ডেলের নিচেই রড ধরে ফেললাম। ভদ্রলোক নিজেই বোধ হয়, বোধ হয় কেন নিশ্চয় সাবধান হয়েছিলেন, ব্রেক কষেছিলেন; নইলে আমার সেদিন পড়ে যাওয়াই ছিল গতিবেগ এবং ভারের মিলিত শক্তির অমোঘ অঙ্কফল।

ভদ্রলোক চট ক'রে একটা পা নামিয়েও দিলেন নিচে। সেদিন আমি আমার বিস্ময়কর শক্তিসাফল্যে পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম। আমার সে পুলক বিপুলতর হয়ে উঠল এবং অহংকারে ও আত্মপ্রসাদে রূপান্তর লাভ করলে একটু পরেই। সেই বেহারী তরুণটি জিজ্ঞাসা করলেন—এমনভাবে ছুটে এসে আমার সাইকেল ধরলে কেন? পড়ে গিয়ে যে চোট লাগত।

আমি যতটুকু হিন্দীতে দখল ছিল সেই দখল মত হিন্দীভাষাতে কোন রকমে বুঝিয়ে দিলাম—বাঙালী দুর্ব্বল নয়, ভীতু নয়, ভেতো নয় এই প্রমাণ করতে আমি বাইসিক্ল রুখেছি। বড় হয়ে জুড়ী গাড়ী রুখব।

ভদ্রলোক খুব তারিফ ক'রে বাঙালীর প্রশংসা ক'রে হেসে চলে গেলেন। মণি এবং বৈদেহী মামা এবার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল। সে দিন সন্ধ্যায় বাড়ঘরে যাদ্দুবাবুর কাছে সেই গল্প করলাম আমরা। যাদ্দুবাবু অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন। সে অট্টহাসি তাঁর আর থামে না।

এর প্রায় ছ'বছর পর পাটনায় এলাম। বেহারের সেই স্তূপ এবং পাহাড়ের উপরের মসজিদ ছাড়া এর মধ্যে ইতিহাসের ছোঁয়াচ লাগা কোন স্থান আমি দেখি নি। এবার দেখলাম মাটির তলায় চন্দ্রগুপ্তের রাজ-সভাকক্ষ; তার পাশে তখনও খনন কার্য্য চলছে, বড় বড় ইঁটের প্রশস্ত কক্ষ সিঁড়ি বেরিয়েছে। প্রায় দু'হাজার বছরের আগের শাল গাছের গুঁড়ির অংশ পেলাম আমার হাতে। কঙ্করবাগে শুনলাম ওই গল্প। আজ লিখতে বসে হিসেব ক'রে দেখছি বেহারের সেই সুরটি যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল পাটনায়। কঙ্করবাগ যেন একটা আকর্ষণে বাঁধলে আমায়। ফাঁক পেলে একা চলে

যেতাম্ কঙ্করবাগে। রাস্তা কম নয়, অনেকটা। কিন্তু বেহারের ভাগের একার মত সস্তা পরিবহন ব্যবস্থার কল্যাণে পথের দূরত্ব বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। আমার ন-মামা আমাকে প্রায় বেঁধে রাখতেন নিজের সঙ্গে। সকালে উঠেই বের হতাম দুজনে। পাটনা সিটির নবাব বাড়ী, সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক স্থানগুলি, পাটন দেবীর মন্দির, শিখ-গুরু গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান হরমন্দির, ওদিকে গোলঘর ঘুরে বেড়াতাম দিনের পর দিন। তিনিই অপরাহ্নে নিয়ে যেতেন খোদাবক্স খাঁর ভারত বিখ্যাত গ্রন্থাগারে। সেখানকার প্রাচীন সংগ্রহ ছবি অস্ত্র পোষাক এক এক ক'রে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন ইতিহাসের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, কানিংহামের ভারতবর্ষের পুরাকীর্ত্তির ইতিহাসের মধ্য থেকে একদিন বের ক'রে দিলেন লাভপুরের নাম। অবাক হয়ে গেলাম। মনটা স্ফীত হয়ে উঠল। গৌরব অনুভব করলাম। লাভপুরের নাম রয়েছে? আমার লাভপুর তো সামান্য নয়। অবশ্য লেখা পড়ে বুঝলাম মল্লারপুরের সঙ্গে একটু গোলমাল হয়ে গেছে। লিখেছেন, প্রাচীন কালে এখানে মল্লরাজারা রাজত্ব করতেন। টুকে নিয়ে এসেছিলাম লাভপুরের ইতিবৃত্তটুকু। এই নেশা এমন আমাদের পেয়ে বসেছিল যে এক একদিন সময়ের হিসেব ভুল হয়ে যেত। একদিন এমনি বেলার হিসেব ভুলে গিয়েছি, বেলা একটা বেজে গেছে। খেয়াল হতেই দ্রুত এসে দাঁড়ালাম চৌকে। একখানা একা যাচ্ছিল তাতে সোয়ারী দুজন। একজন বসে রয়েছে। অপর জনটি প্রায় শুয়ে আছে। তার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। সেখানাকেই থামিয়ে আমরা উঠতে চাইলাম। যে লোকটি বসেছিল গাড়োয়ান তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে। তারপর বললে ওঠ। বৈশাখ মাস, বেলা একটা, আমরা বাড়ী ফিরতে ব্যাকুল। বাড়ীতে তিরস্কারের আশঙ্কায় শঙ্কিত! উঠে বসলাম। বাঁকীপুরে আদালতের ধারে যখন নামলাম তখন চোখে পড়ল শায়িত লোকটির সর্ব্বাঙ্গে জার্ত্ত বসন্তের ঘা; ঘাগুলির মামড়ি তখনও লেগে রয়েছে। দেখে দুজনের মুখ শুকিয়ে গেল। বাড়ীতে কথাটা বলতে সাহস করলাম না; কিন্তু বাড়ী ফিরেই আবার সমস্ত জামা কাপড় মায় জুতো পর্য্যন্ত নিয়ে ছুটলাম গঙ্গার ঘাটে।

একখানা কার্ব্বলিক সাবান সর্ব্বাঙ্গে মেখে অবশিষ্টটুকুতে কাপড় জামা গেঞ্জি কেচে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম প্রায় আড়াইটের সময়। এর পর দিন-পনেরো যে কি কঠিন উদ্বেগে কাটিয়েছিলাম সে আর বলার নয়, অন্তত বলে বুঝানো যাবে না। শেষের দিন কয়েক পড়লাম একা। সঙ্গী ন-মামা কোথাও গেলেন; সম্ভবত বেতিয়ায়। এ সময় গায়ে ঘামাচি বা ফুস্কুড়ি দেখলেই দিন রাত্রি সেই নিয়েই আতঙ্কিত হয়ে থাকতাম। প্রথম দিন তিনেক পর এই দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি দিলে এই কঙ্করবাগ। সকালে বিকালে সুবিধে পেলেই যেতাম কঙ্করবাগে। ঘুরে বেড়াতাম। খুঁজতাম সেজ মামার লুকিয়ে রাখা সেই পিস্তলটি। মনে হ'ত যদি পাই তবে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়ি; দেশের শত্রু নিপাত ক'রে ফাঁসি-কাঠে ঝুলে জন্ম সার্থক করি।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

সেদিন অস্ত্র হাতে করার মধ্যে প্রাণ নেওয়ার কথাটা বড় ছিল না, প্রাণ দেওয়ার কথাটাই ছিল বড়; একটি প্রাণ বলিদানে সহস্র প্রাণ জেগে উঠবে এই ছিল কামনা। নিজের মৃত্যুতে আসুক দেশমাতৃকার মুক্তি। সেদিন যেন তারই মধ্যে অমৃত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। হিংসা বা নরহত্যার পাপ স্পর্শ করত না; ফাঁসীর আসামীর ওজন বাড়ত; মুখশ্রীতে ফুটে উঠত মুক্ত-প্রাণের আনন্দদ্যুতি। সে এক দিব্য ভাব-প্রেরণা। সেই প্রেরণা তখনকার বাংলার আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল। সেই আকর্ষণে যেতাম কঙ্করবাগে। ঘুরতাম চারিদিকে। কিন্তু কোথায় সে অস্ত্র!

ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বসতাম। কোন কোন দিন অন্ধকার হয়ে আসত। সেই অন্ধকারের মধ্যে মনে জেগে উঠত কঙ্করবাগের সমৃদ্ধ কালের উৎসব রজনীর কথা। অন্ধকারের মধ্যে মনে হতো দেখতে পাব কোন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে কোন তরুণ আমীর, পরণে চুস্ত পায়জামা, গায়ে আজানু-লম্বিত মসলিনের আচকান, কোমরে কোমরবন্ধ, তাতে গোঁজা রয়েছে মখমলের খাপে হাতীর দাঁতের বাঁটওয়ালা ছোরা, একহাতে একটি

ফুটন্ত গোলাপ; দূরে কোথাও উঠছে অলঙ্কারের মৃদু শব্দ। অনুমান করতাম আসছে অভিসারিকা, তার মূর্ত্তি অবিকল খুদাবক্স গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হাতীর দাঁতের ফলকে আঁকা বেগমদের ছবির মত। কত সন্ধ্যায় যে সেকালে এই কল্পনা মনে জেগে উঠেছে তার হিসেব নেই আর। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে,উত্তরকালে সাহিত্য সাধনার সময় এই ধরণের গল্প যেগুলি লিখেছি তাতে নিশ্চয় আছে গুলজারবাগের সেই সন্ধ্যাগুলির মনের ছাপ। গুলজারবাগ আরও মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের প্রভাবে। এই সময়েই একদিন মামাদের ওখানে পড়লাম ক্ষুধিতপাষাণ।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদা এল একখানি খামের চিঠি। আমার দশ বছর বয়সের বধূ উমার চিঠি। সে বেশ বড় চিঠি এবং ভাষার বিন্যাসে যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে। সে-কালে নববিবাহিতা বালিকাদের অভিভাবিকারা বসে পত্র লেখাতেন। যে তরুণ পত্রখানি পেত সে অবশ্যই বিশ্বাস করত যে এ পত্র তারই বধূর অন্তরের কথা। আমিও তাই বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু তবু সে পত্রের উত্তর দিলাম না। আমি তখন আদর্শবাদী তরুণ; যে বধূ আমার মা পিসিমার অমর্য্যাদা ক'রে তাঁদের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে দিদিমার বাড়ী চলে গেল তার অপরাধ সম্পর্কে আমার কোন সংশয় ছিল না। সুতরাং তার পত্রের উত্তর দেব কি?

এরই কয়েক দিন পরেই এল পিসীমার পত্র। বাড়ী ফিরবার পরোয়ানা জারী করেছেন। এবং লিখেছেন—আমি বধূকে দীর্ঘ পত্র লিখেছি সে সংবাদ তিনি পেয়েছেন। সুতরাং ঘরসংসার সব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি কাশী যাবেন। পত্রপাঠ সব বুঝে নেবার জন্য চলে আসা প্রয়োজন।

প্রয়োজন অনুসারে আয়োজন হল। মা কিছুতেই লঙ্ঘন করতে পারলেন না এ পত্র। আমি গুছিয়ে নিলাম আমার সামগ্রীগুলি। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভাকক্ষের কাঠের মঞ্চের কাঠ, প্রাসাদের ইঁট, পাথরের মূর্ত্তিগুলি।

রওনা হলাম লাভপুর।

আজ ইঁট-কাঠগুলি হারিয়ে গেছে। কোথায় গেছে জানি না। আজও সেগুলির সন্ধান করি। কঙ্করবাগ মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে।

ফিরে এলাম পাটনা থেকে।

ওদিকে তখন আমার শ্বশুরকুলও ফিরে এসেছেন সিউড়ি থেকে। এবং এদিকে অর্থাৎ লাভপুরে আমার পিসীমা এবং উমার দিদিমার মধ্যে ঝগড়াটা এক বিচিত্র যুদ্ধপর্ব্বে পরিণত হয়েছে। রামায়ণে আছে মেঘনাদ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে যুদ্ধ করতেন। তাতে মাটির উপর যে প্রতিপক্ষ থাকত তারই হ'ত মহাবিপদ। এক্ষেত্রে দুই পক্ষই পরস্পরের কাছে থাকতেন অদৃশ্য। এবং ঘর থেকে ছাড়তেন বাক্যবাণ। আশ্চর্য্যের কথা—কথাগুলি একেবারে এসে মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হ'ত। আরও একটা কাণ্ড ঘটত—দুই বাড়ীর মধ্যস্থলে এসে গতিবেগের তীক্ষ্নতা দ্বিগুণিত হয়ে উঠত প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে শক্তি লাভ ক'রে।

পিসীমা হয়তো বললেন—কি ভুলই করেছি! কেন গ্রামে বিয়ে দিলাম। দিলাম তো নিজেদের থেকে বড়লোকের বাড়ীতে দিলাম কেন? ছেলের বিয়ের তো অসময় হয় নি। কত জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এল, বিয়ের তো ভাবনা ছিল না!

ও বাড়ীতে যখন কথাগুলি গেল—তখন কথাগুলি উল্টে পাল্টে বিচিত্র চেহারা নিয়ে গেল, এবং পরিশেষে আরও খানিকটা যুক্ত হয়ে গেল। —কি ভুলই করেছি। কেন মরতে গ্রামে বিয়ে দিলাম। দিলাম তো বড়লোকের বাড়ীতে দিলাম কেন? বড়লোক ব'লে তেজ দেখাচ্ছে। কত জায়গায় কত বড়লোক পায়ে ধ'রে সেধে গিয়েছে। আমার ছেলের বিয়ের ভাবনা! আজই ইচ্ছে করলে আবার আমার ছেলের বিয়ে দিতে পারি! তাই আমি দেব।

উমার দিদিমা জ্বলে উঠলেন, বললেন—ওরা ছেলের বিয়ে দিতে পারে আমি পারি না আমার নারাণের বিয়ে দিতে? ওরা যেদিন বিয়ে দেবে

তার আগের দিন আমি নারায়ণের বিয়ে দেব। আর আমাদের মেয়ে—তাকে আমরা বাড়ী করে সম্পত্তি দিয়ে রাণী করে দিয়ে যাব।...

এ বাড়ীতে সেই কথাগুলি এল যে চেহারা নিয়ে তা'হল এই—ওরা ছেলের একটা বিয়ে দিলে আমি নারাণকে তিনটে বিয়ে দেব। আমাদের মেয়ের একটা সতীন হ'লে ওদের মেয়ের তিনটে সতীন হবে। আমাদের মেয়েকে বাড়ী দেব, সম্পত্তি দেব, সে রাণী হয়ে থাকবে, আর ওদের বেটা তারই লোভে আমাদের মেয়ের গোলাম হয়ে এসে গড়াগড়ি খাবে।

পিসীমাও শুনে জ্বলে উঠলেন, কিন্তু তাঁর লক্ষপতি ধনীগৃহিনীর মত অর্থের জোর নেই এবং আরও একটা জায়গায় তিনি পৃথিবীতে বোধ করি কাঙালের কাঙাল। আমি তার গর্ভের সন্তান নই, সংসারে তিনি সর্ব্ব রিক্ত; তাই জ্বলে উঠেও যে পথে গেলেন সে পথটা একটু বিচিত্র পথ। সেই পথ ধরেই তিনি বললেন—তাই দেবেন ওঁরা। কিন্তু আমার ছেলে সে-ছেলে নয়, সে গোলামী করতে যাবে না। তার চেয়ে সে ভিক্ষা করবে। আর আমাদের মেয়ের জন্তেও ভাবি না। আমার বাবা বলতেন—কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরের ভগ্নী উপবীতের চেয়েও বড়, উপবীত থাকে গলায়, ভগ্নীর স্থান মাথায়। শালগ্রাম শিলার মত গলায় বেঁধে আমার ছেলে তাকে ভিক্ষে ক'রে পুষবে।

ওদের বাড়ী খবর গেল, আমার পিসীমা বলেছেন—আমার মেয়েকে সম্পত্তি দিতে না-পারি, আমার ছেলেকে বলব গলায় দড়ি দিয়ে বোনকে গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজে বিবাগী হয়ে দেশান্তরে ভিক্ষা ক'রে বেড়াবে।

সে সব কথা সমস্ত মনে নেই কিন্তু তার যেন আর শেষ ছিল না। আমার জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠল। শোনা যায় আগেকার কালে পরিচ্ছদে বিষ মাখিয়ে রাজাবাদশারা অনুগ্রহের ছলে নরহত্যা করতেন। যে হতভাগ্য সেই পোষাক গায়ে দিত তার সারা দেহ বিষাক্ত হয়ে উঠত। আমার জীবনটা তখন ঠিক তাই হয়ে উঠল। নারাণের যন্ত্রণা এতখানি ছিল না। কারণ ঝগড়ার মধ্যে তার দাম্পত্য-জীবন প্রত্যক্ষভাবে জড়ানো ছিল না। সবটাই আমার ও তার বোনের জীবনের উপর ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র।

আমাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হ'লে তবে তাকে আরও তিনবার বিবাহ করিতে হবে। তার বোন পৈত্রিক ধন-সম্পদে রাজা-সম্পর্কহীন রাণী হ'লে এবং আমি গোলামী না-করলে তবে তার স্ত্রীকে গলায় দড়ি দিয়ে ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ।

যাক। এখন যা ঘটেছিল সেই ঘটনার কথা বলি। বাড়ী এসে পৌছুলাম, পিসীমা অভিমানে দুঃখে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। প্রথম কথাই তিনি বললেন—বললেন আমার মা-কে। তোমার সংসার তুমি বুঝে নাও। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কাশী যাব। তারাশঙ্কর বউকে চিঠি দিয়েছে! আমি শুনেছি। বউকে দূরে রাখলে তার মনে কষ্ট হবে। তাকে নিয়ে এস। আমি থাকলে বউ আসবে না। আমি চলে যাব।

আমাকে অগত্যা উমার প্রথম প্রণয়লিপি বের করে তাঁর হাতে সমর্পণ করতে হল। হস্তাক্ষর অবশ্যই উমার কিন্তু পত্ররচনা কোন প্রাপ্তবয়স্কার। তাতে অনুযোগ ছিল—বিবাহের পর এই প্রথম বিচ্ছেদের কালে আমি কোন পত্র লিখি নি, সেই প্রথম পত্র লিখছে! এর চেয়ে তার মন্দভাগ্য আর কি হতে পারে! ইত্যাদি, ইত্যাদি। পত্রখানা পড়ে শোনালেন মা। পিসীমা তখনকার মত শান্ত হলেন। ওদিকে ঝগড়া চলতে লাগল সমানে। এই ঝগড়ার মধ্যেও মাঝেমাঝে কৌতুকজনক ঘটনা ঘটত। বধূ উমা মধ্যে মধ্যে মা-পিসীমা দ্বারা সাময়িকভাবে বন্দিনী হ'ত। আগেই বলেছি—পল্লীগ্রামের বিচিত্র ব্যবস্থায় আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন আমাদেরই ঠাকুরবাড়ীর ভিতর দিয়ে উমার মাতামহদের বাড়ী থেকে সদর রাস্তায় যাবার পথ। সেই পথেই সে তার মাতামহের ঠাকুরবাড়ীতে যায়, নিজের বাপের বাড়ী যায়; অর্থাৎ যে কোন জায়গায় যেতে হোক আমাদের ঠাকুরবাড়ীর ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। এই যাতায়াতের পথে তাকে ধ'রে বাড়ীতে এনে মধ্যে মধ্যে মা তার চুল বেঁধে দিতেন; সদুপদেশ দিতেন।

নারাণ এবং আমি অন্যান্য বন্ধুর সঙ্গে বিকেল বেলা যথা নিয়মে বেড়াতে যেতাম। নারাণ মিষ্ট প্রকৃতির মানুষ; তার চরিত্রের কোন দিকেই কোন জোর কোন কালেই নেই। সে কেবলই প্রশংসা করত উমার। এইভাবে

আমাকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করত। একটা চেষ্টা তখন ও তরফ থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে। মা-পিসীমার প্রতি আমার অনুরক্তি ক্ষুণ্ণ ক'রে ওঁদের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করবার একটা চেষ্টা ওঁরা ক'রেছিলেন। আমি যে আমার জীবনের প্রথম প্রণয়লিপিখানি আমার মা-পিসীমার হাতে সমর্পণ করতে দ্বিধা করি নি এতে ওঁরা বেশ একটু ভীত হয়েছিলেন। এবং আমি এমনভাবে ঘোরাফেরা করি যে, ওঁদের এলাকার ত্রিসীমানার মধ্যে যাই না। এই অবস্থায় একদা একটা কৌতুককর ঘটনা ঘটল।

জ্যৈষ্ঠ মাস। গরমের ছুটিতে ইস্কুল বন্ধ। বেলা দশটা এগারটার সময় আমরা স্নান করতে যাই গ্রামান্তরের একটা পুকুরে। কাজল কালো জল-টলোমলো দিঘী। বাইসিক্লের কেরিয়ারে কাপড়গেঞ্জি গামছা তোয়ালে বেঁধে চলে যাই। পিছনে একজন সঙ্গী থাকে। কোন দিন থাকে, কোন দিন থাকে না। ঘণ্টাদুয়েক জলে তোলপাড় ক'রে বাড়ী ফিরি। এই পুকুরে যাওয়ার একটা সংক্ষিপ্ত পথ উমার মাতামহের বাগানের ভিতর দিয়ে। সুন্দর সখের বাগান। অনেক রকম দুর্লভ গাছ আছে বাগানটিতে। ভাল ভাল আমের গাছ, লিচু গোলাপজাম জামরুলের গাছ; কিছু ফুলের গাছও ছিল। একটি গাছ ছিল, মুচকুন্দচাঁপার গাছ। গরমের সময় এই ফুলের গন্ধ চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ত, বীরভূমের গুমোট গরমভরা স্তব্ধ রাত্রিতে গোপন মাধুর্য্যের মত মনে হ'ত। মুচকুন্দ চাঁপা আমার বড় প্রিয় ফুল। আমি এই স্নানে যাওয়ার পথে গাছতলা থেকে ঝরাফুল দুটি চারটি নিত্যই কুড়িয়ে আনতাম।

সেদিন গাছতলায় বাইসিক্লটি রেখে ফুল কুড়াচ্ছি এমন সময় আমার ঠিক পাশের আমগাছ থেকে কেউ একজন ঝপ ক'রে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ওদিক থেকে একটা সাঁওতাল মেয়ে প্রায় বাঘিনীর মত ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরলে। মেয়েটা বাগানের আগলদারনী। এবং যে লাফিয়ে পড়ল সে আমার একজন সহপাঠী, নাম সতীশ মণ্ডল। সতীশ রামপুরহাট অঞ্চলের ছেলে, এখানে পড়ে এবং গ্রামেই এক ভদ্রলোকের

শিশুপুত্রদের পড়ায়, তাঁর বাড়ীতেই থাকে। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী যায় নি। এবং এই বাগানে সে নিয়মিত এসে আম্র ভক্ষণ করে ও পেড়ে গামছায় বেঁধে নিয়ে যায়। আগলদারনী লক্ষ্য করেছে কিন্তু ধরতে পারে নি কোন দিন। সতীশ এমনই চতুর। চতুর তাতে সন্দেহ নাই। আমি যে পাশের গাছ তলায় ফুল কুড়াচ্ছিলাম আমিই টের পাই নি তার অস্তিত্ব। আগলদারনী তার হাত ধরেই বললে—চল, তুকে নিয়ে যাব আমি গিন্নী মায়ের কাছে।

সতীশ দুর্দান্ত ছেলে। কিন্তু গিন্নী মায়ের নাম শুনেই সে বিবর্ণ হয়ে গেল। সে জানে যে, মেয়েটার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গিয়েও সে নিস্তার পাবে না। বিশেষ ক'রে গিন্নী মায়ের ইস্কুলের ছাত্র সে। গিন্নী মা মধ্যে মাঝে আম চুরির উৎপাতে বিরক্ত হয়ে হেডমাস্টারকে ডাকেন, বলেন—ও মাস্টার, কেমন তোমার শাসন, কেমন তোমার ছাত্র, একটা আম পাচ্ছি না আমি। আমার আম চুরি গেলে তোমাকে ধরব কিন্তু। শাসন কর তুমি ছেলেদিগে!

আমি অবস্থা দেখে এগিয়ে গিয়ে বললাম—ওরে, ওকে ছেড়ে দে।

'—কেন ছেড়ে দিব? আম জাম চুরি করে উ রোজ। আজ তু সুদ্ধ এসেছিস উর সাথে। হুঁ। তুকে সুদ্ধ লিয়ে যাব আমি। তুকে আমি চিনি। তু উমা দিদির বর বেটে। বল্ তুকেও লিয়ে যাব আমি।

চমকে না উঠলেও বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। এ সর্ব্বনাশী বলে কি? আমি সতীশের সঙ্গে আম চুরি করতে এসেছি। আমাকে ধরে নিয়ে যাবে! কল্পনা চক্ষেই চকিতে ভবিষ্যতের একটা অধ্যায়ের ছবি ভেসে গেল। ধ'রে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি বাইসিক্ল চড়ে চম্পট দেব। কিন্তু ও-বাড়ী থেকে কথা আসবে আমাদের বাড়ীতে, ওদের ছেলে ভাল ছেলে, আমাদের বাগানে আম চুরি করতে আসে, ছি—।

পিসিমা হয় তো মাথা কুটবেন।—ছি—ছি—ছি।

মা বিচিত্র-বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইবেন—ছি!

সতীশ বেচারা ট্যাক থেকে একটা দু' আনি বের ক'রে তাকে দিতে চাইলে—এই নে। এই নে বাপু!

—না। উ তু রাখ। উ আমি লিব না। গিন্নী মা আমাকে বকছে। ভাল গাছে আম পাকে না কেনে? তুই ছোঁড়াটা পেড়ে নিয়ে যাস। গিন্নীমা বলে—তুরা খাস। তুকে নিয়ে যাব। উকে নিয়ে যাব। বুলব—এই দেখ তুদের জামাই মিতে নিয়ে যায়, চুরি ক'রে খায়। কুথা পাব ভাল আম।

সে টানতে লাগল সতীশের হাত ধ'রে। সতীশের সর্ব্বাঙ্গে পাকা আমের গন্ধ। কাপড়ে আমের রসের দাগ। মুখে লেগে আছে। হাতে আম-বাঁধা গামছার পোঁটলা। বাগানের চারি পাশেই গিন্নী মায়ের খাস তালুক; তাঁরই লোকজনে গিস্ গিস্ করছে। অন্তত আধ মাইল না গেলে সে এলাকা পার হওয়া যাবে না। বেচারা কেঁদে ফেললে।

আমি এবার আর থাকতে পারলাম না। এগিয়ে গিয়ে জোর ক'রে ওকে ছাড়িয়ে দিলাম। বললাম—চলে যা সতীশ। তুই চলে যা। সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিলাম বাইসিক্লের পাম্পটা। মেয়েটার নাম ছিল লুডি। বললাম, এই দিয়ে পিটে তোর হাড় ভেঙে দেব। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্। যা বলবি আমার নাম দিয়ে গিন্নী মাকে বলিস। আমি ছাড়িয়ে দিলাম। লুডি দমবার মেয়ে নয়। কিন্তু এবার দমে গেল। সে গ্রামের অন্য জমিদার বাড়ীর ছেলেদের খাতির ক'রে না। সে জানে শুধু নিজের জমিদার ওই গিন্নী মাকে। তবে আমি জামাই এই বলেই দমে গেল। নইলে পাম্পটা দেখে সে ঢেলা তুলত বা চীৎকার ক'রে লোক জড়ো করত।

যাই হোক, সতীশ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করলে। এবং আমি বাইসিক্লটা টেনে নিয়ে চড়ে রওনা হলাম গ্রামান্তরের দিঘীর দিকে। বাড়ী ফিরলাম এবং খাবার সময় কথাগুলি খুলেই বললাম মা পিসীমাকে। ভাগ্য ভাল ছিল ছাড়া আর কি বলব? বলতে গেলে বলতে হয় পিসীমার মেজাজটা ছিল ভাল। তিনি শুনে হেসে উঠলেন। বললেন, লুডি তোকে ছেড়ে দিলে কেন? বেশ হ'ত। মিথ্যে চোর হয়ে শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াতিস। আর একদিন দাঁড়িয়েছিলি!

এগারো

পিসীমা বললেন, বেশ হ'ত। মিথ্যে চোর হয়ে দাঁড়াতিস গিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে। আর একদিন যেমন দাঁড়িয়েছিলি।

হেসেছিলেন প্রচুর এবং সে হাসি প্রাণ-খোলা হাসি। কথাটা সে দিনও মনে পড়েছিল, আজও এই স্মৃতির কথা লিখবার সময় মনে পড়ছে। অনেক দিন আগে, বোধ করি এগার বারো বছর বয়সে একদিন গিন্নীমায়েদের চাপরাশী আমাকে পাকড়াও করেছিল চোর ব'লে। ফুল চোর ব'লে ধরেছিল। একা আমাকে নয়, আমাকে, আমার বোন, যিনি এখন গিন্নীমায়ের নাতবউ; তাঁকে এবং আমার এক পিসতুত বোনিকে—তিন জনকে পাকড়াও করেছিল।

সে দিন ছিল সাবিত্রী ব্রতের দিন। আমার পিসীমা এই ব্রত করেছিলেন। এবং ইহজন্মের এই বালবৈধব্যের বেদনায় পরজন্মে চিরায়ুষ্মতী হবার ব্যাকুল প্রত্যাশায় আকুল অন্তরের নিষ্ঠায় এই ব্রতটি পালন করতেন। তাঁর অন্তরের আকুলতা যেন প্রত্যক্ষ ভাবে গোটা সংসারটির উপর দীপ্ত দ্বিপ্রহরে মেঘোদয়ের মত একটি ছায়া বিস্তার করত। অথবা গাঢ় অন্ধকার রাত্রে আকস্মিক এককলা চন্দ্রোদয়ের ফলে জ্যোৎস্নার মায়া বিস্তার করত। আয়োজনে অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি হলে তাঁর আক্ষেপের আর সীমা থাকত না। চোখের জলে বুক ভেসে যেত। এই কারণেই গোটা সংসারটি সাবিত্রী ব্রতের দিন এই ব্রতানুষ্ঠানের সকল আয়োজনকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করবার জন্য স্বাভাবিক ভাবে উদগ্রীব হয়ে উঠত, প্রাণ ঢেলে দিতে চাইত।

সাবিত্রী ব্রত চৌদ্দ বৎসরের ব্রত। চৌদ্দ বৎসরের ব্রতে সংখ্যায় চৌদ্দটি ক'রে চৌদ্দ রকম ফুল এবং চৌদ্দ রকম ফল প্রয়োজন। এ ছাড়া আরও অনেক আছে অবশ্য। কিন্তু আমি এবং আমার বোনেরা নিতাম চৌদ্দ রকম ফুল সংগ্রহের ভার। এর সঙ্গে যে কয়েক রকম পারি ফলও সংগ্রহ করে আনতাম। সে কালটা ছিল ধর্ম্মবিশ্বাসে ব্রত পালন এবং নানা আচার

অনুষ্ঠান পালনের কাল। গ্রামে অনেকেই ব্রত করতেন। সুতরাং এই ফুল সংগ্রহের পালাটা খুব সোজা ছিল না। ফুল সংগ্রহ করতে হ'লে উঠতে হ'ত রাত্রি থাকতে। সব বাড়ী থেকেই বের হ'ত এক একটি ছেলের দল।

পাড়াগাঁয়ে দু' চারটে সাধারণ ফুলের গাছ যেমন জবা, টগর, করবী, কিছু নয়নতারার গাছ সব বাড়ীতেই থাকত। কিন্তু যাকে বলে ফুলের বাগান, এ বড় একটা কারুর ছিল না। ছিল তিন বাড়ীতে। আমার বাবার আমলে আমাদের বাড়ীতে ছিল সত্যকারের একটি ভালো বাগান। বেল, যুঁই, কামিনী, গোলাপ, চামেলী, মালতী, মাধবী, কৃষ্ণচূড়া গাছগুলি আজও আমার মনে পড়ছে। এ ছাড়া সাদা লাল পাতি থোপা করবী, টগর, জবা এসব তো ছিলই। আর এক রকমের গাছ প্রচুর, জন্মাত তাকে বলতাম কস্তুরী (এ গাছগুলিকে কলকাতায় এসে মরশুমি ফুলের মহলে 'হলিহক' ব'লে পরিচিত হতে দেখেছি)। আমাদের বাড়ীতে বাবার আমলে নিত্য প্রভাতে গ্রামের সকল দেব মন্দিরের পূজারীই উপস্থিত হতেন। সে কালে এটা একটা মহাভাগ্য ছিল। গ্রামের সকল দেবপূজার্থীর পদধূলি পড়া তো কম ভাগ্যের কথা নয়। আমার 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে এই ফুলের বাগানটি থেকেই হয়েছে প্রচণ্ডতম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি।

যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে কিন্তু আমাদের বাগান শ্রীভ্রষ্ট হয়ে গেছে, যত্ন করবার মানুষ নাই; তার উপর বাবার মৃত্যুর পরই আমার বাবার মাতুল এসে আমাদের সংসারের কর্তৃত্ব ভার নিয়েছিলেন। তিনি ফুলের বাগানের উপর খুব প্রসন্ন ছিলেন না। শুধু মা এবং পিসীমা বাবার সখের বাগানটি নষ্ট করতে দিতে চান নি বলেই বড় বড় গাছগুলি বেঁচে ছিল, নইলে সেগুলিকে কেটে তিনি সেখানে ধানের মরাই বাঁধার পক্ষপাতী ছিলেন। সে আমলের বাগান থাকলে ফুলের জন্যে আমাদের বাইরে যেতে হ'ত না।

যে দিনের কথা বলছি—সেদিন ভোর বেলা তখনও অল্প অল্প অন্ধকার আছে, উঠে সাজি হাতে তিন ভাই বোনে প্রথমেই এসে হাজির হলাম আমাদের বাগানে। এসে দেখি, বাগান শূন্য। এর আগেই কারা এসে

বাগান প্রায় মুড়িয়ে ফুল তুলে নিয়ে গেছে। কান্না পেলে আমাদের। কাঁদতে কাঁদতেই চীৎকার করে বকতে লাগলাম—আমাদের বাড়ীর চাকর চাপরাসীকে। যে ফুলগুলি ছিল সংগ্রহ করলাম—তাতেই সাজিটা প্রায় তিন অংশ ভর্ত্তি হল। তারপর ছুটলাম আর ছুটি বাগানের উদ্দেশে। একটি আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি, অপরটি হল গিন্নীমায়ের বাগান, গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ইস্কুল এলাকায়। বিস্তীর্ণ বাগান, পুকুর, পুকুরের চারিপাশে ফলের বাগান, এবং এরই মধ্যে আবার একটি বাগান, নাম 'ঘেরা বাগান' অর্থাৎ চারিদিক পাকা পাঁচীল দিয়ে ঘেরা। এই ঘেরা বাগানের মধ্যে এককালে খুব ভালো ফুলের বাগান ছিল। কিন্তু ফলের বাগানের আওতায় ফুল বাগান তখন নষ্ট হয়েছে—কিছু কিছু ভালো গাছ বেঁচে আছে তাদের স্বাভাবিক পরমায়ুর জন্য। এখানে দু' রকমের দুর্লভ ফুল ছিল। মুচকুন্দ চাঁপা এবং গন্ধরাজ। এ ছাড়া ছিল জবা, টগর, গুলঞ্চ এই সব সাধারণ ফুল। বাড়ীর কাছে যে বাগানটি সেখানে গিয়ে দেখি সেখানেও সেই 'সাত ভাই চম্পা' গল্পের বাগানের অবস্থা; ফুল যে ক'টি আছে সে আছে উঁচু ডালে, নিচের ডালে ফুল বলতে নাই। কারা এসে এর আগেই তুলে নিয়ে গেছে। তিন ভাইবোনে এবার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম মাঠ ভেঙে। গ্রামের পশ্চিমে ইস্কুল এলাকায় গিন্নীমায়ের বাগান: এই এলাকাটি গ্রামের বসতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন নয়; মধ্যে আছে অনেকটা ধান ক্ষেত, কয়েকটা পুকুর। মাঝখান চিরে একটি অপরিসর অপরিচ্ছন্ন শড়ক আছে কিন্তু সে পথ ধরতে খানিকটা ঘুর হবে ব'লে মাঠে মাঠে ছুটে এসে উঠলাম বাগানের ধারে। চারিদিক পাঁচীল দিয়ে ঘেরা, দরজায় তালাচাবি বন্ধ, পাঁচীল ডিঙিয়ে ভিতরে যেতে হবে। থমকে দাঁড়ালাম। এমন সময় আমার অজানা—পাঁচীলের একটা ভাঙা জায়গা থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, হাতে সাজি; এবং আমাদের সামনে দিয়েই বোঁ বোঁ ক'রে ছুটে বেরিয়ে গেল। দেখলাম—আমাদেরই পাড়ার নিশাপতি এবং 'ভাইঝি'। ভাইঝির নাম প্রভা, কিন্তু সে বিশ্বসংসারে ভাইঝি বলেই পরিচিত থেকে গেছে সারা জীবন।

ভাইঝি এবং নিশাপতি ছুটে পালাল, আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম, কিছু বুঝতে পারলাম না। এমন সময় লাফ দিয়ে পাঁচীল ডিঙিয়ে এক শালপ্রাংশু মহাভুজ ধুপ্ শব্দে এপারে আমাদের সামনে পড়েই বললে—আব মিলা হ্যায়। পাকড়া গিয়া।

লোকটির নাম মহাবীর সিং। চমৎকার দেহ ছিল মহাবীরের। মহাবীর বাগানের মধ্যে ডন বৈঠক দিচ্ছিল এবং বাগানের ফলফুল পাহারা দিচ্ছিল।

নিশাপতিরা তা বুঝতে পারে নি। গিন্নীমা নতুন বন্দোবস্ত করেছিলেন। নিশাপতি এবং ভাইঝি ফুল তুলছে—এমন সময় মহাবীর ওপাশ থেকে দেখে ছুটেছে। নিশাপতি ও ভাইঝি ছুটে বেরিয়ে পড়েছে জানা ভাঙন দিয়ে। মহাবীর লাফ মেরে পাঁচীল ডিঙিয়ে এ পাশে পড়ে আমাদের পেয়ে ধরেছে। আব মিলা হ্যায়। চলো গিন্নীমাকে পাশ।

আমার মাথায় সে দিন রক্ত চ'ড়ে গিয়েছিল। ক্ষুদ্র জমিদার হলেও আমার বাবার এবং তাঁর প্রভাবে আমাদের বাড়ীর মর্য্যাদাবোধ ছিল যে কোন বড় জমিদার বংশের সমান। মহাবীরকে ধমক দিয়েই বলেছিলাম—হাত ধরো না আমার।

ধমক আমার ব্যর্থ হয় নি। মহাবীরকে শুনতে হয়েছিল কথা। সে এবার সুর নরম ক'রেই বলেছিল—ফুল চুরি করেছ কেন?

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। দেবতা পূজার জন্য ফুল তোলায় কোন বাধা আমাদের ওখানে কখনও ছিল না। দেবতা পূজার জন্য ফুল তোলায় বাধা দেওয়া সম্পর্কে একটি গল্প আমাদের ওখানে প্রচলিত ছিল। সে আমি জানতাম। গল্পটি হল এই।

এক রাজবাড়ীর বাগানে নাকি অজস্র ফুল ফুটত। বাড়ীতে ছিল বিগ্রহসেবা। ওই বিগ্রহের পূজার জন্য রাজা যত্ন ক'রে বাগান করেছিলেন। সেখানে একদিন এলেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁর ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে একটি ছোট বিগ্রহ মূর্ত্তি। রাজবাড়ীর বিগ্রহ যদি হয় শক্তির, তবে ব্রাহ্মণের বিগ্রহ বিষ্ণুর। আর রাজার দেবতা যদি বিষ্ণু হন তবে ব্রাহ্মণের বিগ্রহ ছিলেন মাতৃকা দেবতার।

ব্রাহ্মণ গ্রামপ্রান্তে আশ্রয় নিয়ে একটি কুটীর বাঁধলেন এই বাগান দেখে। এত ফুল! দেবতাকে তিনি প্রাণভরে ফুল দিয়ে পূজা করবেন। নিত্য ভোরে এসে এই ফুল তিনি তুলে নিয়ে যেতেন। এবং প্রাণ ভ'রে পূজা করতেন। এ দিকে রাজবাড়ীতে হ'ল ফুলের অভাব। রাজবাড়ীর দেবতা-পূজার ফুল নাই। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পাহারা বসালেন।

ব্রাহ্মণ ধরা পড়লেন।

রাজা বললেন—ব্রাহ্মণ হয়ে তুমি চুরি কর?

—চুরি? ফুল কি তোমার? যিনি ফুল ফোটান তাঁর জন্যেই আমি ফুল তুলি। এর ওপর তোমার অধিকার কোথায়?

রাজা বললেন—তোমার প্রগল্‌ভতার উপযুক্ত শাস্তি দিতাম যদি তুমি ব্রাহ্মণ না হ'তে। তারপর রাজা তাঁর পূজক ব্রাহ্মণদের আদেশ করলেন—ফুলগুলি কেড়ে নাও। এবং ব্রাহ্মণকে এ এলাকা থেকে দূর ক'রে দাও।

তাই হ'ল। রাজার আদেশ প্রতিপালিত হ'তে দেরী হল না।

রাজা প্রসন্ন মনে কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করলেন। এমন সময় দেবতার পূজক এল ছুটে—মহারাজ, আশ্চর্য্য ঘটনা।

—কি আশ্চর্য্য ঘটনা?

—প্রস্তর-বিগ্রহের চরণে ফুল দিলাম, বিগ্রহ পাথরের হাতখানি প্রসারিত ক'রে আমার হাতের ফুল নিয়ে রাখলেন নিজের মাথার উপর।

রাজা মন্দিরে গিয়ে বললেন—কর পূজা তুমি, আমি দেখব। আমার মনে হয় তোমার ভ্রম হয়েছে।

কিন্তু ভ্রম নয়, সত্য। পূজক বিগ্রহের চরণে ফুল দিতে হাত বাড়াতেই বিগ্রহের হস্ত প্রসারিত হ'ল, পাথরের হাত পূজকের হাতের ফুল নিয়ে মাথার উপর রাখলেন।

ঠিক এই সময় আবার আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল। বাগানের মালী ছুটে এল—মহারাজ! আশ্চর্য্য ঘটনা।

—কি?

—বাগানের সমস্ত গাছগুলি শুকিয়ে গেল। পাতা ম্লান হল, শুকাল,

ঝরে পড়ল। মহারাজ, বলব কি, পরীক্ষা ক'রে দেখতে গিয়ে দেখলাম, গাছগুলির কাণ্ডের মধ্যেও একবিন্দু রস নাই, সবুজের চিহ্ন নাই।

রাজা ছুটে এলেন বাগানে। দেখলেন—মালীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। একবিন্দু মিথ্যা বলে নাই সে। গোটা বাগানটি শুকিয়ে গেছে, এমন কি ঘাসগুলি পর্য্যন্ত।

রাজা বললেন—সেই ব্রাহ্মণ নিশ্চয় যাদুকর। ধরে আন তাকে।

ছুটল প্রহরীরা। কিন্তু কোথায় সে ব্রাহ্মণ? নাই সে। কোথায় চলে গিয়েছে।

রাজা রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন। তাঁরই গৃহ-দেবতা তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন—ফুল হল আমার পূজার জন্য সৃষ্টি। আমি শুধু তোমার মন্দিরেই নাই। যে আমাকে যেখানে পূজা ক'রে আমি সেখানেই আছি। ব্রাহ্মণের ঝুলিতে আমি আছি মাতৃ মূর্ত্তিতে। তাঁর পূজার জন্য তোলা ফুল তুমি আমার পায়ে দিতে এসেছিলে, আমি সন্তান মূর্ত্তিতে কি সে ফুল পায়ে নিতে পারি? মাথায় নিয়েছি। আর দেবতার পূজার জন্য ফুল তুলতে তুমি বাধা দিয়েছ, দাবী করেছ—বাগান তোমার, বৃক্ষ তোমার, লতা তোমার, পুষ্প তোমার; তাই শুকিয়ে গিয়েছে সে সব। দেবপূজার জন্য ফুল তুলতে কারুর সম্মতি নিতে হয় না, পুষ্প-বৃক্ষের পরিচর্য্যায় তোমার অধিকার আছে কিন্তু পুষ্পে তোমার অধিকার নাই।

ঠিক এই কারণেই না বলে কারুর বাগানে পূজার ফুল তোলাকে চুরি ভাবতাম না। নইলে নিশ্চয় আমি যেতাম না। এ শিক্ষাটি আমাদের ছিল কুলগত শিক্ষা। আমার বাল্যে বা কৈশোরে পরের গাছে ফল চুরির কাজে কখনও আমি যাইনি। চুরি করেছি—নিজেদের বাড়ীর গাছে।

সেদিন মারাত্মক অভিমান হয়েছিল, ক্রোধ হয়েছিল। তাই নিজেই মহাবীরকে বলেছিলাম—নিয়ে চলো তোমার গিন্নীমায়ের কাছে।

মহাবীরের সঙ্গে গিন্নীমায়ের বাড়ীতে তাঁর সামনে এসেই তাঁকে কোন কথা বলতে সময় বা সুযোগ দিইনি; সাজির ফুলগুলি তাঁর সামনে ঢেলে উজাড় ক'রে দিয়ে বলেছিলাম—আপনাদের ফুল আমি তুলি নি।

তুলতে গিয়েছিলাম। পূজার ফুল তুলতে হুকুম নিতে হয় না জানতাম। "জানলে, তাও যেতাম না। আমি আপনাদের বাগানে ঢুকিনি পর্য্যন্ত।" এ ফুল আমাদের বাগানের। আপনাদের বাগানে যারা ফুল তুলেছে তারা পালিয়েছে। আমরা ঢুকতে যাচ্ছিলাম, এই চাপরাশী আমাদের ধ'রে এনেছে। তারই জরিমানা এই আমাদের বাগানের ফুল এই আপনাকে দিয়ে আমি চললাম।

বলেই চলে এসেছিলাম।

পিছন থেকে অবশ্যই গিন্নীমা বারবার ডেকেছিলেন। আমি সাড়াই দিই নি। তারপর গিন্নী সেই ফুল এবং সেই চাপরাসীকে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের বাড়ী। এ কি লজ্জার কথা! ছি-ছি-ছি! মা-পিসীমায়ের কাছে এসে তিনি অনেক লজ্জা প্রকাশ ক'রে গিয়েছিলেন সেদিন।

দীর্ঘকাল পরে এই ঘটনায়—লুডি চোর ব'লে আমাকে পাকড়ে গিন্নী-মায়ের দরবারে হাজির করতে চেয়েছিল শুনে পিসীমায়ের সেই কথাটা মনে পড়ে গেল এবং তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন কথাটা।

যাই হোক এবারও এই ঘটনার পর ঠিক সন্ধ্যেবেলা গিন্নীমায়ের লোক এ'ল। গিন্নীমা নিজেও এসেছিলেন কিন্তু বাড়ী ঢোকেন নি, বাড়ীর পিছনে আমাদের সদর বাড়ীতে [illegible]। এল শ্রীপুরের বউ তার সঙ্গে সেই জাঁহাবাজ সাঁওতালনী লুডি। তার মাথায় মস্ত এক ঝুড়ি আম। আর তার পিছনে গৌরদাস চাকর। তার হাতে কিছু মিষ্টান্ন।

—কে গো?

—আমি শ্রীপুরের বউ।

—এস। এস। কি ব্যাপার?

—আমাদের জামাইয়ের জন্যে আম মিষ্টির তত্ত্ব নিয়ে এসেছি।

—আম মিষ্টির তত্ত্ব? না আমচুরির দক্ষিণে?

শ্রীপুরের বউ কথাটায় প্রথম শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিক ভাবেই। সে গালে হাত দিয়ে বলেছিল—দেখ দেখি মা, হারামজাদী সাঁওতালীর কাণ্ড? আক্কেল নাই, বুদ্ধি নাই—

এ ক্ষেত্রে পিসীমা হেসে উঠেছিলেন।—আমি সব শুনেছি শ্রীপুরের বউ!

লুডি এবার পায়ে ধরতে এল—হামার দোষ হ'ল পিসীমা!

পিসীমা লুডিকে একটাকা বকশিস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তা' ছেড়ে দিলি কেন? জামাইকে পিসীমার কাছে ধরে নিয়ে গেলে বেশী বকশিস পেতিস্!

বাড়ীর পিছনে [illegible]-মা খুক-খুক ক'রে হেসেছিলেন।

ঠিক এর দিন-দুই পরেই, কি দিন-চারেক পরেই আবার লেগে গেল তুমুল গণ্ডগোল!

আবার মাস দুয়েক পরেই একদিন এমনি একটা বিচিত্র ঘটনা উপলক্ষ্যে দুপক্ষের মধ্যে একটি মধুর সংযোগ স্থাপিত হল একদিনের জন্য।

আমি পড়ে গেলাম রেল রাস্তার উপর, লাইনের পাশে, লাইনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এবং একখানা ট্রেণ চলে গেল লাইনের উপর দিয়ে, ট্রেণ-খানার ফুটবোর্ডটা আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। রেললাইনের সঙ্গে আমার শরীরের তফাৎ ছিল ফুটখানেক, এক হাতের আঙুলগুলি ছিল লাইন ছুঁয়ে।

ঘটনাটির একটি দিক যেমন কৌতুকজনক অপর দিকটি তেমনি মারাত্মক না হোক রোমহর্ষক। মারা যাইনি বলেই মারাত্মক নয়। সামান্য এদিক ওদিক হলেই কিন্তু আমার জীবনান্ত ঘটত সেদিন। এর কারণ নিছক আমার কৈশোর-চাপল্য; ষোল বছরে যদি যুবা বলতে হয় তবে বলব সদ্য-যৌবনে-উপনীত আমার তরুণ মনের উদ্ভট খেয়াল। কিন্তু আমাদের দেশের সমাজ প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এর হেতু আমার পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল নির্ণয় করলেন, কোন্দল পরায়ণা কোন এক বিধবার অভিশাপ। এবং আমার এই অভাবনীয় রূপে রক্ষা পাওয়ার হেতু নির্ণয় করলেন আমার পত্নীর আয়তির পুণ্য ও শক্তি। সমস্ত ঘটনাটা আমার উপর দিয়ে গেলেও আমি হয়ে গেলাম নেহাতই 'ফাউ'।

যে দিনের ঘটনা সে দিন দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর আয়তি পুণ্যবতী আমার স্ত্রী উমা এবং আমার বোন কমলা দুই ননদভাজে আমার

শ্বশুরদের ছাদে উঠেছিলেন। আলিসায় ঠেস দিয়ে গল্প করছিলেন এবং পান চর্ব্বণ করছিলেন। যে সময়ের কথা সে সময়ে আমার বোন পান খেতে অভ্যস্ত ছিল না। আমার মা এ দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। মেয়েকে তিনি পান খেতে দিতেন না। সে অভ্যাসটা তখনও আমার বোনের বজায় ছিল। আমার স্ত্রী ছেলে বেলা থেকেই পান খেত। দেখিয়ে খেত, চুরি ক'রে খেত, আচলের খুঁটে পান বেঁধে রাখত, নিজের ভবিষ্যত কল্পনার-বিলাসে পানের সঙ্গে জর্দ্দা সুর্ত্তি দোক্তা খাওয়া স্বপ্ন দেখত।

ধাত্রী দেবতার এক জায়গায় গৌরীর কার্য্যকলাপের মধ্যে দেওয়ালের ছবি পরিষ্কার করতে গিয়ে ছবি ভেঙে পড়ার ঘটনা বর্ণনার মধ্যে এঁর উল্লেখ আছে। গৌরী এক সঙ্গে পাঁচ ছ'টা পান মুখে পুরে সামলাতে পারেনি, পানের পিক্ গড়িয়ে কাপড়ে পড়েছে; তাই দেখে সকলেরই প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছে ভাঙা কাঁচের ফলায় কেটে রক্তাক্ত হয়ে গেছে ছোট বধূটি। ছবির কথাটি বানানো হলেও, পান খাওয়া সম্পর্কে অতিরঞ্জন হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। সে যাক।

এখন ঘটনার কথাই বলি। ছাদে আলিসায় দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে পানের পিক ফেলতে হচ্ছিল। এত পিক গিলে শেষ করা যায় না। ফেলছিল মুখ ফিরিয়ে ছাদের উপরেই। কারণ, যে দিকের আলিসায় ভর দিয়ে তারা দু' জনে দাঁড়িয়েছিল—সে দিকে এক বিধবা ভদ্র মহিলার বাড়ী; দুই বাড়ীর মধ্যে হাত দুয়েক প্রশস্ত একটি গলি। এই গলিতেই ছাদের জল পড়ে। ছাদের জল ছাড়া অন্য কোন কিছু পড়লেই এই ভদ্রমহিলা তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভদ্রমহিলা আমাদের গ্রামে কোন্দলের জন্য বিখ্যাত। সেকালে পাড়াগাঁয়ে কোন্দল কলহ একটি যাকে বলে আর্ট, তাই ছিল। এমনভাবে গুছিয়ে গুছিয়ে কবিতার মত ছন্দোবদ্ধভাবে সর্ব্বনাশ কামনা করা সহজ নয়। "স্বামী যাবে, পুত্র যাবে, ভাই যাবে, ভাবী যাবে, ঘর পুড়বে, দোর পড়বে, পথে দাঁড়াবে। হাত যাবে, চোখ যাবে, কাণা হবে; ভাতের থালায় হাত দিতে মাটিতে হাত ঘষবে; ভিক্ষের ভাতে ছাই পড়বে। নালায় থালায় পা পড়বে; যে

গতরের তেজে লঘুগুরু মানে না সেই গতর চূর্ণ হবে। ছ' মাসকে ধরবে ময়লায় মাটিতে মুখ ঘষবে মুখে পোকা পড়বে।" এ তো হ'ল সাধু সংস্করণ। এর আবার ব্রাত্য সংস্করণ আছে। "ভাতারের মাথা খা-লো, বেটার মাথা খা-লো, ভাইয়ের মাথা খা-লো, ভাবী-সাবি মরুক লো।" এর নিদর্শন হাসুলী বাঁকের উপকথায় নিখুঁতভাবে দেওয়া আছে।

হিসেব করে দেখলে এর মধ্যে ছন্দ একটা পাওয়া যাবে এবং দেখা যাবে সর্ব্বনাশের এমনি গোলাকার গণ্ডী টানা হয়েছে চারিদিকে যে কোন একটি ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়বার কোন পথ নেই। হারাধনের দশটি ছেলের ছড়ায় শেষ ছেলেটি মনের দুঃখে বনে গিয়েছিল, মরেনি তাই আবার একটি থেকে দশটি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' জলে ভেসে গিয়েছিল, সে মরে গেল কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নি এই ফাঁকের বাঁকে দামোদর 'মৃন্ময়ী'কে উদ্ধার ক'রে সুখের সংসার গ'ড়ে দিয়েছেন। আমাদের দেশে কোন্দলদক্ষ যাঁরা তাঁদের দৃষ্টি এদিক দিয়ে একেবারে নির্ভুল। আগে স্বামীর মৃত্যুর অভিশাপ দিয়ে তবে ছেলের মৃত্যুর অভিশাপ দেন, যাতে এক ছেলে হারিয়ে অন্য সন্তান প্রাপ্তির আশা না-থাকে। স্বামী পুত্রের পর আশ্রয়দাতা ভাই, তখন ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যবস্থা করেন। এমনিভাবে হিসেব করলে দেখতে পাওয়া যাবে কোন দুঃখ দুর্দ্দশা থেকেই পরিত্রাণ নেই।

শুধু এইখানেই শেষ নয়, এই গালিগালাজগুলিকে প্রাণবন্ত করবার জন্য উচ্চারণের বিচিত্র ভঙ্গি আছে এবং তার সঙ্গে আছে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি। অভিনয়ের কালে অঙ্গভঙ্গি, হাত-পা-নাড়া, চলা-ফেরা যেমন বক্তব্যকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলে ঠিক তেমনি আর কি। কখনও সামনে ঝুঁকে দুলে-দুলে, কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে দুই হাত উপরে তুলে, কখনও কখনও বা নেচে নেচে গালিগালাজ দেওয়ার রীতি ছিল সেকালে। আজকালকার চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতারাও এমন গরম করে তুলতে পরেন না আসর।

এই ভদ্রমহিলা ছিলেন একজন নিপুনতমা কোন্দলপারদর্শিনী। গল্পে মত্ত হয়ে পড়ে কখন যে আমার পত্নী পচ ক'রে একদফা পিক্ ওই গলির

দিকে ফেলেছিল—সে তার খেয়াল ছিল না। খেয়াল হ'ল ওই ভদ্রমহিলার তীব্র প্রতিবাদে।

—বলি, হ্যাঁ লা! কে লা? বলি তুই কে লা? কোন গরবিনী সোহাগিনী-রাজনন্দিনী লা? বলি, কোন গরবে এমন ক'রে পানের পিক ফেলিস লা?

আমার পত্নী অত্যন্ত ভীতু মানুষ কিন্তু দোষ এই যে গোড়াতেই পিছপাও হন না। প্রথম এক দফা তেড়েফুড়ে উঠতে চেষ্টা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থাৎ শতকরা নিরেনব্বুইটি ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষের কাছে পরাজয় মেনে ঘরে ঢোকেন, কখনও কখনও ক্ষমা চান, কখনও দেবতাকে মানত মানেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি, ওই গলিটির উপর তাঁর পৈত্রিক মালিকানা স্বত্বের জোরে একবার ঝেঁকে উঠলেন—কেন? আমাদের গলিতে পানের পিক ফেলেছি তাতে হয়েছে কি? তোমার ঘরে তো ফেলিনি!

—ফেলিস নি? পিকের ছিটে আমার ঘরের দেওয়ালে লাগেনি? দেওয়াল এঁটো হয়নি? আর হ্যাঁ লা, হারামজাদী; তোদের গলি? তোদের একার গলি কিসের লা? আমার ঘরের ছাদের জল পড়ে ওই গলিতে, ও গলিতে আমার ভাগ নাই না-কি লা?

—আমাদেরও তো ভাগ আছে! সেই ভাগে ফেলেছি আমি বেশ করেছি! আর দেওয়াল কখনও এঁটো হয়?

—হয় না?

—হয়? এ কথা তো কোন কালে শুনি নি!

—শুনিস নি? কি ক'রে শুনবি? মাছ ভাত খাস, সিঁথীতে সিঁদুর, হাতে শাখার কোলে সোনার চুড়ি, পরণে নীলাম্বরী, পায়ে পায়জোর, ঝমঝমিয়ে চলিস, আচার আচরণের বালাই নাই, ধরাকে ভাবিস সরাখানা, জানবি কি ক'রে, শুনবি কি ক'রে। আমি যে বিধবা লা। আমার মত তুই হ তখন জানবি। তখন বুঝবি। এই তিন দিন, তিন দিন, তিন দিনের মধ্যে তুই বুঝবি, জানবি। আমি বললাম, আমার বত্রিশখানা দাঁত, আমার জিভ নাকের ডগায় ঠেকে, আমার কথা আফলা হয় না। ফলবে, ফলবে, ফলবে। তিন দিন, তিন দিন, তিন দিন।

হে বাবা বুড়ো শিব, হে বাবা ধর্ম্মরাজ, বিচার কর, সাক্ষী থাক।

এবার বালিকা দুটি সভয়ে দ্রুতপদে ছাদ থেকে নেমে এসেই ক্ষান্ত হল না। ওই বাড়ী থেকে একেবারে পালিয়ে এল মাতামহীর বাড়ী, সেখান থেকে অভিসম্পাত শুনতেও পাওয়া যায় না এবং সেখানে প্রবল ভরসা দিদিমা আছেন। কিন্তু কথাটা বলতে পারলে না। চেপে গেল।

এ দিকে বিকেল বেলা পাঁচটার পর বেড়াতে বেরিয়েছি আমি। তিন সঙ্গী সেদিন। আমি, দ্বিজপদ এবং বৈদ্যনাথ। দ্বিজপদ আমার সাহিত্যের মধ্যে আছে, কবি উপন্যাসে সে বিপ্রপদ; আমার কালের কথার মধ্যেও দ্বিজপদের কথা আছে। তার সঙ্গে কোথায় ছিল আমার একটি মধুর মিষ্ট সম্পর্ক জানি না, তবে ছিল। বৈদ্যনাথ গ্রামের অন্যতম প্রধান জমিদার স্বর্গীয় হিরণ্যভূষণ বাবুর ছেলে। বৈদ্যনাথ বেঁচে আছে। তার সঙ্গে বাল্য কালের প্রীতির সম্পর্ক আজও আছে আমার। ভারী ভাল মানুষ। বেচারা একালের বিদ্যায় পারঙ্গম নয় এই তার জীবনের খুঁত। এই খুঁতটা সে নিজেই অনুভব করে অতিরিক্ত মাত্রায়, সেই কারণে নিজেকে সে আজীবন ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে রাখলে। আমি কিন্তু মনে করি তার মধ্যে আছে এক দুর্লভ মানুষ। যেমন তার মর্য্যাদা বোধ, তেমনি তার মধুর প্রকৃতি; মানুষের কাজে কর্ম্মে এমন বন্ধু আর পাওয়া যায় না।

কৈশোরে সে-কালে স্কুলে পরস্পরের সঙ্গে অনেকটা পার্থক্য স্বত্বেও আমরা ছিলাম ঘনিষ্ট বন্ধু। একসঙ্গে বেড়াতাম, একসঙ্গে খেলতাম। যৌবনে এক সঙ্গে অভিনয় করেছি। সে দিন তিনজনে বেড়াতে বেরিয়ে মাইল দুয়েক দূর নদীর ঘাটে চলে গেছি। পথ আছে পাকা শড়ক। আমরা কিন্তু হাঁটি রেললাইন ধ'রে। ম্যাকলাউড কোম্পানীর ছোট লাইন। স্টেশন থেকে একশো কি দেড়শো গজ সমতল ভূমির উপর রেললাইন চলার পরেই উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে নদীর ধার পর্য্যন্ত।

'কবি উপন্যাসে এই বাঁধের উপরের লাইনের বর্ণনা আছে। এই পথটির একটি এমন কোন সৌন্দর্য্য আছে যা আমাকে চিরদিন গভীর ভাবে আঁবর্ষণ করে। শুধু আমাকেই নয়, অধিকাংশ লোককেই করে। পাকা শড়ক ফেলে এই বাঁধের উপর দিঁয়েই লোকজন বেশী হাঁটে। সে দিনও এই পথ ধ'রে নদীর ধারে বসে অপরাহ্নটা কাটিয়ে সন্ধ্যার মুখে উঠলাম। ধরলাম এই লাইনের পথ। তিনজনে গান গাইতে গাইতে ফিরছিলাম সে কথা আজও মনে আছে। তখন সন্ধ্যার মুখে আমাদের গাইবার একটি অত্যন্ত প্রিয় গান ছিল।

সম্মুখে রাঙা মেঘ ক'রে খেলা
তরণী বেয়ে চল না—হি বেলা।
আধ আধ দেখা যায় কনক ভূমি-
সেথা কি গো তরী বেয়ে যা—বে তুমি।

গলা ছেড়েই গান গাইছিলাম তিন জনে।

হঠাৎ ট্রেনের বাঁশী বেজে উঠল।

তখন সন্ধ্যার সময় একটা ট্রেণ ছিল; আমদপুর থেকে যেত কাটোয়া, লাভপুরে আসত সাড়ে ছ' টার সময়। বুঝলাম ট্রেণটা ছাড়ল লাভপুর স্টেশন। আমরা তিনজনেই নামলাম লাইনের উপর থেকে। লাইনের উপর থেকে মানে লোহার লাইনের উপর থেকে। তখন ওই লোহার লাইনের উপর দিয়ে হাঁটা আমাদের একটা নেশা ছিল। একটি লাইনের উপর পা ফেলে চলে আসতাম সার্কাসের তারের উপর দিয়ে হাঁটার মত। শূন্যে ঝোলানো তারের উপর হাঁটার সঙ্গে অবশ্য তুলনাই হয় না, এর তবুও এ হাঁটা খুব সোজা নয়। ছোট লাইনের সরু লাইনের উপর হাঁটা খুব সোজা নয়। যাই হোক রেল লাইন থেকে নেমে পাশের পায়ে-চলা পথের রেখা ধ'রে হাঁটতে সুরু করলাম। ছোট লাইনের বাঁধ, বড় লাইনের মত প্রশস্ত নয়, সংকীর্ণ। লাইনের উপর ট্রেণ যখন চলে তখন যথেষ্ট সাবধান হ'তে হয়। ট্রেণের বাতাস গায়ে লাগে। দরজা খোলা থাকলে কথাই নেই। অধিকাংশ লোকেই পথ ছেড়ে ঢালের গায়ে নেমে দাঁড়ায়। আমরা

নেমে দাঁড়াই না। খানিকটা গ্রামীন ব্যক্তিদের সাবধানতাকে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করেই দ্রুতধাবমান ট্রেনের সঙ্গে মাত্র হাত দুয়েক ব্যবধান রেখে স্বচ্ছন্দে পথ হাঁটি। অনেক সময় ওই পায়ে-চলা সংকীর্ণ পথটির উপর দিয়ে অনায়াসে বাইসিক্ল চ'ড়েই চলি। যে সব দুঃসাহসীরা ট্রেণ দেখেও সাইক্ল থেকে নামে না আমি ছিলাম তাদেরই একজন।

আমরা স্টেশনের দিকে আসছি, ট্রেণ স্টেশন থেকে ছেড়েছে। স্টেশন কম্পাউণ্ডের শেষ যেখানে হয়েছে সেখানে একটা লোহার পোষ্ট পোঁতা আছে, গায়ে একটা বোর্ড আঁটা আছে, তাতে লেখা আছে Shunting Limit.

আমরা হাঁটছি—সর্ব্বাগ্রে আমি, তারপর দ্বিজপদ, তারপর বদ্দি বা বৈদ্যনাথ। ট্রেণটার ইঞ্জিন গজ পাঁচেক দূরে, Shnnting Limit গজ পঁচিশেক দূরে। হঠাৎ আমার কি খেয়াল চাপল কে জানে? হয় তো বা ট্রেণের গতি ও দূরত্ব নিয়ে যে সব অঙ্ক কষতাম ইস্কুলে তার কিছু প্রভাব ছিল। পিছন ফিরে দ্বিজপদ এবং বৈদ্যনাথকে বললাম—চল ছুটব। ট্রেণটার শেষ গাড়ী অর্থাৎ গার্ড ভ্যানটা Shunting Limit পার হ'তে হ'তে আমরা Shunting Limit-এর Post-এ গিয়ে পৌছুব।

ওরাও বললে—চল। ছোটো।

ছুটলাম।

পাশ দিয়ে বিপরীত মুখে ট্রেণখানা ছুটছে। বাতাস লাগছে সর্ব্বাঙ্গে। কানে আসছে বিচিত্র ট্রেণের শব্দ। ঝ-ঝ-ঝং—ঝ-ঝং-ঝ-ঝং। আমার দৃষ্টি সম্মুখের দিকে আবদ্ধ, তবুও চলন্ত ট্রেণের কামরার আলো জানালা দিয়ে আমার মুখে ছটা ফেলে চলে যাচ্ছে। আমি ছুটছি। ওই যে গার্ডের গাড়ীর আলো। মনে হ'ল-পারব না পৌছুতে ঠিক সময়ে। গার্ডের গাড়ী আগেই শান্টিং লিমিট পার হয়ে যাবে। আমি গতিবেগ বাড়িয়ে দিলাম। কি হবে জানি না তবু খেয়াল, পৌছতে হবে, পৌছুলেই আমার জয়। নইলে আমার হার। সে নেশা প্রচণ্ড নেশা। আরও গতিবেগ বাড়াতে চেষ্টা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ে জুতোর মুখে কিসে লাগল প্রচণ্ড আঘাত, বাধা।

মুহূর্ত্তে পড়ে গেলাম। কি ভাবে পড়লাম, কি আঘাত পেলাম, কোথায় পড়লাম এ সবের কোন বোধই রইল না। সে বোধ হয় আধ মিনিট কি এক মিনিট। তারপরেই কানে শব্দ এল—সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করলাম—আমার কানের পাশে চলছে লাইনের উপর ট্রেনের চাকাগুলি,—মাথার উপরে চলছে লম্বা টানা ট্রেনটার ফুট বোর্ড। একখানা দুখানা তিনখানা—। তারপর আর নাই। লাইনের উপর চাকা চলার শব্দ চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে, একটু দূর, আরও একটু দূর, আরও দূর, আরও দূর। আরও অনেক দূর। ক্ষীণশব্দ শুনছি লাইন বেয়ে আসছে কাছে। হঠাৎ কানে এল মানুষের ডাক—তারাশঙ্কর! শঙ্কর!

দ্বিজপদ এবং বদ্যি ডাকছে।

কি হয়েছিল কে জানে—অসাড় হয়েই পড়ে ছিলাম এতক্ষণ, এতটুকু নড়িনি। নড়লে বাঁচতাম না। মাথা তুলবার চেষ্টা করলেই ফুটবোর্ডের নিচের বোল্টের ঘায়ে খুলিটা ভেঙে চুরমার হ'য়ে যেত। হাত নাড়লে চাকায় টানত। একখানা হাত ও মাথাটা বিচিত্রভাবে পিছলে গিয়ে পড়েছিল লাইনের পাশের স্লিপারের উপর। নড়িনি তাই বেঁচেছি। পথের উপর রেলওয়ের সার্ভে বিভাগ মাপের চিহ্ন একটা বাঁশের খুঁটি পুঁতেছিল—তাতেই চোট খেয়ে পড়েছি এমনভাবে। বৈদ্যনাথ এবং দ্বিজপদের ডাক শুনে সম্বিত ফিরল। এতক্ষণ একটা বিচিত্র অবস্থা গিয়েছে। ভয় ছিল না, বোধ ছিল না, শুধু চলন্ত ট্রেণের আভাস অনুভব করেছি, শব্দ শুনেছি। এবার সম্বিত ফিরে পেয়ে উঠবার চেষ্টা করলাম। মনে হল সর্ব্বাঙ্গটা মাটির সঙ্গে কাঁকরে-পাথরে গেঁথে গিয়েছে। ওরা এতক্ষণ মহাভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। চোখে দেখেছিল আমার মাথাটা ট্রেণের ফুটবোর্ডের তলায় ঢাকা। ভেবেছিল কাটা পড়েছি। অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে থেমে গিয়েছিল। এতক্ষণে আমাকে গোটা পেয়ে ওরা টেনে তুললে।

বাঁ দিক চেপে পড়েছিলাম। হাঁটু ও কনুইয়ের কাপড় জামার অংশ নাই, চামড়া নাই, মাংস থেঁতলে গেছে। জুতোর ডগাটা ফেটে গেছে। আমি বেঁচেছি।

ওরা বললে—ওরা গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিল এতে বিপদ আছে। ওরা থেমে গিয়েছিল। আমাকে প্রাণপণে ডেকেছিল। ছুটোনা, ছুটোনা, ছুটোনা। কিন্তু—। তারপর হঠাৎ।

তারপর হঠাৎ ওরা দেখলে আমাকে পড়ে গিয়ে চলন্ত ট্রেণের তলায় ঢুকে যেতে। ওরা ভুল দেখে নি। হুচোট খেয়ে পড়ে কি ভাবে কেমন ক'রে যে চলন্ত ট্রেণের ফুটবোর্ডের তলায় ঢুকে গিয়েছিলাম এ বিশ্লেষণ ক'রে বুঝে ওঠা মুস্কিল। বোধ করি আছাড় খেয়ে পড়েও গতিবেগে হেঁচড়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম। এই অবস্থা দেখে ওরা মুহূর্তে বজ্রবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভেবেছিল ট্রেণটা চলে গেলে ছিন্নমুণ্ড অবস্থায় আমাকে দেখতে পাবে।

যাই হোক, বেঁচে গিয়েছি দেখে ওদের দুজনের যত আনন্দ, আমার শরীরের বাঁ-দিকে তত যন্ত্রণা, তত জ্বালা। ওরা দুজনে আমাকে ধরে রেল কোম্পানীর কুয়োর ধারে এনে সেই সমস্ত ক্ষতে জল-সিঞ্চন ক'রে জ্বালাযন্ত্রণা দ্বিগুণিত করেই ক্ষান্ত হ'ল না, রেল কোম্পানীর ডাক্তার নরহরিবাবুর ওখানে টিঞ্চার আয়োডিন প্রয়োগ ক'রে শতগুণিত ক'রে তবে ছাড়লে। এবং ওদের ব্যাখ্যাতেই আমার এ এক মহা-পরিত্রাণ বলে ব্যাখ্যাত হ'ল। বললে—এ বাঁচা অসম্ভব বাঁচা। কি ক'রে বাঁচল ভগবান জানেন।

তার ব্যাখ্যা করলেন গ্রামের বিজ্ঞজনেরা। সে ব্যাখ্যার কথা আগেই বলেছি। আমার পত্নীটির আয়তির শক্তি, সিঁথীর পরে সিঁদুর হয়েছে পাকা, হাতের পরে বজ্রকঠিন হয়েছে শাঁখা। আর এই বিপদে পড়ার হেতু আমার বয়সের চাঞ্চল্য নয়, আমার বুদ্ধিচাপল্য নয়, হেতু হ'ল ওই বিধবা মহিলাটির বত্রিশটি দন্ত-বিশিষ্ট মুখের তীক্ষ্ণ রসনায় উচ্চারিত অভিশাপ।

এই সুখটি অবলম্বন ক'রে আবার একদিন দুপক্ষ কাছাকাছি এসে পাশা-পাশি দাঁড়ালেন। পূজা দিলেন দেবস্থলে, আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সধবাদের আহ্বান ক'রে 'ঠারগুয়া' অর্থাৎ পান সুপারী দিয়ে বরণ করা হ'ল, তাঁদের

সিঁথীতে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হ'ল, তাঁরা প্রত্যেকেই আমার পত্নীর সীমন্তে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন।

আমার স্ত্রী আজও এ অহঙ্কার ছাড়েন নি। আমার অসুখ-বিসুখ হ'লে তিনি জোর করেই বলেন—আমি না মরলে তো কোন বিপদ হবে না।

উনিশ শো ত্রিশ সালে জেল থেকেই চোখের অসুখ নিয়ে এসেছিলাম। ভুগেছি প্রায় বছর পাঁচেক। এর মধ্যে একজন তান্ত্রিক জ্যোতিষী এসেছিলেন আমাদের গ্রামে। তিনি আমার কোষ্ঠী বিচার ক'রে অনেক কথা ব'লে ছিলেন। বুদ্ধি ও যুক্তির পথে কোষ্ঠীবিচারকে আমি মানি না। তবুও সত্যের খাতিরে বলতে হবে সে গণনার অন্তত ষাট-সোত্তর ভাগ মিলে গিয়েছে। এই জ্যোতিষী আমার চোখের অসুখের কথাও বলেছিলেন। বলেছিলেন—ইনি কি এখন চোখের অসুখে ভুগছেন? এবং প্রতিকার হিসেবে কি জানি যেন কোন গ্রহের জপ করতে বলেছিলেন। আমি চিকিৎসা করিয়েছি, তিনি গ্রহের জপ করেছেন; চোখ ভাল হয়েছে। তিনি বলেন—ওই জপ, জপের জোরেই চোখ সেরেছে তোমার। আজও তিনি সে জপ করেন এবং বলেন—দেখো, চোখের অসুখে আর কখন তুমি ভুগবে না।

এখনকার কথা থাক্। তখনকার কথা বলি। ১৯১৫ সাল তখন। তখনকার দিনে এ কথা নিয়ে পরিহার করবার মত মন বড় কারও ছিল না। সে দিন ওই ব্যাখ্যাই সকলে নির্ব্বিচারে মেনে নিয়েছিল। এর মধ্যেই পাওয়া যাবে ভাবীকালে কোন্ বিচিত্র পথে ওই বিচিত্র বিবাদের অবসান হয়েছিল।

বার

এরপর আবার কি যেন একটা তুচ্ছ ছুঁতো নিয়ে ঝগড়া উঠল ঘনীভূত হয়ে। ঠিক মনে নেই। তবে এমনি ধরণের কিছু। যেমন হয় তো এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই আমাদের বাড়ীতে বধূর অতিরিক্ত পান খাওয়ার সমালোচনা হ'ল।—এত পান খাওয়া, এই বয়সে এ কি ভাল?

ও বাড়ীতে রিপোর্টারের রিপোর্ট গেল—এত পান খাওয়া? মা গো! বয়স-কালে তা-হ'লে হবে কি? এই বেতরিবত শুধু দিদিমার আদরে! এ বাড়ীতে এলে পান খাওয়া ঘুচিয়ে তবে ছাড়ব।

ও বাড়ীতে কি কথা হ'ল কে জানে, এ বাড়ীতে টেলিপ্রিণ্টারে মুদ্রিত হয়ে এল—ঘুচিয়ে ছাড়বে! ঘোচালেই হ'ল আর কি? দাসী বাঁদী কিনা? এমনি নিয়েছে মেয়ে? পেটে কিল মেরে পান আদায় করবে।

এরপর আর সম্প্রীতি থাকে কি ক'রে?

জোর করে ছাড়ালে পান খাওয়া ছাড়তে কে রাজী হয়? আর বেশী পান খেতে বারণ করলে পেটে কিল খেতেই বা রাজী কে হয়? সুতরাং ঝগড়া বেড়ে চলে।

এরই মধ্যে হয়ে গেল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা।

মনে পড়ছে আমাদের সহপাঠী, বর্ত্তমানে লাভপুর ইস্কুলের শিক্ষক, হেলারাম—গায়ে হলুদ, চোখে কাজল, হাতে হলুদ-মাখা সুতো নিয়ে, বিয়ের ঠিক পরদিনই গেল পরীক্ষা দিতে।

পরীক্ষা দিতে সিউড়ি গেলাম।

সেখানে দেখা হ'ল একজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে, সে নাম করলে নলিনী বাগচীর। বারবার নলিনী দা'র দোহাই দিয়ে কথা বলছিল সে। ভাল ভাল কথা। জিজ্ঞাসা করলাম—নলিনী-দা' কে?

সে বললে—আমাদের ওখানকার, কাঞ্চননগর-কাপ খেলা হয় যেখানে, নিমতিতা অঞ্চলের নাম শুনেছেন?

শুনেছি বই কি। শুধু নিমতিতা কাঞ্চননগর নয়, নলিনী বাগচীর নামও জানি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে কবিতা লিখে দেখিয়েছিলাম। তিনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। উত্তরে তাঁর কথা মত আরও কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলাম।

হ্যাঁ। তিনি। তিনি আর বড় দেশে আসেন না। স্বদেশী করেন কি না। দেশে পুলিশ কড়া নজর রেখেছে। এলেই ধ'রে ফেলবে। তাঁরই কথা বলছি।

মনে পড়ে গেল তাঁকে।

পরীক্ষা দিয়ে দেশে ফিরে তাঁকে মনে করে অকারণে একদিন রামপুরহাট গিয়েছিলাম। নিতান্ত অকারণে।

এ সময়ে কিন্তু রামপুরহাট সিউড়ি, এ সব জায়গাগুলি ছাত্রজীবনের পক্ষে খুব স্বাস্থ্যকর ছিল না। যাঁরা নাকি জীবনে মেধাবী ছাত্র, প্রতিভাবান, তাঁরা পরীক্ষার ফল ভাল করেছেন কিন্তু জীবনে যতখানি মানুষ হতে পারতেন, তা হতে পারেন নি।

এই ১৯১৪।১৫।১৬ সালের মফঃস্বল শহর বিচিত্র স্থান ছিল। শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি লেখাপড়া শিখিয়েছে, পরীক্ষায় পাশ করিয়েছে, কিন্তু চরিত্রের উপর বিদ্যা ও শিক্ষার প্রভাব পড়তে পায়নি। সিগারেট তো নির্দোষ বস্তু, সিগারেটের মধ্যে চলত চরস। ভাং অর্থাৎ সিদ্ধি ছিল উপাদেয় পানীয়। ছেলেরা বলত সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে। সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি বাড়ুক বা না বাড়ুক, ক্ষিদে বাড়ত; এক একটি ছেলে ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানি রুটি খেয়ে তবে উঠত। মধ্যে মধ্যে দু' চারজন পাগল হয়ে যেত। এমন একটি ছেলের কথা আমি জানি। আমাদের থেকে এক বছর কি দু' বছরের পরের ছাত্র। বয়সে সমবয়সী। নাম বৈদ্যনাথ মণ্ডল। হুগলী নর্মাল স্কুলে খুব ভালভাবে পাশ করে এসে ইংরিজী পড়তে ভর্তি হল। বৈদ্যনাথ ছিল প্রতিভাবান ছাত্র। অঙ্কে সংস্কৃতে বাংলায় ইতিহাসে ইস্কুলের শিক্ষকদের সমকক্ষ। ইংরাজীতেও অল্পদিনেই সে পাকা হয়ে উঠল। শিক্ষকেরা আশা করলেন বৈদ্যনাথ ম্যাট্রিকে খুব উচ্চ স্থান অধিকার করবে।

অন্যায় আশা তাঁরা করেন নি। বৈদ্যনাথ ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠে হঠাৎ একদিন সিদ্ধি খেয়ে পাগল হয়ে গেল। ফার্ষ্ট ক্লাসের ছাত্রেরা তখন দল বেঁধে সিদ্ধি ঘুঁটে খায়। খায় কিন্তু অভিযোগ করে, খেয়ে কিছু হয় না, বুদ্ধি আশানুরূপ বাড়ে না। একদিন এই অভিযোগে বিরক্ত হয়ে তাদের নেতা বৈদ্যনাথ মুখুজ্জে কি অনুপান সহযোগে সিদ্ধি ঘুঁটলে কে জানে, সেই সিদ্ধি খেয়ে বৈদ্যনাথ মণ্ডল প্রথম হাসতে সুরু করলে, তারপর বক্তৃতা সুরু করলে, সেই বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে গোটা বোর্ডিয়ের ঘুম ভাঙল, হেডমাস্টার এলেন, বৈদ্যনাথ তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে বললে—

—Twinkle, twinkle, little star

—নীল উজ্জ্বল তারাটি !

—মাস্টারমশাই, ওই যে তারাটি দেখছেন, ওটি কি বলছে জানেন ? কিছুক্ষণ মুখে আঙুল দিয়ে ভেবে চিন্তে বললে—কি বলছে বুঝতে পারছি না, কিন্তু কিছু বলছে।

বৈদ্যনাথ পাগল হয়ে গেল। দড়ি বেঁধে তাকে বাড়ী পাঠান হল। সে বৎসর সে পরীক্ষা দিতে পারলে না। দীর্ঘ দিন পরে সুস্থ হয়ে আবার ফিরল বৈদ্যনাথ, কিন্তু তার সে প্রতিভা তখন নষ্ট হয়ে গেছে। পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ ক'রে সে লাভপুরেই শিক্ষকতা করছে। আজও আছে। এমন উচ্চস্তরের শিক্ষক দুর্লভ কিন্তু আজও তার পূর্ব্ব মস্তিষ্ক সে ফিরে পায়নি। আজও সে মধ্যে মধ্যে অকারণে হাসে।

সে সময়ে এমনি ভাবে বহু প্রতিভা নষ্ট হয়েছে। এরপর আমি দেখেছি লাভপুরে ছাত্রজীবনের আরও অধঃপতন। মদ্যপান করতে দেখেছি। সেও এসেছিল শহর থেকে। লাভপুরও তখন শহর না হ'য়েও শহরের বাড়া। লাভপুরের সংস্কৃতিগৌরব নাকি বীরভূমের সকল স্থানের গৌরবকে ম্লান ক'রে দিয়েছে।

যাক্। রামপুরহাটে তখন এমনি একটি সংস্কৃতিবানের দল ছিল। লাভপুরের ছাত্রদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। দীর্ঘ দীর্ঘ পত্র, তার মধ্যে হৃদয় বিগলিত করা খণ্ড কাব্য, উচ্চস্তরের লিরিক ; এই ধরণের পত্রের

আদান-প্রদান চলত নিয়মিত। সুতরাং রামপুরহাট যাওয়ার মধ্যে নলিনী বাগচীকে খুঁজতে যাওয়ার সন্দেহে সন্দেহভাজন হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। ঢুকড়িবালাও তখন জেলে। কিন্তু আমার আকুলতা যতই থাক নলিনী বাগচীকে কোথায় পাব? রামপুরহাটে কেউ তার সন্ধানই জানত না। সেই ছেলেটির বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে ইচ্ছে হল; নলহাটী-আজিমগঞ্জ লাইন ধ'রে আজিমগঞ্জ গেলাম। আজিমগঞ্জেরই একটা ঠিকানা সে আমাকে দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে তাকে পেলাম না। অগত্যা আজিমগঞ্জে শেঠদের বাগান দেখে গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরে এলাম।

কবিতা লিখেছিলাম গঙ্গার ঘাটে বসে।

বাড়ী ফিরলাম। এর ঠিক দু' দিন কি চার দিন পরেই শুনলাম বাঙালী পল্টন তৈরী হচ্ছে। বাঙালী পল্টন যুদ্ধে যাবে। সেই বাঙালী পল্টনের জন্য লাভপুরে মিটিং হবে। ম্যাজিস্ট্রেট আসছেন, পুলিশ সাহেব আসছেন, তার সঙ্গে আসছেন কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্ন।

তিনি মিটিং-এ বক্তৃতা দিলেন। সে কি বক্তৃতা! দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "মানুষ আমরা নহি তো মেষ' এই লাইন দিয়ে সুরু করলেন। আজও মনে হয় এমন বক্তৃতা আর জীবনে শুনি নি।

বক্তৃতা শেষ হ'ল, আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমি যেতে চাই যুদ্ধে।

আমি যুদ্ধে যেতে চাই বলে উঠে দাঁড়াবার পরই আরও দু' তিন জন উঠে দাঁড়াল। হাততালি পড়ল। আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে আলাদা বসানো হ'ল। তারপর সভার শেষে নির্ম্মলশিববাবুদের গেষ্ট হাউসে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত মাপ নেওয়া হ'ল। হ'ল অনেক কিছু। এমন সময় কে এসে যেন নির্ম্মলশিববাবুকে ডেকে নিয়ে গেল। তারপরই আমাকে।

বেশী দূর না। রশি দুয়েক দূরেই রথতলা। ওই রথতলাতেই ইস্কুলডাঙ্গা থেকে আমাদের পাড়ার সোজা রাস্তা। গিয়ে দেখি রথতলাতে দাঁড়িয়ে দুই ব্যাঘ্রী, যে ব্যাঘ্রী দু'জন বছর-দুয়েক ধরে প্রচণ্ড বিক্রমে হুঙ্কারযুদ্ধ করছেন তাঁরা আজ একযোগে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং হুঙ্কার ছাড়ছেন। শান্তস্বভাব নির্ম্মলশিববাবুকেই তখন সহ্য করতে হচ্ছে সে হুঙ্কার।

—ছেলেধরা নিয়ে এসে এ সব হচ্ছে কি? যুদ্ধে যাবে? যুদ্ধে যাবে কি? কেন যাবে? এ সব মচ্ছুন্দিপনা তোমার করা কেন? কার হুকুমে ছেলে নিয়ে যাবে? কিসের যুদ্ধ? কার যুদ্ধ?

আমি যেতেই গিন্নী বললেন—যুদ্ধে যাবে? তুমি যুদ্ধে যাবে? দাও আমাদের বিয়ে ফেরত দাও। আগে বল তুমি বিয়ে করলে কেন? বল তুমি, আমার নাতনীকে তুমি কেন বিয়ে করলে? বিয়ে করলে তো যুদ্ধে যাবে কার হুকুমে?

আমি যুদ্ধে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াবার সময় এতটা ভাবি নি। ভাববার সময়ও ছিল না। এবং আমি যে ইতিমধ্যে এতখানি বাঁধা পড়ে গেছি তাও বুঝিনি। যুদ্ধে গিয়ে গোলাগুলির আক্রমণ সম্পর্কে একটা আধটা কথা বুকের মাপ দেবার সময় মনে হয়েছে, ভয়ও লেগেছে কিন্তু তার আগেই যে এমন-ভাবে বাক্যবাণের সম্মুখীন হতে হবে এ কথা আদৌ মনে হয় নি। তাই ডাহা হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিন্তু মুখে কোন উত্তরই জোগাল না। কি উত্তরই বা দেব? বিয়ে ফেরত কি ভাবে হয় তাও জানি না।

ইতিমধ্যে পিসীমা এগিয়ে এসে আমার হাতখানা ধরে বললেন—চল্, বাড়ীতে বঁটী আছে, তাই দিয়ে আমাকে, তোর মাকে, আর ওই বালিকা বউকে কেটে যুদ্ধ শিখে যুদ্ধে যাবি। চল, কাটবি চল আমাদের তিনজনকে।

বিয়ে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা জানা ছিল না এবং সকলকে কেটে যুদ্ধ শেখাও অসম্ভব ছিল, সুতরাং যুদ্ধে যাওয়া হয়ে গেল। সুড় সুড় ক'রে বাড়ি ফিরলাম। দু' তিন দিন গিন্নী ঠাকুরবাড়ি যাওয়া-আসার পথে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার খবর নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ আমার কার্য্য কারণে কোন রকম বদমতলব দেখা যাচ্ছে কিনা?

যাই হোক, এই ধরণের কড়া দৃষ্টির মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্র কথা শুনতে পেলাম, কথা একটাই, তারই বহু বিচিত্ররূপ। আমার পিসীমা ইঙ্গিতে বন্ধুবান্ধবদের দিয়ে প্রশ্ন করালেন—বধূকে নিয়ে আসবেন কি না?

—সেই জন্যই কি যুদ্ধে যেতে চাই? না-কি?

একদিন নিজেই বললেন—বউমাকে এইবার নিয়ে আসি, কি বল?

মা বাধা দিয়ে বললেন—বউমাকে তো আমরা পাঠিয়েই দিই নি। ওঁরাই নিয়ে গেছেন। ওঁরা যদি না পাঠান?

—তা না হয় আমাদের অপমান হবে?

আমি পড়লাম মহা বিপদে। কি বলব আমি। সত্য বলতে কি বধূর জন্য বিরহ অনুভবের কোন লক্ষণই আমার মধ্যে আমি অনুভব করিনি।

ওদিকে ওঁদের বাড়ীতে বধূ তিরস্কৃত হ'ল দিদিমার কাছে।—হারামজাদী খুকী। দিদিমা, দিদিমা ক'রে পাগল। দিদিমার জন্যে শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে এল। দশ কোশ বিশ কোশ নয়, বাড়ীর দোরে বিয়ে দিয়েছি, তাও থাকতে পারলেন না খুকী। এখন ছোঁড়া যুদ্ধে যেতে চায়। নে, এখন ঠ্যালা নে। সামলায় কে দেখ! এখন যা, সুড় সুড় ক'রে নিজে থেকে যা!

কিন্তু তাই বা কি ক'রে হয়? যদি ঘরে ঢুকতে না দেয়? তা অবিশ্যি পারবে না। কিন্তু পিসশাশুড়ী জ্বালালে কি হবে?

এই জল্পনা-কল্পনার মধ্যে একদা সংবাদ এল, আমি পাশ করেছি।

পাশ করার আনন্দটা (আমি জীবনে ওই একটা পাশই করেছি) একটা অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত আনন্দ। অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়েছিল। এমন বিপুল উল্লাস কখনও অনুভব করি নি। বিয়ে আমার একরকম ছেলেবেলায় হয়েছে, বিয়েতেও না। পরবর্ত্তী জীবনে সম্মান পেয়েছি, তাতেও না। বি-এ, এম-এ যাঁরা পাশ করেছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করি নি তবে আমার মনে হয়, ওই প্রথম পাশের আনন্দের মত বিপুল আনন্দ আর কোন পাশ ক'রে হয় না।

হয় বোধ হয়। পরে যে পরীক্ষায় পাশ করে মানুষ ভাল চাকরী অর্থাৎ বিদ্যাগৌরবের সঙ্গে জীবনে প্রতিষ্ঠাগৌরবও পায় তাতে হয়। আমি শুনেছি আগে আই-সি-এস, আই-পি-এস ধরণের পরীক্ষা পাশ-করা ছাত্র সারা রাত্রি নৃত্য করেছে, গলা না থাকলেও গান করেছে। হল্লা করেছে। তবে একে বোধ হয় পরীক্ষার পাশের সামিল করা যায় না। পাশ বলতে ওই এম-এ পর্য্যন্ত।

দশ বছর ধ'রে যে পরীক্ষাটি পাশ করবার জন্য বছরে চার-চারটে পরীক্ষার

পড়া তৈরী করেছি, ইস্কুলে কঠোর শাসনের মধ্যে কাটিয়েছি হঠাৎ ওই খবরটি এসে অনেক কথার মধ্যে এই কথাটিও বলে—খালাস তুমি ওই ইস্কুল থেকে। ব্যাপারটা কত বড় বুঝুন, ওখানে স্বেচ্ছায় গিয়ে যদি বলি, আমি আর একদিন পড়ব, তবে মাস্টাররা বলবেন—হবে না বাপু। আর ক্লাস নেই। এ যেন সোনার তরীর উল্টো ব্যাপার। ঘাটের উপর বসে আছি ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে, হঠাৎ সোনার তরী এল, এসে বললে—তোমার মাথার ধান সোনা হয়ে গেছে, তুমি আমার নৌকায় উঠে এস। ওপারে চল। ঘাটের লোকও বললে—যারা না কি সারা বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত চারটে ঋতু পর্য্যন্ত চোখ রাঁঙিয়ে ধান পুঁতিয়েছে, নিড়িয়ে নিয়েছে, সিচন দিইয়ে নিয়েছে, কাটিয়েছে তারাও বলে—আর না, তোমার ফসল যখন সোনা হ'ল তখন আর এ পারে চাষ তোমাকে দিয়ে চলবে না! ওপারে গিয়ে লেগে পড়।

হয়তো উচ্ছ্বাসটা বেশী বলেই মনে হবে অনেকের, সে যারা চারটে পাঁচটা সাতটা পাশ করেছেন। ডাঃ শ্রীকুমার, সুনীতিকুমার, মেঘনাদ—এঁদের মনে হবে। হয়তো প্রমথ বিশী, জগদীশ ভটচাজ এদেরও হবে। হয় তো এম-এ পাশ আমার বড় ছেলে বড় জামাইয়েরও মনে হবে। কিন্তু যারা আমার মত একটা পাশ তাদের বেশি মনে হবে না। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। দশ বছর পড়ে দশ বছরে অন্তত একচল্লিশটা পরীক্ষার পর (বছরে কোয়াটারলি ধ'রে এবং টেষ্ট ও ফাইনাল ধরে) পাশটার স্বীকৃতির সঙ্গে দু' বছরে এক একটা পাশের স্বীকৃতির কি তুলনা হয়? ও তো তৈরী ভাত ডাল মেখে গ্রাস বানিয়ে মুখে তোলা। আর এ হ'ল উনোনে আঁচ দেওয়া থেকে সুরু ক'রে বাটনা বেটে, তরকারী কুটে, চাল ধুয়ে, রান্না ক'রে, জায়গা ক'রে খাওয়ার মত ব্যাপার।

সারাটা দিন গ্রামের পথে পথে বেড়িয়েছিলাম। লোককে দেখবামাত্র প্রণাম করেছিলাম। একরকম উপবাস ক'রে ছিলাম। খেতেই পারি নি ভাল ক'রে। রাত্রে ফিষ্ট করেছিলাম। এবং গান করেছিলাম। সেদিন সিদ্ধিও খেয়েছিলাম।

বিয়ে নিয়ে ঝগড়া বিবাদের অশান্তি কোথায় উপে গেল।

পরের দিন থেকে গবেষণা চলতে লাগল—কোথায় পড়তে যাব ?

পিসীমা জানালেন কলকাতা পাঠাতে তিনি রাজী নন। বললেন—কলকাতা ভয়ঙ্কর জায়গা। সেখানে লোকে দিক ভুলে হারিয়ে যায়। সন্ধ্যের অন্ধকারে গুণ্ডায় ছুরি মারে, একটুখানি অন্যমনস্ক হ'লে বড় বড় জুড়ি গাড়ির তলায় চাপা পড়ে। ট্রামের তার কেটে পড়বামাত্র লোকে মরে যায়।

গাড়ি-চাপা-পড়া তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। জগন্নাথ যাবার পথে হাওড়া স্টেশনেই আমাদের গ্রামের একটি বালক চাপা পড়ে মরেছিল। কলকাতার কথা হলেই শিউরে উঠে তিনি এই গল্পটি ক'রে তারপর চিড়িয়াখানা যাদুঘর কালিঘাটের কথা বলতেন।

ট্রামের তার কেটে গায়ে পড়ে মৃত্যুর কথা গল্প করতেন আমার বউদিদি। আমার বউদিদির মায়ের ফিটের ব্যারাম ছিল। তার উদ্ভব না কি ট্রামের তার কাটা থেকে। বউদিদির দাদা কয়লার ব্যবসায়ী ছিলেন। কলকাতায় ঘুরতে হ'ত অনেক। একদিন কেউ এসে গল্প করেছিল বাড়িতে—ওই ট্রামের তার কাটার গল্প। ট্রামের তার কেটে একজনের গায়ে পড়মামাত্র লোকটা মরে গেল। শুনবার পর বউদিদির মা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে—কি হ'ল ? এমন ক'রে ব'সে কেন ?

বউদিদির মা বললেন—আমার সুশীল দিনরাত কলকাতার রাস্তায় ঘুরছে, ট্রামের তার কেটে যদি সুশীলের গায়ে পড়ে ? এরপরই তিনি অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে পড়ে গেলেন মাটির উপর। সেই তাঁর ফিটের ব্যাধির সুরু।

ব্যাপারটা বারবার শুনে সে আমলে আমার মনেও একটি আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। যাই হোক, পিসীমা এসব গল্প বলে সর্ব্বশেষে মাকে বললেন—আরও একটা কথা আছে বউ।

মা বললেন—কি ?

—ওখানে ছেলেকে পাঠাব। ওখানে ওদের (অর্থাৎ আমার মামাশ্বশুর-দের) মস্ত ব্যবসা, বাসা। আমরা থাকব না। এখন ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে আদর যত্ন ক'রে যদি ওদের কোলগত ক'রে নেয়, তখন ?

মা বললেন—কলকাতা পাঠাতে আমি বলছি না কিন্তু ছেলেকে অবিশ্বাস করছ কেন? সে তো কোন অবিশ্বাসের কাজ করে নি। এই তো বাড়ির দোরে শ্বশুরবাড়ি, বুড়ী (আমার বোন) রয়েছে সেখানে, তার সঙ্গে দেখা করার ছুতো ক'রেও তো যায় নি। বউমার চিঠি পর্য্যন্ত সে আমাদের দিয়েছে।

পিসীমা অপ্রস্তুত হলেন, বললেন—না না, সে কথা আমি বলিনি। তবে মন না মতিভ্রম। ছেলেমানুষ! এই বয়সেই তো শ্বশুরবাড়ির শখ। যাওয়ারই তো কথা। বউতো আনতেই হবে। বিয়ে তো আর দিতে পারব না। সে কালও নাই, কাল না মানলেও পথ নাই। বুড়ীর সঙ্গে বদলে বিয়ে হয়েছে। তবে আমি শিক্ষা দিতে চাই। বলে কি না—আমি কে? আমি থাকতে মেয়ে পাঠাবে না।

বলতে বোধ হয় ভুলেছি, এমন কথা উঠেছিল, বলেছিলেন ওঁরা। সেই আঘাতটা তাঁকে লেগেছিল। তবে ঝগড়া-ঝাঁটি যাই হোক এবং তার কারণ স্বরূপ নানা কঠিন কথার যতই উল্লেখ করে থাকি আসল কারণটা ছিল ছেলে হারাবার ভয়। যে কারণে চিরদিন একশো শাশুড়ী একশো বউয়ের মধ্যে নিরেনব্বুই ক্ষেত্রে বিরোধ বাধে। চিরদিন হয়ে আসছে। অন্তত আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে। এ সমাজ যতদিন থাকবে ততদিন হবে। যে-বউ শাশুড়ীর কটু কথা শোনেন নিজের বধূ-জীবনের প্রথমভাগে সেই বধূই শাশুড়ী হয়ে নিজের বধূকে কটু কথা বলেন। পিসীমা ছিলেন জীবনে সর্ব্বহারা। সর্ব্বহারার সত্যকার অর্থে সর্ব্বহারা। এই সর্ব্বহারা নারীর জীবনে আমিই ছিলাম একমাত্র অবলম্বন, তাই আমাকে হারাতে, আমাকে ছাড়তে, কাউকে আমার মত বস্তুটিকে হাতে তুলে দেবার শক্তি তাঁর ছিল না। তার চেয়ে মৃত্যু তাঁর ভাল ছিল।

আমার কিন্তু কলকাতায় আসবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। আমি তখনও কলকাতা দেখি নি। শুনেছি পড়েছি কলকাতার গল্প। বিরাট বিচিত্র মহানগরী। কলকাতায় বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়, পাণ্ডিত্যের মূর্ত্তিমান অধ্যাপক, কলকাতায় সাহিত্যের কেন্দ্র, বড় বড় কাগজের আপিস; বড় বড় সাহিত্যিক

সেখানে থাকেন; কলকাতায় স্বপ্নের যাদুপুরী রঙ্গমঞ্চ, কলকাতায় মোহনবাগানের খেলা, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, সার্কাস, বড় দিন; বিরাট নগরীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচিত্র ট্রাম যানের ব্যবস্থা, অবিরাম চলছেই চলছেই। আমার তখন ধারণা ছিল ট্রাম আদৌ থামে না, সে চলেই চলেই, সেই চলন্ত অবস্থাতেই উঠতে হয়, নামতে হয়। কলকাতায় ভারতবর্ষের যত করদরাজ্যের রাজারা আসেন। উদয়পুরের মহারাণা আসেন। কলকাতায় ঘোড়দৌড় হয়। কলকাতায় বায়স্কোপ (তখন সিনেমাকে বায়স্কোপ বলতাম) আছে। কলকাতায় রাত্রি নাই। শৈশব থেকে শুধু শুনেই এসেছি, দেখতে পাই নি। একবার আসবার সমস্ত আয়োজন করেও আসা হয় নি। সে দুঃখ আমার মনে সমান প্রবল হয়েই ছিল তখনও পর্য্যন্ত। আরও আকর্ষণ ছিল। আমাদের গ্রামের যাঁরা কলকাতায় থাকতেন তাঁদের বিচিত্র বেশ; মার্জ্জিত বহিরঙ্গেরও একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। একালে এখনও গ্রাম্য বালকেরা বোধ করি এ আকর্ষণ অনুভব করে। সেকালে বলত—কলের জল, বালাম চাল তিনমাস পেটে পড়লেই আলাদা মানুষ। কালো-কুচ্ছিতও কলের জলে বালাম চালে 'ছিরি' অর্থাৎ শ্রীমন্ত হয়ে ওঠে।

একটি ষোল বছরের ছেলের পক্ষে এ আকর্ষণ দুর্নিবার। তবুও তাকে অন্তরের মধ্যেই নিবারণ করতে হল। মা বললেন, পিসীমা বললেন। আমিও বললাম, বলতে হল—বেশ। স্থির হল বহরমপুরে ভর্ত্তি হব। বললাম—বেশ।

খুশী হয়ে পিসীমাই আমাকে নিয়ে বহরমপুর রওনা হলেন। আমি যখন ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ি তখন আমাদের স্কুলে এসেছিলেন থার্ডমাস্টার, তাঁর নাম প্রমথনাথ মৈত্র। তিনি আমার গৃহ-শিক্ষক হয়ে আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। মাল-আষ্টেক থেকে ওখান থেকেই মোক্তারী পাশ করে তিনি তখন বহরমপুরে মোক্তারী করছেন। তাঁকে পত্র লিখে আমায় নিয়ে তাঁর ওখানেই গেলেন। তখনও কলেজ খোলে নাই। ভর্ত্তি সুরু হয় নাই। কয়েক দিন থেকে ওখানকার ব্যবস্থা করে পিসীমা আবার আমাকে নিয়ে ফিরলেন।

হোস্টেলে থাকব। প্রমথবাবু সব ঠিক ক'রে দেবেন বললেন। এক সপ্তাহ-দুয়েক পরই বাক্স-পেঁটরা বেঁধে বহরমপুর রওনা হলাম। এবার আমি একা। এই আমার জীবনে প্রথম একক স্বাধীন ভাবে যাত্রা। অবশ্য সিউড়ী, রামপুরহাট বাদ দিয়ে। মাকে সঙ্গে নিয়ে পাটনা এর আগে গিয়েছি এসেছি কিন্তু সে ক্ষেত্রে মাকে আমি নিয়ে যাই নি, মা আমাকে নিয়ে গেছেন।

তখনও ভাগীরথীর এমন দুরবস্থা হয় নি। বর্ষার সময় দুকুল-প্লাবিনী গঙ্গায় ষ্টীমারে আজিমগঞ্জ থেকে বহরমপুরে পৌছলাম। ভারী ভাল লেগেছিল এই পথটুকু।

বহরমপুরে পৌছে প্রমথবাবুর বাড়িতে উঠলাম। কিন্তু প্রমথবাবু কোন ব্যবস্থাই ক'রে রাখেন নি। অর্থাৎ প্রধান সমস্যা হোস্টেলের সিটের কোন ব্যবস্থা করতে অবকাশ পান নি। ভেবেছিলেন এলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যাটা এত সোজা ছিল না তখন। কলকাতায় ভারত রক্ষা আইনের প্রবর্ত্তনের ফলে বহরমপুর কলেজ, হোস্টেল তখন আকণ্ঠ ভরে উঠেছে। প্রমথবাবুর এক ভাই কলেজে পড়তেন সেকেণ্ড ইয়ারে—তাঁর নামটি বেশ—কীর্ত্তিবাস মৈত্র, তাঁর সঙ্গে প্রথমেই দেখতে গেলাম হোস্টেলের সিট। প্রমথবাবু বলে দিলেন। কিন্তু বেলা একটা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্য্যন্ত হোস্টেলে হোস্টেলে ঘুরে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। মহারাজা হোস্টেলে বলে একটি হোস্টেলে একটি সিট ছিল চাকরদের ঘরের সংলগ্ন। অন্ধকার, স্যাঁতস্যাতে ; ঘরের একটি মাত্র জানালার ওপাশে একটি সাপের খোলসও ঝুলতে দেখে আমি ওখানে থাকতে রাজী হলাম না।

প্রমথবাবু সত্যই আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি ব্যবস্থা করে রাখেন নি সেটা তাঁর অবহেলা নয়, ভেবেছিলেন এলেই হয়ে যাবে ; এতটা ভাবতে পারেন নি। তিনি বললেন—তা হলে আমার এখানেই কয়েক দিন থাক—তারপর একটা ব্যবস্থা হবে।

এদিকে তখন এই অকল্পিত অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে বিচিত্র ভাবে আমার মনে কলকাতা আসবার বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। এই তো হয়েছে। এই তো সুযোগ! মন আমার উল্লাসে নেচে উঠল—এ সুযোগ

আর কিছুতেই ছাড়ব না। আজ রাত্রে, আজই রাত্রে রওনা হব। নইলে কলকাতা যাওয়া অন্তত দু বছর পিছিয়ে যাবে। মহানগরী আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে তখন।

আমি বললাম—না। আমি কলকাতা যাই তা হ'লে, দেরী হলে সেখানেও এই অবস্থা হবে।

একটু রাগও দেখালাম। বললাম—ব্যবস্থা যখন করেন নি তখন আর পরে ব্যবস্থা হবে বলে কি লাভ? আমি কলকাতাই যাব।

প্রমথবাবু আর কিছু বললেন না।

আমি সেই রাত্রেই রওনা হলাম। সারা রাত্রি ট্রেনে এসে ভোরবেলা নামলাম শেয়ালদা স্টেশনে।

তখনও স্টেশনের ইলেকট্রিক লাইটগুলি জ্বলছে। সামনে জনহীন সারকুলার রোড ঘুমন্ত অজগরের মত নিথর।

কুলি বললে—কি বাবু? ঘোড়ার গাড়ি?

বললাম—থাম। রাখ জিনিস এইখানে। সকাল হোক।

বিরাট ঘুমন্ত মহানগরীর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে বুকটা কেঁপে উঠল। কোথায় যাব? কেমন ক'রে যাব? মহানগরী শুধু বিচিত্রই নয়; পাণ্ডিত্যের লীলাভূমি, বিদ্যা, সাহিত্যের তীর্থক্ষেত্রই নয় মহানগরী হিংস্র প্রবঞ্চকের, পরস্বাপহারীরও আবাসস্থল। পরক্ষণেই সাহস ফিরে পেলাম। কিসের ভয়? ফুটুক, আলো ফুটুক!

হঠাৎ শব্দ শুনে দেখলাম লম্বা আকারের হলুদ রঙের ছোট ট্রেনের গাড়ি চলছে রাস্তার উপর দিয়ে, গাড়ির মাথায় একটা ডাণ্ডা বেঁকে উঠে তারের সঙ্গে লেগে রয়েছে।

ট্রাম গাড়ী। এই সেই ট্রাম গাড়ী! জীবনে প্রথম দেখলাম। ছাদের লম্বা ডাণ্ডাটা মারফৎ বিদ্যুৎশক্তি নিচ্ছে তার থেকে। পথের উপরে পাতা লাইন বেয়ে চলেছে। তখন ট্রামগাড়ীর রং ছিল হলুদ। দরজা ছিল পাশে, খোলা দরজা। পাশাপাশি ছ-সাতটা দরজা। লোকাল ট্রেনের মত। ট্রামখানা চলে গেল হ্যারিসন রোড ধরে। আমি বসে রইলাম।

আলো ফুটে উঠলো বোধ করি আধঘণ্টার মধ্যেই। এরই মধ্যে দেখলাম সারকুলার রোড যান-বাহন জনতায় জেগে উঠল। সেই প্রথম দিনই দেখেছিলাম, শেয়ালদহ স্টেশন থেকে কি বিপুল পরিমাণ শাক-সব্জী তরি-তরকারী বোঝাই গরুর গাড়ী, এবং বড় বড় ঝুড়ি মাথায় শ'য়ে শ'য়ে মুটে বের হয়ে চলেছে কলকাতার ভিতরে। সারি সারি—তার আর শেষ নাই। মাছের গন্ধ পেলাম; দেখলাম বাক্স চলেছে। তখন মটরের যুগ ছিল না। সে সময় কলকাতায় কতগুলি মটর ছিল জানি না। সেদিন মটরকার চোখে পড়েনি। শেয়ালদহ স্টেশনে ট্যাক্সি দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না।

শেয়ালদহ স্টেশনে সেই আধঘণ্টার মধ্যেই বোধ হয় খান তিনেক ট্রেণ এসেছিল। তিনবার জনস্রোত আমার চোখের সামনে স্টেশন সীমানা পার হয়ে রাস্তার পড়ে বোধ হয় তিন চার মিনিটের মধ্যেই কে কোথায় মিলিয়ে গেল! তারপর জাগল কলকাতা। সারকুলার রোডের অবস্থা দেখে তাই মনে হল। আমি এবার একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করলাম। আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলাম, কোথায় যাব। যাব এণ্টালী, ক্যাণ্টোফার লেন। আমার মেসোমশায়ের বাড়ী। একই বাড়ীতে আমার দুই মাসীমার বিবাহ হয়েছিল দুই সহোদরের সঙ্গে। সেখানে উঠে তারপর কলেজে ভর্ত্তি হব এবং হোস্টেলে যাব। কোথায় ক্যাণ্টোফার লেন তা জানি না। শুধু জানি, ট্রাম কোম্পানীর পাওয়ার হাউসের পিছনে। গাড়োয়ানকে বললাম সে কথা। বললাম, দেখ কলকাতায় আমি নতুন এসেছি। আমাকে

এই ঠিকানায় পৌঁছে দিতে হবে। ভাড়া তাঁরা যা বলবেন তার থেকে একটাকা বেশী দেব। তোমাকে কিন্তু একটি কথা বলতে হবে।

সে প্রশ্ন করলে—কি ?

বললাম—তুমি আল্লার নাম নিয়ে বল যে আমার কোন বিপদ হবে না।

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে। বললে—বাবুজী বোধ হয় কলকাতার কেচ্ছা অনেক শুনেছ! ওঠ বাবু, কোন ডর নাই তোমার। তুমি যা বললে তাই বলছি আমি। খোদাতায়লার নাম নিয়ে বলছি—চল, আমি তোমাকে ঠিক পৌঁছে দেব। কোন বিপদ হবে না তোমার।

উঠে বসলাম গাড়ীতে। গাড়ীর ছাদের উপর বাক্স বিছানা তুলে বেঁধে নিলে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম। বাক্সের মধ্যে আমার অনেক দামী জিনিষ ছিল। সাধারণ পড়ুয়া ছেলের যা থাকে তা থেকে অনেক বেশী; আমার তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সোনার ঘড়ি, চেন, বোতাম, হীরের আংটি প্রভৃতি জিনিষগুলি আমার সঙ্গে এবং বহরমপুর স্টেশনে ট্রেনে উঠবার আগে সেগুলিকে বাক্স বন্ধ করেছি। ভয় হয়েছিল ট্রেনে কেউ না ঘুমন্ত অবস্থায় খুলে নেয়। বাক্সটা ছাদের উপর চড়াতেই একবার মনটা কেমন ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। গাড়োয়ান একা নয়, তার একজন ছোকরা সঙ্গী রয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেই লজ্জা পেলাম। গাড়োয়ান তার ঈশ্বর আল্লার নামে শপথ করেছে; তবু তাকে অবিশ্বাস করছি কেন ?

আমার বাল্যকাল থেকে বাড়ীতে শুনে এসেছি—কেউ যদি ভগবানের নামে শপথ ক'রে সে শপথ ভাঙে তবে তার পাপ তার দায়িত্ব ভগবানের। তুমি তাকে অবিশ্বাস ক'রো না, করলে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসের পাপ স্পর্শ করবে তোমাকে।

এ কথাগুলি আজকের যুগে হয় তো অচল। লাখো লাখো প্রমাণ হাজির হবে—ভগবানের নাম নিয়ে কত জাল কত জুয়াচুরি পৃথিবীতে ঘটেছে। এবং ভগবানই যেকালে অলীক মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে, সেকালে এ কথা হাস্যরসেরই খোরাক জোগাবে। কিন্তু আজও আমি বলব—ভগবান আছেন বলে কোমর বেঁধে তর্ক আমি করব না কারুর সঙ্গে, ভগবান আছেন

প্রমাণের জন্যে ভূতের গল্পেরও আমদানী করব না, অলৌকিক ঘটনার নজীরও খাড়া করব না; শুধু বলব ভগবানের নাম নিয়ে লাখো লাখো পাপকর্ম্ম যেমন ঘটেছে পৃথিবীতে তেমনি ভগবানের নাম কোটী কোটী—বহু কোটী মানুষকে পাপপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করেও এসেছে। এই বিংশ শতাব্দীর খানিকটা অবধি মানুষের সভ্যতা যে এতদূর এগিয়ে এসেছে তার এই পথচলার সব চেয়ে বড় পাথেয় হল ভগবান, ভগবানের নাম।

সে দিন ভগবানের নাম এবং ভগবানের উপর বিশ্বাসই ছিল আমার মনের বল। ওই বলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ীর মধ্যে বসে বহু প্রত্যাশার এই মহানগরীকে দেখতে পেরেছিলাম দুপাশে চোখ মেলে।

ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত কলকাতার কত কথা কত গল্প শুনেছি। কত বিচিত্র কথা। যত শুনেছি তত আকর্ষণ অনুভব করেছি। কিন্তু অভিভাবকহীন একটি বালকের সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। একবার যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে গাড়ীতে উঠবার সময়ে বাধা পড়েছিল; কলকাতা আসা ঘটে নি। সে যে কি ক্ষোভ আমার হয়েছিল সে আর আজ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঘটনাটুকু এখানে অবান্তর হবে না।

১৯১২ সাল। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক; দিল্লীর দরবারের পর সম্রাট আসবেন কলকাতা। সুন্দরী রূপসী কলকাতা তার জন্য অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে। গ্রামে বসেই তার সংবাদ পাচ্ছি। সে না কি এক বিরাট উৎসব। যে উৎসবের রূপসজ্জায় সমারোহের আড়ম্বরের তুলনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। সেই উৎসব দেখবার জন্য বাড়ীতে মা পিসীমার কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। তাঁদের আপত্তি কোথায় তখন ঠিক বুঝতাম না। আমার বয়স তখন চৌদ্দ। তাঁদের আপত্তি নয়, সমস্যা ছিল, কার সঙ্গে আমাকে পাঠাবেন? কোথায় পাঠাবেন? সে বার তাঁরা 'না' বললেন না। ষষ্ঠীকিঙ্করবাবুর জামাই অমরেন্দ্রনাথ; তিনি আমাদের গ্রামেরই মানুষের মত এবং একটি সর্ব্বজনপ্রিয় মধুর প্রকৃতির তরুণ। মানুষটি সেকালে আমাদের কিশোর সমাজের ভালবাসার জন, 'গাবুদা'-কে দেখলে আমাদের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠত। গাবুদা'র মত ভালবাসা আমাদের ওখানে

আর কোন তরুণ পেয়েছেন কি না জানি না, আমার বিশ্বাস পান নি। সে সময় গাবুদা কলকাতাতেই থাকেন, পড়া শেষ হয়েছে কি হবে। কয়েক দিনের জন্যে লাভপুরে এসেছেন। উৎসব-সমারোহের আগেই কলকাতা ফিরে যাবেন। গাবুদা'র জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ তাঁর সত্য সত্যই মায়ের মত, বাল্যে মাতৃহীন গাবুদাকে তিনিই মানুষ করেছেন; তিনি আবার ষষ্ঠীকিঙ্কর বাবুর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর প্রথমা কন্যা। দাদার কাছেই গাবুদা' তখন থাকেন। আমার পিসীমা গেলেন গাবুদার কাছে।—বাবা অমর, তুমি যদি শঙ্করকে নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে! রাজা আসছেন, কলকাতায় অনেক ধুমধাম, তার দেখতে বড় সাধ। তা' ছাড়া সে কলকাতা কখনও দেখে নি!

গাবুদা সম্ভ্রম এবং আগ্রহের সঙ্গে বললেন—বেশ তো। নিয়ে যাব আমি, এর জন্যে আপনি এলেন কেন? আমায় তো ডেকে পাঠালেই পারতেন। আমি নিয়ে যাব, দেখাব সব।

পিসীমা বললেন—ওকে নিয়ে গিয়ে ওর মাসীর বাড়ী পৌঁছে দিলেই হবে।

গাবুদা'র বৌদি, স্বর্গীয়া যাদবলালবাবুর কন্যা, তিনি বলে উঠলেন—সে কি? সেখানে একদিন যাবে, দেখা করে আসবে, সেখানে থাকবে কেন? থাকবে আমাদের ওখানে। আমরা কি পর? দেখ তো, ও তো আমাদেরও ছেলে!

এই গুণটি, (শুধু গুণ বললেই যেন বলা হচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে) এই সুদুর্লভ গুণটি যাদবলালবাবুর প্রকৃতির দান; এই মহৎ গুণটি তাঁর সন্তানদের মধ্যে পূর্ণ ভাবে সঞ্চারিত ছিল; মানস সরোবর থেকে নির্গত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ধারার মত। পরবর্ত্তী পুরুষেও সে ধারার মহিমা সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয় নি তবে সমতল ক্ষেত্রের ধূলিকণা তার মধ্যে মিশে গিয়ে তার রঙ এবং স্বাদ অনেক পরিমাণে বদল ক'রে দিয়েছে।

সে কালে তাঁদের বাসায় লাভপুর এবং লাভপুরের আশপাশের লোকের প্রবেশাধিকার এবং দু দশ দিনের জন্য থাকার অধিকার ছিল অবারিত। এবং

যে যে-সম্মানের মানুষ তাকে তার থেকে অধিক সম্মান দিয়ে তাঁরা অভ্যর্থনা করেছেন।

যাই হোক ঠিক হয়ে গেল আমি যাব। দিন স্থির করে গাবুদা বলে পাঠালেন। ট্রেণ বোধ হয় সন্ধ্যায়। আমদপুর-কাটোয়া রেল লাইন তখন হয় নি। লাভপুর থেকে সাত মাইল এসে আমদপুর ট্রেণ ধরতে হবে। ষষ্ঠীকিঙ্কর বাবুদের ঘোড়ার গাড়ীতে আমদপুর পর্য্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা। রওনা হব চারটে সাড়ে চারটের সময়। তখন স্যুটকেশের চলতি ছিল না। ব্যাগ বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যাম্বিসের ব্যাগ ছিল, অবস্থাপন্ন লোকেরা চামড়ার তৈরী গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ ব্যবহার করতেন। আমাদের একটি গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ ছিল। সেই ব্যাগটি গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিছানার দরকার হবে না বলে পাঠিয়েছেন গাবুদা। আমি ভাত খাওয়ার পর থেকেই দু দশ মিনিট অন্তর ঘড়ি দেখছি। তখন বড়দিনের ছুটি। ঘড়ি চলছে না মনে হচ্ছে। অধীর হয়ে আমাদের বৈঠকখানার সামনে বাগানে, খামার বাড়ীতে ঘুরছি, মধ্যে মধ্যে বাড়ী এসে একবার ব্যাগটা খুলে কোন একটা জিনিস বের করছি—আবার পুরছি। বেলা যখন তিনটে সাড়ে তিনটে—তখন শরীরটা যেন কেমন করে উঠল। এ কেমন-ক'রে-ওঠাটা যাঁরা ম্যালেরিয়ায় ভোগেন নি তাঁরা বুঝতে পারবেন না। প্রথমটা বেশী মিষ্টি পা শির-শিরে শীত অনুভব করার মধ্যে মনে হয় পায়ের গোছে কেমন যেন অস্বস্তি। তারপর কম্প। তারপর দেখতে দেখতে গায়ের উত্তাপ সাড়ে তিন, সাড়ে চার, পাঁচ, সাড়ে পাঁচ। দুরন্ত মাথায় যন্ত্রণা, সর্ব্বশেষ বমি। বমি ক'রে পেটের খাদ্য শেষ কণা বেরিয়ে গেলে জ্বর কমতে থাকে।

আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল।

কি করব? কি করি? কি ক'রে একে ঠেকানো যায়?

ছুটে বাড়ী এলাম। দুটো কুইনিনের বড়ি লুকিয়ে গিলে ফেললাম। আবার বৈঠকখানায় গেলাম। মনকে দৃঢ় ক'রে ভাবতে চেষ্টা করলাম, কিছুই হয় নি আমার। কিছু হলেও কাউকে জানতে দেব না। জানাব না। কলকাতায় গিয়ে যা হয় হবে। অন্যের বাসা, অন্যেরা বিব্রত হবেন সে-সব

বিবেচনা আমার কিশোর জীবনের বিপুল আগ্রহের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। মনেই হল না। কিন্তু কিছুই হয় নি ভাবলে কি হবে! ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইটগুলি যে তখন শরীরের ভিতর নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। দেহের অবস্থা তখন নর্ত্তকীদলের নৃত্যপরা চরণ-মুখর রঙ্গমঞ্চের পাটাতনের মত। গলার ভিতর দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে একরকম এবং কাঁপতে সুরু করছে শরীর। ঘরের ভিতর র‍্যাপার মুড়িতে শীত কাটছে না, অসহ্য হয়ে উঠছে। বেরিয়ে এলাম, রৌদ্রে দাঁড়াব। রোদ ভারী মিষ্টি লাগে এ সময়। এবং পাছে কেউ এ অবস্থা দেখে ফেলে তাই খামার বাড়ীতে গিয়ে ধানের পোয়ালের আড়াল দিয়ে একটি নিরালা জায়গায় বসলাম। হঠাৎ মাথায় এল—বমি ক'রে পেটের অন্ন তুলে ফেলতে পারলে জ্বরটা কম থাকতে পারে। ভাবনা মাত্রে কোশিস অর্থাৎ চেষ্টা আরম্ভ করে দিলাম। গলায় আঙুল দিলাম। প্রথমেই উঠল—গলিত কুইনিন, যা ঘণ্টা খানেক আগে খেয়েছি। তারপর আর চেষ্টা করতে হল না। আপনা আপনিই সব নির্গত হয়ে গেল। এবং সমস্ত শরীরটা ঘামে ভিজে গেল। কিন্তু মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

ঠিক এই সময়েই ডাক শুনলাম, পিসীমাই ডাকছেন—কই রে? কোথায় গেলি? আয়, ওদের গাড়ী এসেছে। যাত্রা করবি আয়।

অর্থাৎ কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে মাথায় একশো আটবার দুর্গানাম জপ ক'রে দেবেন।

তখন আমার যেন দাঁড়াবারও শক্তি নাই এমন অবস্থা। তবুও প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় ক'রে কোন রকমে উঠে দাঁড়ালাম—বেরিয়ে এলাম পোয়ালের আড়াল থেকে।

আমার মুখ দেখেই পিসীমা বললেন—ও কি রে? মুখ এমন ফন্ ফন্ করছে কেন?

—না। কিছু না। রোদে ছিলাম কি না!

—রোদে কেন?

—বেজীর বাচ্চা দেখছিলাম।

—না। দেখি তোর কপাল দেখি। এ কি? গা-যে পুড়ে যাচ্ছে!

—রোদে ছিলাম যে।

মানুষ ভগবানকে ছলে ছলনাময়। কিন্তু দুঃখ এই, মানুষের ছলনা রাখতে এতটুকু সাহায্য করেন না তিনি। শেষের কথা কয়টা শেষ করতে করতে আবার পেটের খাদ্য মোচড় দিয়ে উঠে এল গলায়: বসে পড়তে পড়তে হুড় হুড় করে বেরিয়ে এল।

এরপর বিছানায় গিয়ে শুতে হল। গাবুদার গাড়ী চলে গেল।

শুয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম। মনে হল, এ জীবনে আর আমার কলকাতা যাওয়া হবে না। সে দিন জ্বর কমে এলে নিজের মনেই গান করেছিলাম—

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা।" এই গান গাওয়ার কথা সন্দীপন পাঠশালায় আছে। সীতারামকে যখন হুগলী পড়তে পাঠাতে তার বাপ অমত করলে—তখন সীতারাম রাত্রে উঠে বারান্দায় বসে গান গাইছে।

আমার সাধ না-পুরিল—ইত্যাদি।

এই গানটি সে আমলে ছাত্র মহলে খুব প্রিয় গান ছিল। আজ ভাবি এবং ভেবে পাই না—এই ধরণের বিষাদের সুর কেন তরুণ জীবনে ভাল লাগত? অবশ্য সেদিন ও গানটা আমার পক্ষে খুবই উপযুক্ত রূপে খাপ খেয়েছিল সন্দেহ নাই।

সেই কলকাতায় এসেছি।

তখনও রোদ্দুর ওঠে নি! জুলাই মাস! আকাশে মেঘ ছিল কিনা মনে পড়ছে না! তবে রোদ্দুর ওঠবার সময় তখনও হয় নি। ছটাও বাজে নি।

আজও মনে পড়ছে শেয়ালদার সামনে, সারকুলার রোডের উপরে একখানা লাল রঙের বাড়ী। সে বাড়ীখানা কোন বাড়ী আজ বুঝতে পারি না। তবে চোখের সামনে ভাসে লাল রঙের বাড়ীখানা। চোখে পড়ল সদ্য-ধোওয়া রাজপথ! তখন বোধ হয় পিচ হয় নি।

মনে পড়ছে বউবাজারের মোড়ে একটা গির্জ্জা। এগিয়ে এসে জোড়া

গির্জ্জা। দুপাশে বড় বড় বাড়ী। ট্রাম লাইনে হলুদ রঙের ট্রাম গাড়ী চলছে।

ট্রামে কিভাবে চড়ব, কি করে নামব—সেই নিয়ে মনে দুশ্চিন্তা। ট্রাম থামে না, চলেই, চলেই! চলন্ত ট্রামেই উঠতে হয়, নামতে হয়। লক্ষ্য করে দেখলাম, না, ট্রাম তো থামে। অনেকে ছুটে গিয়ে উঠছে এবং চলন্ত ট্রাম থেকেই নামছে বটে, কিন্তু থামে। ট্রামে পোস্টের গায়ে-লেখা প্লেটগুলি চোখে পড়ল। লেখাগুলিও পড়লাম এবং আশ্বস্ত হলাম। তবু লক্ষ্য ক'রে দেখলাম—চলন্ত ট্রামে ছুটে গিয়ে যারা চড়ছে এবং চলন্ত ট্রাম থেকে যারা নামছে তাদের ওঠা-নামার কৌশল।

গাড়ীখানা বাঁয়ে বেঁকেছিল সেদিন—এণ্টালী মার্কেটের পাশ দিয়ে। তারপর অলিগলি ঘুরে চলতে লাগল। মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করে নিলে। কোন দিকে ক্যাণ্টোফার লেন। প্রথমে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল ক্রস্টোফার রোড-এ। সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে এমন পল্লীর মধ্যে এলাম যে মনটা শঙ্কিত হয়ে উঠল। শুধুই বস্তী, বস্তী, বস্তী। সংকীর্ণ পথ, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র মানুষ। শুধুই মুসলমান! মুসলমান! মুসলমান! আজ সত্য বলতে হ'লে বলতে হবে আমাদের সমাজের এমনি একটা সংস্কার বা শিক্ষা যাই হোক ছিল, যা আমার মনেও সেদিন ছিল, যে পরিমাণ ভয় ওই মুসলমান বস্তীতে পেয়েছিলাম সে পরিমাণ ভয় অনুরূপ হিন্দু বস্তীতে আমার হ'ত না, অথচ ওই মুসলমান গাড়োয়ানটিই আমার ভরসা।

একবার তাকে হেঁকে বললাম—এ কোথায় নিয়ে এলে? ক্যাণ্টোফার লেন কতদূরে?

সে উপর থেকে ঝুঁকে আমাকে বললে—কিছু ভয় নেই খোকাবাবু, আমি ঠিক নিয়ে যাচ্ছি। আর এসে পড়েছি।

ঠিক এই সময়েই ডান দিকে একটা কাঠের পোস্টে লোহার প্লেটে লেখা দেখলাম ক্যাণ্টোফার লেন।

ক্যাণ্টোফার লেনের দুধারে মুসলমানদের বস্তী।

একেবারে লিণ্টন স্ট্রীটের মোড়ের দিকে প্রথম বাড়ী আমার মেসো-

মশাইদের। বড় দোতলা বাড়ী। বাড়ীর ফটকের পাশেই মার্ব্বেল ট্যাবলেটে লেখা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বি-এল, উকীল।

চীৎকার ক'রে বললাম—থামো, থামো।

চোদ্দ

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আমার ছোট মেসোমশায় একটি দুর্লভ চরিত্রের মানুষ। যেমন রূপবান সৌম্য-দর্শন মানুষ তেমনি অন্তরের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান। সহস্রের মধ্যেও বোধ করি এমন মানুষ মেলে না। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে প্রভাবান্বিত দৃঢ় চরিত্রের লোক, অথচ শান্ত স্নিগ্ধ মধুরভাষী। একালে এমনি একটি মানুষ দেখেছি যুগান্তর দলের শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে। দু জনের মধ্যে রূপের পার্থক্য অনেক কিন্তু দু জনেরই দেখেছি—হাসলে যেন স্থানটিতে উত্তাপহীন আলো জ্বলে ওঠে। অথচ এই যুগেই রূপবান এক বিপ্লবী নেতাকে দেখেছি—হাসির মধ্যেও বাঁকা তরোয়ালের ধার, হাসিতেও মানুষকে আঘাত করবার প্রবৃত্তি। মানুষের সাধনার পার্থক্যে বোধ হয় এটা ঘটে থাকে।

এঁরা অর্থাৎ নগেন্দ্রনাথেরা ছিলেন আট ভাই। নগেন্দ্রনাথ ছিলেন মেজভাই। আমি যখন এঁদের ওখানে গেলাম তখন পাঁচ ভাই সংসার ও কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেছেন, তিন ভাই পড়ছেন। পাঁচ ভাইয়ের চার জন প্রতিষ্ঠাবান তখন। বাড়ীটিই প্রতিষ্ঠাবানের বাড়ী। একটি বিশেষ উচ্চ-মানের সংস্কৃতি এ বাড়ীটিতে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং নগেন্দ্রনাথই ছিলেন এ বাড়ীর কেন্দ্রমণি। বাহিরের উকিল হিসেবে খুব খ্যাতিমান উকিল না-হলেও করপোরেশন থেকে পাড়ার ছোট প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তাঁর ছিল অন্তরের যোগ। চৈতন্য লাইব্রেরীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। পাড়ার মুসলমানদের তিনি ছিলেন নির্ভরের স্থান, বিশ্বাসের পাত্র। তিনিই ছিলেন বাড়ীর কর্ত্তা।

বড় ভাই ছিলেন বড় কন্ট্রাকটার। তখন তিনি থাকতেন রঙপুরে।

তৃতীয় ভাই ছিলেন খ্যাতিমান ডাক্তার। সিভিল সার্জেন হয়ে রিটায়ার করেছিলেন তিনি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় তিনি ছিলেন ওখানকার সিভিল সার্জেন। চতুর্থ ভাই ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইঞ্জিনীয়ার এবং ইনিও আমার এক মেসোমশায়। পঞ্চম ভাই তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টে সন্থ ঢুকেছেন। পরে ট্রেজারার হয়েছিলেন। ষষ্ঠ ভাই এম-বি পড়ছেন তখন। তারপর জিতেন্দ্র। সে আমার থেকে কিছু বড়, সে তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। ছোট নৃপেন ইস্কুলের ছাত্র। এছাড়াও তাঁদের বাড়ীতে অনেক ছেলে; তারাও পড়ে ইস্কুলে।

আর ছিলেন এঁদের মা। তিনি আমার দিদিমার বাল্যসখী। হ্যাঁ, এই একটি মায়ের মত মা দেখেছি। এমন ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা খুব কম দেখা যায়। এবং তিনি ছিলেন এই রূপবান সন্তানদের যোগ্য জননী। তাঁর বাবা তখনও বেঁচে। কন্যা দৌহিত্রদের কাছেই থাকতেন। নাতিরা বলতেন— নানাদাদা। পাকা সোনার মত গায়ের বর্ণ, ঠিক দাদামশায়ের মতই স্থূলোদর নাদুসনুদুস পক্বকেশ বৃদ্ধ প্রায় বড়াই করতেন—"দেখ-দেখ গায়ের রঙ। কখনও সাবান মাখি নি আমি।" নাতিদের সঙ্গে রসিকতা, রহস্যা-লাপ শুনবার মত। সকালবেলা থেকেই বাড়ীখানি আনন্দে উল্লাসমুখর হয়ে থাকত। সত্যকারের আনন্দের সংসার যাকে বলে তাই। এবং আজ সেই বাড়ীর কথা লিখবার সময় এই কথাই মনে হচ্ছে যে, পুণ্য এবং ধর্ম্ম না থাকলে আনন্দের সংসার হয় না। এ বাড়ীতে ধর্ম্ম ছিল, পুণ্য ছিল। মা ছিলেন সংসারে ধর্ম্মের খুঁটির মত। কোন অন্যায়, কোন অধর্ম্ম, কোন অসত্যকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না তিনি। এবং এমনই দীপ্তিময়ী ছিলেন যে, কোন কারণে রুষ্ট হলেই অগ্নিশিখার মত যেন জলে উঠতেন। প্রতিষ্ঠাবান পুত্রেরাও ত্রস্ত হয়ে উঠতেন। ভীত হতেন না কেবল মেজ ছেলে নগেন্দ্রনাথ। প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে তিনি মায়ের সম্মুখীন হতেন এবং সকল উত্তাপ সকল দহন আত্মসাৎ ক'রে নিতেন। মায়ের মুখ প্রসন্ন হ'ত, হাসি ফুটত। বাড়িটিতে ন্যায়পরায়ণতার এমন একটি মান আমি দেখেছি যাতে শুধু বিস্মিতই হইনি, সংস্পর্শে এসে লাভবান হয়েছি।

শুধু একটি ক্ষেত্রে অসংযম দেখেছি, সেটি প্রকাশ পেত তাঁদের সমালোচনার আসরে। মানুষকে সমালোচনা করতেন তাঁরা নির্দ্দয় ভাবে। সহজে কাকেও স্বীকার করার প্রবৃত্তির যেন অভাব ছিল। নগেন্দনাথের মধ্যে এ দোষও ছিল না। আমার দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সর্ব্বগুণান্বিত একটি পবিত্রাত্মা মানুষ।

পূর্ব্বেই বলেছি স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে প্রভাবান্বিত চরিত্রবান মানুষ ছিলেন তিনি; উত্তর জীবনের তিনি দীক্ষাও নিয়েছিলেন বেলুড় মঠে। ভোর চারটের সময় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে শাস্ত্রপাঠ করতেন। হিন্দু দর্শন, ইউরোপীয় দর্শনে পণ্ডিত ছিলেন। আবার রাত্রে এই আলোচনা ও পাঠ চলত নিয়মিত ভাবে। অসাধারণ সহ্যগুণ, বিস্ময়কর বিবেচনাশক্তি।

একবার তাঁদের ভাইদের আসরে ইংরিজী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ভাইরা ছাড়াও আরও আত্মীয় কয়েকজন আছেন। বাড়িতে দেশ-দেশান্তরের আত্মীয় বন্ধুদের জন্য দ্বার ছিল অবারিত, সমাদর প্রীতি ছিল অজস্র এবং অকপট। কেউ কখনও একটি কাঁটার স্পর্শ অনুভব করেন নি। সকলকে নিয়ে সন্ধ্যার আসর বসত। কোনদিন চলত রাজনীতির আলোচনা, কোনদিন সাহিত্যের, কোনদিন শিল্পের। ধর্ম্মনীতির আলোচনা বড় বসত না, কারণ এক নগেন্দ্রনাথ ছাড়া সকলেই ছিলেন ঊনবিংশ এবং বিংশশতাব্দীর সংযোগ-কালের বাস্তব-ন্যায়-মার্গী মানুষ। সে দিন এই আসরে মেরী করেলীর (যতদূর মনে পড়ছে) কোন উপন্যাসের কথা উঠল এবং সেই নিয়ে নগেন্দ্রনাথরে সঙ্গে তাঁর এক ভাইয়ের মতভেদ ঘটল। নগেন্দ্রনাথ যা বললেন তাতে প্রতিবাদ ক'রে তাঁর ভাই বললেন—না, ভুল হল তোমার। ওখানটায় তুমি যা বলছ তা নয়, সেটা হল এই।

নগেন্দ্রনাথ হেসে বললেন—না না, তুমি মনে ক'রে দেখ।, এই বটে।

ছোট ভাই বললেন—না। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে।

কয়েকবার বাদ-প্রতিবাদের মধ্যেই ভাই উত্তপ্ত হয়ে বলে উঠলেন—না। আমি যা বলছি, তাই ঠিক। এবং মন্তব্য করে বসলেন—বই পড়তে হলে

পড়ার মতই পড়া উচিত। এবং না নিশ্চিত হয়ে তর্ক করা উচিত নয়। বের কর বই।

ওঁদের বাড়িতেই একটি সুন্দর লাইব্রেরী ছিল। ইংরিজী, বাংলা, সংস্কৃত উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শনের বইয়ের সংগ্রহ ছিল এবং প্রতি মাসেই কিছু কিছু বই নিজে বাছাই ক'রে কিনে আনতেন নগেন্দ্রনাথ। অন্য ভাইয়েরাও দু চারখানা আনতেন। একখানা ইস্যু বই ছিল, একজনের উপর ভার ছিল। চাবী থাকত নগেন্দ্রনাথের কাছে। বই বাড়ির লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত, বাইরে যেত না।

সে সময়টায় মেরী করেলীর নাম খুব; তাঁর অনেক বই ছিল এঁদের লাইব্রেরীতে এবং আলোচ্য বইখানিও ছিল। ছোট ভাই বললেন—বের কর বই।

নগেন্দ্রনাথ বললেন—থাক। আজ থাক।

—না। থাকবে না। বের কর।

ভাই যেন সেদিন বেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, ধৈর্য্য হারিয়েছিলেন। আমার যতদূর বিশ্বাস তাতে তাঁর মনের ভাব ছিল এই নগেন্দ্রনাথের উপরে এ সকল বিষয়ে পরিবারের সকলেরই এমনই গভীর শ্রদ্ধা ছিল যে তাঁর কথা ঠিক বিশ্বাস করছে না কেউ। এই কারণেই তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। তাই তিনি জেদ ধরলেন—বের কর বই। আন, চাবী আন আলমারীর।

তিনি নিজেই উঠলেন।—কই চাবী?

নগেন্দ্রনাথও উঠলেন।—আনছি চাবী। বেরিয়ে গেলেন। এবং ফিরে এলেন—চাবী কোথায় গেল প্রশ্ন নিয়ে। কোথায় গেল চাবী? কে নিলে? তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে চাবী পাওয়া গেল না।

চাবীটা তিনি নিজেই লুকিয়ে ফেলেছিলেন। যিনি এই লুকানো লক্ষ্য করেছিলেন তিনি আড়ালে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—নগেনদা, চাবীটা আপনি লুকোলেন কেন? আমি তো জানি, আপনি যা বলেছেন—তাই ঠিক। গোলমাল ক'রে ফেলেছেন উনি!

নগেন্দ্রনাথ হেসে মৃদুস্বরে বললেন—এই উত্তেজনার মুখে বই বের করলে

ও অত্যন্ত অপ্রতিভ হবে ভাই। সকলের সামনে কঠিন লজ্জা পাবে। সেই জন্যেই চাবীটা লুকিয়েছি। এর পর কাল বা পরশু ও নিজেই দেখবে এবং ভুল বুঝতে পারবে

দিন দুয়েক পর চাবীটা পাওয়া গেল। পাওয়া গেল দশটার সময়। বাড়ির সকলে আফিস আদালত কলেজ ইস্কুল চলে যাবার সময় চাবীটা টেবিলের উপর রেখে দিলেন তিনি। যে ভাই তর্ক করেছিলেন তিনি তখন ছুটিতে, তিনিই একমাত্র থাকবেন বাড়িতে।

আর দু'একটি ঘটনার কথা বলব।

তাঁর মেজ ছেলে শচী। শচীন্দ্রনাথ। শুচ্যা ছিল আদরের নাম।

ষোল-সতের বছরের শচীর হ'ল টাইফয়েড। এ অবশ্য অনেক পরের কথা।

টাইফয়েডে শচী ভুগেছিল আশী বা চুরাশী দিন। শচীর বিছানায় আশী দিন বসে তার সেবা শুশ্রূষা ক'রে উঠলেন তিনি শচীর মৃত্যুর পর। নিজেই ব্যবস্থা করলেন সব। যেমন বাড়ির সকল কাজের ব্যবস্থা তিনিই করেন ঠিক তেমনি ভাবে।

আর একবারের কথা।

এ কথাটা আবার অনেক দিন আগের কথা। অর্থাৎ তখন আমার বয়স বারো বছর। তের বছরে আমার উপনয়ন হয়েছিল, আর আগের বছরে উপনয়ন হল আমার বড় মাসীমার ছেলের, রমাপতি দা'র। তাঁদের বাড়ি বর্দ্ধমান জেলায় ধবণী গ্রামে। কবি ও গায়ক সাধক নীলকণ্ঠের বাড়ি যে ধবণী গ্রামে—সেই ধবণী। গেলাম এই উপলক্ষ্যে। দুর্গাপুরে নেমে ক্রোশ পাঁচ-ছয় পথ। পথটার ক্রোশ আড়াই তিন দুর্গাপুরের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নয়, একেবারে খাঁটী বনপথ। দুপাশে চাকার দাগ, মাঝখানে ছোট ছোট শালের চারা, শতমূলী ও অনন্তমূলের লতা, চাকার দাগের দু'ধারে ঘন শাল বন। তিরিশ ফুট চল্লিশ ফুট উঁচু নিবিড় শালবন। বর্দ্ধমান ছাড়িয়ে অণ্ডালের মধ্যে রেল লাইনের পাশে পাশে বিশাল এই জঙ্গলটি জঙ্গল নয়, সত্যিকারের বনভূমি। বর্দ্ধমানের প্রান্তদেশ থেকে

বাঁকুড়া মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিখ্যাত ঝাড়খণ্ডের অরণ্যভূমের একাংশ। বাঘ-ভালুক আছে; মধ্যে মধ্যে ডোরাদার রাজকীয় মহিমান্বিতেরও আবির্ভাব হয়। এর চেয়েও বেশী ভয় ডাকাতের ঠ্যাঙাড়ের! আমরা ধবণীগ্রামে সকাল নটা দশটায় পৌছুলাম, শুনলাম—অপরাহ্নে দুর্গাপুরে নেমে রাত্রি আটটা নাগাদ আসবেন ছোট মেসোমশাই এবং মেজমামা। আমার মেজমামা এই ক্যান্টোফার লেনের বাড়িতে থেকেই কলকাতায় পড়তেন। এ বাড়িতে তিনি বোন-ভগ্নীপতির বাড়ি বলে থাকতেন না, থাকতেন মাসীর বাড়ি ব'লে। আমার দিদিমা—মায়ের মা এবং নগেনবাবুর মা বাল্যসখী, বাল্যজীবনে পাটনায় এক বাড়িতে এক সঙ্গে থেকেছেন, একটি নিবিড় প্রেমের সূত্রে দুজনে আবদ্ধ ছিলেন। এবং উত্তরকালে সাত কন্যার জননী সখী আমার দিদিমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার জন্যই সখীর শেষ দুই মেয়েকে তাঁর পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতা থেকে মেজমামা এবং ছোট মেসোমশায় দুজনে আসবেন শুনে খুব খুসী হয়েছিলাম। সেই ছেলেবেলা থেকেই এই মানুষটিকে বড় ভাল লাগত আমার। শুধু আমার কেন, সকলেরই লাগত। এর উপরে ধবণীতে গিয়ে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলাম। ওখানের ছেলেরা, বিশেষ ক'রে জয়ধর কি জয়চন্দ্র যাই হোক, জয়া নামে একটি ছেলে আমার পিছনে এমনি লেগেছিল যে উত্ত্যক্ত ক'রে তুলেছিল প্রথম দিনেই কয়েকটা ঘণ্টার মধ্যে। আমার অপরাধ আমি তার থেকে বয়সে মাস কয়েক কি এক বছরের ছোট হয়েও তার উপরে পড়তাম। মেসোমশায় এলে, তাঁকে আঁকড়ে থাকলে এ উৎপাত থেকে রক্ষা পাব, এই আশাতেই তাঁর প্রতীক্ষায় বেশি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলাম আমি। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত প্রত্যাশা ক'রে শেষে হতাশ হলাম। তাঁরা এলেন না। গাড়িও ফিরল না। ঘুমিয়ে গেলাম। সকালে উঠে শুনলাম রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা একটায় তাঁরা এসে পৌছেছেন। এবং বহু কষ্টেই পৌছেছেন। মাঝ বনের মধ্যে গাড়ির 'লিখে' অর্থাৎ এ্যাক্সেল ভেঙে গিয়েছিল। রাত্রি তখন আটটা। গাড়োয়ান নিরুপায় হয়ে বলেছিল—

বাবু মহাশয়েরা দুর্গা দুর্গা হরি হরি বলেন, আর আশপাশে খসখস শব্দ শুনলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেন। এ ছাড়া আর উপায় নাই। তারপরে সকাল হলে পর যা হয় হবে।

মেসোমশাই প্রশ্ন করলেন—কি হবে!

—দুর্গাপুর ইষ্টিশানে হেঁটে যাব আমি, আপনারা থাকবেন বসে। লিখে কিনে আনব, মিস্ত্রী আনব, লিখে লাগাব, তারপর যাব।

—আর কোন উপায় হয় না?

—হয়। হেঁটে যেতে পারেন। কিন্তু লটবহর বইবে কে?

—তাও বলছি না। কোন রকমে—ওটাকে জুড়ে টুড়ে নেওয়া যায় না? মেরামত হয় না?

—হয়। তায় অস্তর-টস্তর পাই কোথা?

—কি অস্ত্র চাই?

—দা' একখানা; আর ধরুন পেরেক হাতুড়ি। দড়িও চাই। তা অবিশ্যি খুলে টুলে নিলে হয়।

মেসোমশায় তৎক্ষণাৎ তাঁর ট্রাঙ্ক খুলে—একখানি উৎকৃষ্ট ধারালো দা' হাতুড়ি, পেরেক, একখানা বড় ছুরি দড়ি বের করে দিলেন।—নাও।

এবং দেশলাই বাতী বের ক'রে বাতীটি জ্বেলে, কিছু পাতা ও শুক্‌নো কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বেলে বললেন—বল আর কি করতে হবে?

সেই রাত্রে জঙ্গলের একটি সরু শাল গাছ কেটে, ভাঙা লিখেটার নিচে জোড়া দিয়ে পেরেক ঠুকে, দড়ি বেঁধে নিয়ে রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় এসে পৌছেছেন।

এই ধরণের গোছানো মানুষ ছিলেন তিনি।

গোটা বাড়িটাতেই একটি পরিচ্ছন্ন গোছালো ভাব ছিল। বাড়ির প্রতিটি জিনিষ নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে থাকত, এবং একচুল এদিক ওদিক বেঁকেচুরে থাকত না। বড় থেকে ছোট পর্য্যন্ত প্রত্যেকের কাপড় জামা ধবধবে পরিষ্কার থাকত। প্রত্যেকের নিজের গায়ে মাখা সাবান এবং কাপড়ের সাবান থাকত। প্রত্যেকে গামছা রুমালে নিত্য সাবান দিতেন নিজে নিজে।

প্রত্যেকের জুতোজোড়াটির পালিশ থাকত আয়নার মত চকচকে। জামা কাপড়ে মহার্ঘতা ছিল না কিন্তু পরিচ্ছন্নতায় এবং শুভ্রতায় ছিল চোখ-জুড়ানো। শুভ্রতার উপর এঁদের বাড়ির একটা ঝোঁক দেখেছিলাম। নগেনবাবুদের পাঁচ ভাই যাঁরা তখন কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেছেন—তাঁদের সকলের বয়স পঁয়ত্রিশের নিচে; কিন্তু তাঁরা তখন থেকেই সাদা পাড় অর্থাৎ থান ধুতি ব্যবহার করতেন। এটি আমার নিজের খুব ভাল লাগত। আমার বাবার এই রুচি দেখেছিলাম। তিনি একচল্লিশ বছর বয়সে মারা গেছেন। আমার মনে পড়ে তিনিও এই থান ধুতি পরতেন। থান ধুতিতে আমার নিজেরও শখ ছিল বা আছে। এঁদের বাড়ির মহার্ঘতা ছিল জুতোতে এবং গেঞ্জিতে। এ দুটো তাঁরা বেশ দামী ব্যবহার করতেন। এবং এ সবের উপর এমন যত্ন ছিল নিজেদের যা আমার সেই কিশোর মনকে মুগ্ধ করেছিল। ছেলে থেকে সুরু ক'রে প্রাপ্তবয়স্ক উপার্জ্জনশীলেরা প্রত্যেকে নিজের রুমাল গেঞ্জি গামছায় সাবান দিচ্ছেন, নিজের কাপড় নিজে কাচছেন, নিজের জুতো নিজে পরিষ্কার করছেন; চাকর দূরের কথা, নিজেদের স্ত্রীর উপরেও এ কাজের বোঝা চাপাতেন না।

বাড়ির বধূরাও ছিলেন তেমনি। বধূ তখন ছ'জন, এম, বি, পড়ছিলেন যিনি তিনি তখন সদ্যবিবাহিত। ছ'জনের মধ্যে দুই বধূ বিদেশে বিদেশবাসী ছেলের কাছে। বাকী চারজনের মধ্যে সদ্যোবিবাহিতা পিত্রালয়ে। তিনজন থাকতেন এখানে। তার মধ্যে দুজন ছিলেন আমারই মাসীমা। ভোর বেলা থেকে তাঁদের কাজ সুরু হ'ত। সে কি শৃঙ্খলা, কি নিয়মানুবর্ত্তিতা। কখন যে তাঁরা উঠে স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন কাপড়খানি প'রে আপন আপন কাজে লাগতেন আমি কোনদিন জানতে পারি নি।

সকালে উঠেই দেখতাম, গ্যাসের স্টোভে লুচির কড়াই চেপেছে, পাশে রয়েছে প্রকাণ্ড কেৎলী। ঘরের মধ্যে দিদিমা তরকারী কুটছেন। রান্নাঘরে বৃদ্ধ বেহারী মহারাজ রান্না চড়িয়েছে। বধূরা ঘড়ির কাঁটার মত কাজ ক'রে চলেছেন।

সাতটার মধ্যে সারি সারি বড় বড় পিঁড়ি বিছানো হয়ে গেল—বোধ

করি কুড়ি-বাইশখানি। ছোট ছেলেদের বাদ দিয়ে, ভাইয়েরা এবং বাড়ির কুটুম্ব আত্মীয়েরা সব বসে গেলেন; রেকাবীতে লুচি আলুভাজা নয় তো হালুয়া ডিম, তার সঙ্গে চা খাওয়া হয়ে গেল। খাওয়ার সময় দিদিমা এসে বসতেন। এটুকু ছিল যেন তাঁর জীবনধর্ম্ম। কেউ খেতে না পারলে আপনি এসে কাছে বসতেন—খাও, নয় তো বল খাইয়ে দি!

আবার দশটায় একদফা পড়ত পিঁড়ির সারি।

আবার রাত্রি সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে। রাত্রির খাওয়া ছিল এঁদের বিলাসের খাওয়া। প্রতিদিন মাংস ছিল বাঁধা বরাদ্দ।

এই বাড়িতে এসে পড়লাম।

এঁদের বাড়ির আর একজনের কথা না বললে অন্যায় হবে। তিনি এ বাড়ির মালিকদের মাতামহ। 'নানাদাদা'। নানা এবং দাদা দুটো কেমন ক'রে কোন নিয়মে কোন সমাস অনুসারে নানাদাদা হয়েছে সে বিশ্লেষণ থাক। 'নানাদাদা'ই তাঁর নাম, আসল নামটা চাপাই পড়ে গিয়াছিল। আমি যে কালে ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম সে কালে কারুর কাছেই শুনতে পাই নি। নানাদাদা কর্ম্মজীবনে পাটনায় থাকতেন, একটিমাত্র কন্যাই ছিল সংসারের বন্ধন, সেই বন্ধনে বৃদ্ধ তখনও বাঁধা আছেন, একটি আশী বছরের পরম দামাল শিশু।

কাঁচা সোনার মত রঙ, শরতের সাদা মেঘের মত সাদা হাল্কা চুল, মোটাসোটা মানুষ, এখনি হা-হা শব্দে হাসছেন, আবার পর মুহূর্ত্তেই কোন নাতি বলছে, দেখুন তো নানাদাদা অন্যায়টা—; অমনি সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন নানাদাদা—মহা অন্যায়! অত্যন্ত অন্যায়! আমাদের আমল হলে এর জন্যে হৈ-চৈ পড়ে যেত। পাজী-ছুঁচো বদমাস কোথাকার!

তারপর তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেন তার দিকে। বোধ হয় প্রশ্ন করতেন—কার বল তো? এবং কি অন্যায় বল তো?

নাম বললেই আর একদফা সুরু হ'ত। কেবলমাত্র মেজ নাতি অর্থাৎ

নগেন্দ্রনাথের নাম করলেই তিনি হেসে বলতেন—না-না-না। মিথ্যে কথা, হতে পারে না।

তারপর রেগে উঠতেন অভিযোগকারীর উপরেই, বলতেন— মিথ্যে কথা বলছ তুমি? ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে?

খুব চটে উঠলে হাতের লাঠিটাও তুলতেন—মারব তোকে।

এ প্রায় সারাদিনই চলত। আনন্দের সংসার, কৃতী নাতির দল মাতামহটিকে ঘিরে আনন্দের তুফান তুলতেন। শুধু নাতিই নয়, নাতিদের ছেলেরাও সব বড় হয়েছে। বড় নাতির বড় মেয়েরও ছেলেপুলে হয়েছে। আরও দুটি মেয়ের অর্থাৎ নাতির মেয়েরও বিয়ে হয়েছে।

বৃদ্ধের আর একটি বাতিক ছিল। সাবান মাখা দেখলে তিনি চটে যেতেন। নিজের রঙ ছিল কাঁচা সোনার মত, ওই অত পরিণত বয়সেও দেহের সে বর্ণে কোথাও এতটুকু মালিন্য পড়েনি। সেই রঙের দিকে দেখিয়ে বলতেন—দেখ্, দেখ্, এই রঙ দেখ্! ওরে সাবান মাখলে কেউ কখনও ফরসা হয় না। আমি কখনও সাবান মাখি নি। তবু দেখ্।

বিশেষ ক'রে কালো মানুষ সাবান মাখলে বেশী চটতেন। যতক্ষণ সে সাবান মাখত ততক্ষণ তিনি গালাগাল ক'রে যেতেন। সে আমলে ঢাকা ঘেরা স্নানের জায়গা অর্থাৎ বাথরুমের প্রচলন হয় নি। খুব বড় বা পুরো সাহেবী-ভাবাপন্ন বাড়ি ছাড়া বাথরুম থাকত না। বাঁধানো একটু উঁচু একটা প্রশস্ত চাতাল, তার সঙ্গে চৌবাচ্চা এবং কল, এই ছিল স্নানের জায়গা। ও বাড়িতে বারান্দার কোলে একফালি বাইরের উঠানেই ছিল স্নানের জায়গা এবং সামনেই বারান্দায় একখানি চৌকীর উপর ছিল নানা-দাদার আসন। তখন অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেও জীবনের মান এমন ছিল যে জীবনে বিস্ময় না মেনে উপায় থাকে না। ইলেকট্রিক লাইট ওঁদের বাড়িতে অনেক দিন থেকেই আছে, কিন্তু মাত্র খান কয়েক ছাড়া ফ্যান ছিল না। এখন ও বাড়িতে পাঁচ ছটা আধুনিক রুচিসম্মত বাথরুম এবং খান তিরিশেক পাখা হয়েছে। আরও অনেক কিছু—কিন্তু সে থাক। নানাদাদার কথা বলি। গরমের কয় মাসই আমি ছিলাম ও বাড়িতে—

জুন মাস থেকে অক্টোবরের প্রথম অর্থাৎ পুজোর আগে পর্য্যন্ত। নানাদাদা একখানি তালপাতার পাখা হাতে বসে থাকতেন—মধ্যে মধ্যে বাতাস খেতেন, বাকী সময়টা হাতেই থাকত—রাগলে পাখা ছুঁড়েও মারতেন। খুব গরমের সময় নাতিদের ছোটরা বা নাতিদের ছেলেরা এসে পাখাখানি আত্মসাতের চেষ্টা করত। টেনে নিয়ে বলত, আমি হাওয়া করি।

সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের মুখ প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত, বলতেন—তুই হাওয়া করবি? তার চেয়ে তুই বস্, আমি হাওয়া করি।

তাঁর হাতের পাখা এবার জোরে নড়তে সুরু করত। এবং নিজেই ঢুলতে সুরু করতেন। হাতের মুঠো আল্গা হত। অমনি দুষ্টবুদ্ধি বালকটি পাখাখানি সন্তর্পণে টেনে নিয়ে সটকাতো। কয়েক মিনিট পরে গরমে ঘেমে জেগে উঠতেন, চীৎকার করতেন—ওরে সয়তান, ওরে পাজী!

ছোট নাতি নৃপেন, সে প্রায় আমারই সমবয়সী, তাকে বড় ভালবাসতেন নানাদাদা। পূর্ব্বেই বলেছি কালো মানুষ সাবান মাখলে চটতেন; কালো লোকের মধ্যে আমিও ছিলাম তবে আমি নতুন আগন্তুক আর সাবান মাখার খুব নেশা আমার ছিল না। আমার কাছে দেশের কথা শুনতেন এবং রহস্য করে মধ্যে মধ্যে বলতেন—হ্যাঁরে, অ প্রভার ছেলে, তোদের দেশে নাকি বড় রুই মাছের মাথা অম্বলে রেঁধে খায়? তেঁতুল-গোলা জলে সেদ্ধ ক'রে? আরে রাম রাম। তোদের পুকুরে বড় বড় মাছ আছে? বারো সের চৌদ্দ সের? এঁ্যা? বলিস কি, আধমন পঁচিশসের মাছও আছে? তাহলে আমি তোদের দেশে যাব একবার। ছিপে মাছ ধরব।

তাঁর যৌবনকালে ছিপে মাছ ধরার প্রবল শখ ছিল; সে শখ তাঁর বৃদ্ধবয়সেও যায় নি। বড় মাছের কথা শুনলেই বলতেন, যাবে। আমায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিবি। তারপর দেখবি। পুকুরে একটা মাছও থাকলে সেইটাকেই ধরে নিয়ে আসব।

সঙ্গে সঙ্গেই ডাকতেন মেয়েকে। অ—!

মেয়ে এই সব দিক্‌পালের মত ছেলেদের মহিমময়ী মা, হাসিমুখেই এসে

দাঁড়াতেন, বুঝতেন অসময়ে বাপের আহ্বানে গিয়ে নিশ্চয়ই কোন অসম্ভব কিছু আব্দার শুনবেন।

বাপ বলতেন—শুনেছিস প্রভার ছেলে কি বলছে? ওদের পুকুরে বড় বড় মাছ আছে। আমি যাব একবার। ওদের ওখান থেকে কীর্ণাহার ঘুরে আসব। বড় বড় মাছ ধরে আনব। কি বলিস?

—বেশ তো! প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে মেয়ে উত্তর দিতেন।

এই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ছিলেন এই আনন্দের সংসারের ধ্বজার মত। বাইরেই বসে থাকতেন, বাড়ীতে ঢুকে তাঁকে দেখলেই যে কোন আগন্তুকের মন প্রসন্ন এবং পুলকিত হয়ে উঠত। সংসার ছিল সুবৃহৎ। মেয়ের সাত ছেলে—তাদের ছেলে মেয়ে। বিবাহিত মেয়েদের স্বামী-সন্তান। এই এত বড় সংসারে নানাদাদা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কোন অকল্যাণ ঘটে নি। বিয়োগবেদনার এক ফোঁটা অশ্রুও এ বাড়িতে ঝরতে পায় নি। অনেক কাল আগে একটি নাতি বাল্যকালে মারা গিয়েছিল। মেয়ের ছেলে আটটি, তার মধ্যে একটি নাই। আর তার আগে জামাই গিয়েছেন। এদের মৃত্যুর পরই নানাদাদা মেয়ের সংসারে এসেছেন। আগে নয়।

এমন মানুষ আমি জীবনে আরও দু'চারজন দেখেছি। যাঁরা নাকি এক একটি সংসারকে পরিপূর্ণ আনন্দময় করে রাখেন। এ যুগ ভাগ্য-মানার যুগ নয়, পুণ্যের পুঁজির কথাও অচল, ও পুঁজি বাতিল রাজার আমলের নোট। সে হিসেবে একে নেহাতই আকস্মিক বললে বা কাকতলীয় ন্যায় বলে ব্যাখ্যা করলে বাদ-প্রতিবাদ করব না। তবে এ আমি দেখেছি। দেখার দার্শনিক মূল্য দাবী না ক'রে শুধু দেখাব সত্য হিসেবেই লিখছি। এই মানুষেরা যতদিন থেকেছেন ততদিন সংসারে আনন্দের হিল্লোল বয়েছে। পরিপূর্ণ থেকেছে সংসার।

নানাদাদা সেই বিরল ভাগ্যবান পুণ্যবান মানুষদের একজন, তাই বলছি, তাঁর কথা না বললে অপূর্ণ থাকবে এ কথা!

পনের

এবার ঘটনার কথা বলি।

প্রথম ও বাড়িতে নেমেছিলাম প্রায় ভোরবেলা। সকলেই অপরিচিত, চেনা মানুষের মধ্যে ছোট মেসোমশায় নগেনবাবু। আর দুই মাসীমা। পরিচয় দিয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু ওই বাড়িতে দূর দূরান্তর সম্পর্কের আত্মীয়ের আসা-যাওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। ছেলেরা এতে অভ্যস্ত। চাকরেরাও তাই। ছেলেরাই আমাকে সমাদর ক'রে ঘরে নিয়ে গেলেন। কেউ কোন কথা না-বলতেই চাকরেরা বিছানা বাক্স তুলে নিয়ে দোতালায় যত্ন ক'রে রেখে দিলে। মেসোমশায় খবর পেয়ে বেরিয়ে এলেন তাঁর আপিস ঘর থেকে। পূর্ব্বেই তাঁর সুন্দর চেহারা এবং সৌম্য প্রসন্নতার কথা বলেছি। হেসে বললেন—বাড়ির মধ্যে যাও। দিদিমাকে মাসীমাদের প্রণাম ক'রে এস। মুখ হাত ধুয়ে ফেল, চা খাও।

ওঁদের বাড়ির ছোট দুই ভাই জিতেন্দ্রনাথ এবং নৃপেন্দ্রনাথ আমার বয়সী। জিতেন্দ্রনাথ তখন সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছেন, কলেজের ছাত্র; নৃপেন ইস্কুলে পড়ে, বোধ করি সেকেণ্ড ক্লাসে; দুজনের মধ্যে কলেজী গোষ্ঠীর দাবীতে জিতেনের সঙ্গেই আলাপটা প্রথমেই জমে গেল। মেসোমশায় বললেন—জিতেন, তুমি তারাশঙ্করকে নিয়ে যাও, আগে তোমাদের কলেজে দেখ। চেষ্টা কর। যদি ওখানে না-হয় তবে যেখানে হোক ভর্ত্তি করে দাও।

খেয়ে দুজনে দশটাতেই বের হলাম। আমার শরীর তখন অবসন্ন, চোখের পাতা ঘুমে যেন ঢুলে পড়ছে।

জিতেন বাড়ি থেকে বেরিয়েই বললেন—কলকাতায় তো এই প্রথম? না?

বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুতরাং জিতেন আমাকে কলকাতার সঙ্গে পরিচয় করাতে সুরু ক'রে

দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই। ওঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অল্প খানিকটা গিয়েই বিজলী রোডের উপর একদিকে ট্রাম্‌ওয়ের পাওয়ার হাউস, অন্যদিকে সেই কৃশ্চানদের সমাধিক্ষেত্র যার মধ্যে 'দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন'এর সমাধি আছে। জিতেন দেখালেন। বললাম—চলুন দেখে আসি। মনে পড়ে গেল তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতার প্রথম পংক্তি। 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে ;' কিন্তু দেখা হ'ল না। তখন ফটক বন্ধ ছিল।

ট্রামে উঠেই ঢুলতে সুরু করলাম। জিতেন কিন্তু দেখিয়েই চলেছেন। বলেই চলেছেন—এইটে হল জোড়া গীর্জ্জে। দুটো টাওয়ার!

কানে অস্পষ্ট শুনলাম, কিন্তু চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পারলাম না। পরে জিতেন আমাকে বলেছিলেন যে তিনি সেদিন ভারী বিরক্ত হয়েছিলেন এই গেঁয়ো ছেলেটির গুমোর দেখে। সবই যেন তুচ্ছ—কিছুই দেখতে চায় না!

শেয়ালদা'য় খোঁচা দিয়ে ডেকে আমাকে নামতে বললেন। সে কালের ট্রামগুলি ছিল লোকাল ট্রেণের ঢংয়ের—পাশাপাশি সারি সারি আটটা দশটা দরজা ; প্রতি দরজায় ঢুকে মুখোমুখী দুখানা লম্বা বেঞ্চ, এ দিকের দরজা থেকে ও দিকের জানালা পর্য্যন্ত। রঙ ছিল হলদে। দরজার সামনে লম্বা ফুট বোর্ড। সে ট্রামের আর একখানাও এ আমলে দেখা যায় না। হাওড়ায় আছে।

বঙ্গবাসী কলেজে সিট পেলাম না। তবে আচার্য্য গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়কে দেখলাম। জিতেন দেখালেন। একালে বর্দ্ধমান সম্মেলনী ইত্যাদির কার্য্যকলাপে দেখি আচার্য্য গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্ত বসুর নাম। ওঁদের বাড়ি বর্দ্ধমান জানলে সেদিন পাশের জেলা বীরভূমের লোক হিসেবে নিশ্চয় একটা দাবী জানাতাম।

ওখান থেকে রিপন, সেখান থেকে মেট্রোপলিটান। তখন এ কলেজগুলি ঐ নামেই পরিচিত ছিল ; তখনও সুরেন্দ্রনাথ কলেজ বা বিদ্যাসাগর কলেজ নামকরণ হয়নি।

কোথাও সিট নেই। আমি এবার ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। তাহ'লে

কি করব? ঘুম ছেড়ে গেল। আর হয় তো বহরমপুর ফিরে গিয়েও সিট পাব না। জিতেন বললেন, চলুন, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে দেখি।

কোথা দিয়ে যে সেদিন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে গিয়েছিলাম মনে নেই। তবে পার্ক স্ট্রীট মনে আছে। পার্ক স্ট্রীট তখন সত্যসত্যই পার্ক স্ট্রীট ছিল। দু-পাশের ফুটপাথের উপর বড় বড় ঘন-পল্লব গাছ; পথখানি ছায়ায় ঢাকা। লোকজনের ভিড় নেই। এত বড় বড় ঝকমকে দোকানদানীরও তখন কিছুই ছিল না। চৌরঙ্গীর মোড়ে ছিল শুধু হল এ্যাণ্ড এ্যাণ্ডারসন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সামনেটাও তখন অন্য রকম ছিল—বড় বড় গাছ; প্রায় একতলা সমান উঁচু সিঁড়ি ভেঙে কলেজ হলে ঢুকতে হ'ত। সামনে ছিল প্রকাণ্ড বড় বড় কয়েকটা থাম। সেনেট হলের সামনের চেহারার সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। কলেজ হলে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। সামনে চমৎকার থিয়েটারের স্টেজ। এবং হলের মেঝেটি সুন্দর মসৃণ কাঠের। পা পিছলে যায়। বঙ্গবাসী, রিপন বা মেট্রোপলিটান কোন কলেজের চেহারাই এমন আকর্ষণীয় নয়। সেই কারণেই মনে হল ওসব কলেজেই যখন জায়গা পাই নি তখন কি এখানেই জায়গা হবে?

হল্ পার হয়ে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সামনেই রেক্টরের ঘর, কলেজের আপিস। ওদিকে নিচে দক্ষিণে সুপ্রশস্ত সবুজ মাঠ। আজও মনে রয়েছে সেদিন আকাশে মেঘ ছিল না, দুপুরের রৌদ্রে সবুজ মাঠ ঝলমল করছিল। এবং সেই মাঠে ইউরোপীয় এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। মাঠের দক্ষিণ দিকে জুনিয়র কেম্ব্রিজ কোর্সের ইস্কুল ছিল তখন। মস্ত দোতালা বাড়ি। আর দেখলাম সাদা পাদরীর পোষাক প'রে একেবারে খাঁটী ইউরোপীয় ফাদারেরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একজনও দেশী অধ্যাপক দেখলাম না। প্রত্যেকেরই মুখে দাড়ী। জিতেন বললেন, এঁরাই প্রফেসর সব। রোমান ক্যাথলিক পাদরী। সত্য বলতে কি, ভড়কে গেলাম খানিকটা।

একটা গল্প মনে পড়ে গেল। আমাদের দেশে লাভপুরে তখন নতুন ইস্কুল হয়েছে। সেই ইস্কুলে এক গ্রাম্য পুরোহিত তাঁর ছেলেকে ভর্ত্তি করতে নিয়ে

এসেছিলেন। ছেলেটি বাপের সঙ্গে সারি সারি গোল থামওয়ালা প্রশস্ত বারান্দা অতিক্রম করে স্কুলের বড় হলে ঢুকে বাপের চাদরের খুঁট টেনে ধরে কাতরভাবে বলেছিল, বাবা! এতবড় স্কুলে আমি পড়তে পারব না বাবা! আমারও সেদিনের অবস্থা প্রায়ই সেইরকম হয়েছিল। দাঁড়িয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম। ঠিক তখনই জিতেন আপিস ঘর থেকে ফর্ম্ম এনে বললেন, এখানে সিট আছে! নিন ফিল্ আপ করুন।

তখন ফাউন্টেন পেনের আমল নয়। কিন্তু জিতেনদের বাড়িতে ফাউন্টেন পেন ছিল কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার অধিকার অর্জ্জনের পুরস্কার। সোয়ান পেন আর পকেট-ঘড়ি। আমিও বিয়ে উপলক্ষ্যে পেয়েছিলাম একটি ব্ল্যাকবার্ড পেন। কলেজের হল্‌টি অভিনয়ের সময় হত প্রেক্ষাগার, অন্য সময়ে ওইটিই ছিল কমন রুম। প্রকাণ্ড বড় একখানা কালো-বার্ণিশ টেবিলের পাশে অনেকগুলি চেয়ার। সেইখানে এসে ফর্ম্ম পূরণ ক'রে টাকা হিসেব ক'রে জমা দিয়ে ভর্ত্তি হয়ে বাড়ি ফিরলাম। আমার রোল নাম্বার হ'ল ১১৭।

আমার সঙ্গেই বেরিয়ে এল আরও দুটি ছেলে। একজনের নাম্বার ১১৬ একজনের ১১৮। সুশীল আর অনাথ। সেণ্ট জেভিয়ার্সে তখন নাম্বার অনুযায়ী বসবার নিয়ম ছিল। মনে হচ্ছে বেঞ্চে ও হাইবেঞ্চে নাম্বারগুলিও লেখা থাকত। আমার দুপাশের দুজন সহপাঠীর সঙ্গে প্রথমেই আলাপ হয়ে গেল। বেশ শক্ত সমর্থ দেহ। তারা দুজনেই এক ইস্কুল থেকে পাশ ক'রে এসেছে। ঠিক মনে পড়ছে না—মুরশিদাবাদ বা ওই অঞ্চলের ছেলে।

এরপর সমস্যা, কোথায় থাকব? সেণ্ট জেভিয়ার্সের তখন কোন হোস্টেল ছিল না। অথচ তখন প্রথম মহাযুদ্ধের আমল, ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এ্যাক্‌ট্ পাশ হয়েছে। বিনা বিচারে আটকের ব্যবস্থা। কলেজের ছাত্রদের উপর কড়া নজর। পুলিশের নির্দ্দেশে—কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ যে কোন মেসে বা বোর্ডিংয়ে থাকা অনুমোদন করেন না।

মেসোমশায় এবং দিদিমা বললেন—যতদিন তেমন ভাল মেস বোর্ডিং না হয় এখানেই থাকবে তুমি।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য শীঘ্রই বোর্ডিং মেস খুলবেন।

এই কারণেই সেণ্ট জেভিয়ার্সে বাইরের ছাত্রের ভিড় কম। সিট তখনও খালি।

রাস্তায় খানকয়েক একসারসাইজ বুক এবং একটা কপিং পেনসিল কিনে দিলেন জিতেন।

ষোল

সেণ্ট জেভিয়ার্সে আমার কলেজ-জীবন মাত্র মাস কয়েক।

এ কয়েক মাসের মধ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন হোস্টেল খুলতে পারেন নি, কোন মেসও না। তাই এই কয়েক মাস ইট্‌লিতে মেসোমশায়দের বাড়িতেই থেকে গেলাম।

সেণ্ট জেভিয়ার্সে অধ্যাপকেরা সকলেই ছিলেন ইউরোপীয়। এঁদের মধ্যে ফাদার পাওয়ার, ফাদার কারবেরীকে মনে আছে। ওঁরা দুজনেই ইংরিজীর অধ্যাপক ছিলেন। আর একজন ছিলেন বেল্জিয়ান-ফাদার। তাঁকে মনে পড়ে কিন্তু নাম মনে নেই। আর অতি অল্প বয়স, মাথার চুল লালচে, ফুরফুরে সদ্য-ওঠা দাড়ী গোঁফ, বোধ করি নাম ছিল ফাদার লালেমো, ছেলেরা তাঁর নাম দিয়েছিল লালমোহন। ছেলেদের সঙ্গে তাঁর ভারি ভাব ছিল। বাইশ থেকে চব্বিশের মধ্যে বয়স, জীবনে তারুণ্যের চঞ্চলতা গোপন রাখতে পারতেন না।

ক্লাসে প্রায় ১৬০।১৭৫ জন ছেলে। কলকাতায় বাসিন্দাদের ছেলেই বেশি। তাদের কলকাত্তাই চালের কাছে আমরা সন্ত্রস্ত কোণ-ঘেঁষা হয়ে থাক্‌তাম।

এক নম্বর রোল ছিল যার তার নাম হালিম। ওই পার্ক স্ট্রীট সারকুলার রোড জংসনের কাছাকাছি বাড়ি। এক মুসলমান ব্যবসায়ীর ছেলে। যত উগ্র তত মুখর ছিল এই ছেলেটি। আমরা এর থেকে সভয়ে দূরে থাকতাম। সে সিঁড়ি উঠত দড়বড় শব্দ তুলে, নেমে যেত এমনি শব্দ তুলে; মধ্যে মধ্যে ক্লাসরুমের কাঠের মেঝেতে জুতো ঘষত।

আর একজন ছিল, ক্লাসের মধ্যে রূপের দীপ্তিতে সব চেয়ে উজ্জ্বল, প্রাণচাঞ্চল্যে সব চেয়ে চঞ্চল অথচ মিষ্ট ছেলে, তার নাম ছিল সঞ্জীব। ছেলেটি কোন কর্ম্মেই তেমন কর্ম্মঠ ছিল না কিন্তু সকল কর্ম্মেই প্রাণপ্রাবল্যে, উৎসাহের উল্লাসে সকলের আগে এসে স্থান ক'রে নিয়ে দাঁড়াত। অভিজাত বংশের রক্ত ছিল তার দেহে। পাইকপাড়ার কুমার অরুণ সিংহের ভাগ্নে ছিল সে। নিত্য নূতন জামা প'রে চমৎকার একখানি সাইকেলে চড়ে কলেজে আসত। থাকত খুব কাছেই, হ্যারিংটন স্ট্রীট কি হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে তখন কুমার অরুণ সিংহ থাকতেন। দুপুরে টিফিনের সময় কলেজের পিছন দিকে ফুটবল গ্রাউণ্ডে কলেজের ছেলেরা ফুটবল খেলত। জন কয়েক পুরানো ছাত্র, নিয়মিত-খেলোয়াড় ছাড়া নতুন ছেলেদের ভিড় জমে যেত। এক একদিন জন কয়েক ক'রে খেলার সুবিধে পেত। কিন্তু সঞ্জীব, নতুন ছাত্র হলেও এবং খেলোয়াড় হিসেবে তার কোন পারঙ্গমতা না-থাকলেও নিজের স্থানটি সে নিত্যই করে নিত অবলীলাক্রমে। সে হিসেবে সে ছিল নিত্য-কার টোয়েল্টিথার্ড ম্যান। এবং নিত্যই জুন জুলাই আগষ্ট মাসের ভিজে মাঠে একটি বা দুটি বা চারটি আছাড় খেয়ে জামার সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়ে ঝাঁ ক'রে বাইসিক্ল চড়ে বাড়ি গিয়ে আবার পরিচ্ছন্ন পোষাক প'রে কলেজে ফিরে আসত মিনিট দশেকের মধ্যেই। সঞ্জীবের বাড়ি ছিল আমাদের ওদিকেই। আমদপুর-কাটোয়া লাইনে ধাঁধলসা স্টেশন পত্তন সঞ্জীবের বাড়ির চেষ্টাতেই হয়েছিল। সঞ্জীবের ভগ্নীপতি ছিলেন ম্যাকলাউড কোম্পানীর রেলওয়ে বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

আর একজন ছিলেন, তাঁর নাম গোপনই করব, করে বলব নিত্য রায়, মধ্যে মধ্যে বয়েজ স্কাউটের দলের স্কাউটের পোষাক পরেই কলেজে আসতেন ; কলেজের শেষে স্কাউট দলে যোগ দিতে চলে যেতেন। চলায়-ফেরায়, কথায়-বার্ত্তায় অমন অহেতুক স্মার্ট ছেলে আর আমি দেখি নি। সে তখন থেকেই নিটা রে। নিত্য থেকে 'নিটা' বলে ডাকলেই খুসী হত।

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বলত—ইয়েস্। র-শেষান্ত কথাগুলোর

'র' উচ্চারণটা তখন থেকেই সে মুছে ফেলেছিল। হিয়ারকে বলত হিয়া—, স্যারকে বলত সা—।

নিত্য রায় কিন্তু উত্তরজীবনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ভাল চাকরী করে। এর আট ন বছর পর আমি কানপুরে গিয়েছিলাম আমার শ্বশুরকুলের ঠ্যালায়। তাঁরা তখন আমাকে কয়লা-ব্যবসায়ী বানিয়ে তুলবার জন্য বদ্ধপরিকর। সেই সূত্রে কানপুরে থাকি এবং ওদিকে কানপুর ওয়াটার ওয়ার্কস এবং এদিকে রেলওয়ে স্টেশনে ছুটোছুটি করি। সেই সময় নিত্য রায়কে স্টেশনে রেলের কোন বিভাগে পদস্থ কর্ম্মচারী হিসেবেই দেখেছিলাম। একলা একটা বড় ঘরে বড় টেবিলে নিটা রে বসে কাজ করত। বাইরে আর্দ্দালী থাকত। আমি দেখেই তাকে চিনেছিলাম। মোটা একটু লেগেছিল কিন্তু চেহারার কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। তবুও সন্দেহ একটু হ'ত বই কি! একদিন সন্দেহ ঘুচে গেল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি শুনতে পেলাম ভিতরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টা থামল। সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম—নিটা রে।

—ইয়েস, ইয়েস। নিটা রে স্পী-ই-কিং!

ঘুচে গেল সন্দেহ। বুঝলাম এই সেই নিত্য।

এরপর আরও দু'চার জায়গায় দেখা হয়েছে। শেষবার বোধ হয় ১৯৩৯।৪০ সালে অধ্যাপক নির্ম্মল বোস, আমি এবং সুধীর রাহা তিন জনে গিয়েছিলাম দুমকা বেড়াতে। পুজোর ঠিক পরেই। আমদপুরে দেখি নিত্য রায়। ফার্স্ট ক্লাস থেকে নেমে আমাদের সঙ্গে বাসে সঙ্গী হয়ে চড়ে বসল। আমি চিনলাম। নিটা রে আরও খানিকটা মোটা হয়েছে। সিউড়ীতে আমাদের সঙ্গেই নামল। নির্ম্মলবাবুকে আমি বললাম নিত্যর কথা। আমার তিন মাসের কলেজ-জীবনের ক্লাস ফ্রেণ্ড।

নির্ম্মলদা বললেন—আলাপ করব?

বললাম—করুন না।

নির্ম্মলদা আলাপ করলেন এবং এসে আমার স্মৃতিশক্তির তারিফ ক'রে বললেন—হ্যাঁ, হি ইজ মিস্টার নিটা রে। ই-আই-আর-এর কর্ম্মচারী।

চলেছেন. আমদপুর-সিউড়ী-দুমকা-ভাগলপুর বাসের প্যাসেঞ্জার কেমন হয় দেখতে। আলাপ ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—মশায়ের নামটি জানতে পারি? বললেন—এন্ রে। আবার বললাম—এন্ রে? পুরো নামটি কি বলুন তো। এবার ভুরু কুঁচকেই বললেন—নিটা রে। বললাম—ইউ মিন নিত্য রায়! বললেন—ইয়েস, নিটা-রে। এ সব হল আমদপুরে। সিউড়ীতে নেমে নিত্য কিন্তু সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিলে তার স্মার্টনেসে। উনিশ শো চল্লিশ সাল, ইংরেজ রাজত্বের শেষ জৌলুষ তখন পুলিশি প্রচণ্ডতায় তৈলহীন দীপের উস্কে-দেওয়া পলতের আলোয় লাল্‌চে এবং কাল্‌চে হয়ে জ্বলছে। তার উপর এর আগেই সিউড়ীতে সদ্য সদ্য পার হয়েছে স্বনামকুখ্যাত দোহা সাহেবের আমল। লোকের অন্তরে যাই থাক, বাইরের দেওয়ালে রাজার ছবি প্রায় সব ঘরেই শোভা পায়। সিউড়ি-আমদপুর-সাঁইথিয়া-দুমকা বাস সার্ভিসের আপিস-ঘরের দেওয়ালেও ষষ্ঠ জর্জের ছবি টাঙানো ছিল। ঘরে ঢুকলেই সামনে পড়ত। বাস সার্ভিসের মালিক ভূপেনদা আমার বন্ধুস্থানীয়। আমরা ঘরে ঢুকলাম। ও বেলা দুমকার বাসের টিকিট কিনব। রায়ও ঘরে ঢুকল। ঢুকেই টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে ছবিখানার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইংরেজিতে বলে উঠল—এই যে ভদ্রলোক, ওঁর সঙ্গে ল্যাণ্ডনে বাকিংহাম প্যালেসে এক টেবিলে ডিনার-খাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন উনি অবশ্য ছিলেন প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্।

নিটা রে স্কাউট হিসেবেই বিলেত গিয়েছিল এবং সেই হিসেবেই প্রিন্স্ অব্ ওয়েলসের নিমন্ত্রণ পেয়েছিল, সে সব কথাই সে সেইখানে শুনিয়ে দিলে।

আর একজন—তিনিও সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, বাড়ির গাড়িতে চড়ে আসতেন। চমৎকার চেহারা। বড় শান্ত মানুষ, মধুর প্রকৃতি। কোঁকড়া চুল, মাঝখানে সিঁথী, গৌরবর্ণ রঙ। তাঁর সঙ্গে দু'বছর পরে তখনকার মেট্রোপলিটান কলেজে দেখা হয়েছিল। নাম তাঁর মনে নেই।

আমাদের দেশের আশু দাসও সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ত। লাভপুর ইস্কুলেরই ছাত্র। তাকেও পেলাম এখানে। তাকে পেয়েই ক্লাসের ছেলেদের

সঙ্গে আলাপের চাহিদাটা কমে গেল। আশু পরে পুলিশে চাকরী নিয়েছিল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটে একটা হাতখানেক লম্বা পায়ের ছাপ ওই আশুই আবিষ্কার করেছিল।

এরা ছাড়া নিবিড় আলাপ হ'ল আমার দুপাশের দু'জনের সঙ্গে। সুশীল আর অনাথ। সুশীল লম্বা, অনাথ মাথায় একটু খাটো। কিন্তু দুজনেই সবল দেহ। ব্যায়াম-করা পেশীসবল শরীর। দু'জনেই একজায়গার ছেলে। এক ইস্কুল থেকে পাশ করেছে। বাসা দু'জায়গায় কিন্তু থাকে প্রায় একসঙ্গে অহরহ। কলেজে তাদের দু'জনের মধ্যে আমি ছেদের সৃষ্টি করি। অন্যের সঙ্গে কথা বলে কম। আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বাধ্য হয়েই বলতে হ'ত। সেই বাধ্যতার মধ্য দিয়েই আলাপ ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে উঠতে সুরু করল। টিফিনের সময় কলেজের একদল ছুটত ফুটবল গ্রাউণ্ডে, একদল ফুটপাথে। ওদিকে ওয়েলেসলী পার্ক স্ট্রীটের জংসন, তার ওপারে এ্যালেন গার্ডেন। এদিকের ফুটপাথে ছড়িয়ে ঘুরে বেড়াত। আমি বেশির ভাগ খেলাই দেখতাম। খেলতে খানিকটা পারতাম, এক সময়ে মোহনবাগানিয়া বীর পদবী লাভের লোভ ছিল মনে মনে, কিন্তু তবুও মাঠে নামতে পারতাম না। সে ওই সঞ্জীবের মত সকল কাজে এগিয়ে দাঁড়াবার দুঃসাহস যাদের আছে তারাই পারে। বাইশ জনের খেলা বত্রিশ জনে মিলে খেলতে ভাল লাগত না। মধ্যে মধ্যে এ্যালেন গার্ডেন-এ এসে বসতাম। অনাথ সুশীল এখানে একখানি বেঞ্চ অধিকার করে বসে থাকত। কথাবার্ত্তা বলত। ওদের কাছে বসলে ওরা খুব খুসী হ'ত না।

হঠাৎ আলাপটা একদিন জমে গেল আমার খাতার পাতায় লেখা একটি কবিতা উপলক্ষ্য করে। আমাদের লাভপুরে অতুলশিব লাইব্রেরীতে মাসে মাসে সাহিত্যসভা হ'ত। সেখানে পাঠাবার জন্য কবিতা লিখেছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার অনুকরণ। প্রথম লাইন দুটো আজও মনে আছে—

"বাস করে যারা কেউটে তাড়িয়ে সোঁদর বনের শেলেদা বাঘ।
ভেতো কে বাঙালী ভীতু সে বাঙালী-জাতির কপালে পড়েছে দাগ।"

তারা পড়ে খুব খুসী। বললে—তোমার লেখা?

বললাম—হ্যাঁ।

—নকল ক'রে নেব এটা!

তখন এমন অহঙ্কার ছিল না যে কবিতাটা মারা যেতে পারে। তখন ধারণা ছিল খুব পণ্ডিত অথবা বেশ বড় লোক না হ'লে কাগজে লেখা সহজে ছাপা হয় না। অথবা বেশ বড় লোকের পৃষ্ঠপোষকতা থাকা চাই। আপত্তি করলাম না। তারা নকল ক'রে নিয়ে গেল। দিন কতক পর নিজেরাই একটা কবিতা চাইলে। বললে—কই নতুন পদ্য কই?

কবিতার তখনও পদ্য নাম চলতি ছিল। চোদ্দ অক্ষরের চলতি খুব কমে গিয়েছে। ত্রিপদীর প্রথম দুই পদের মিলের হাঙ্গামা ঘুচিয়ে তাকে সোজা-লাইনে সাজিয়ে কাব্যরচনাই তখন বেশী চলেছে এবং চলতির জন্য সোজাও মনে হ'ত। কলেজে দুই পাশে এমন কাব্যোৎসাহী দুই বন্ধুকে পেয়ে উৎসাহ অনুভব করলাম। একটি কবিতা রচনাও করা ছিল আগামী মাসে লাভ-পুরের সাহিত্যসভার জন্য। কবিতাটির নাম ছিল—'খোকার ত্যাগ।' একটি খোকা তার সদ্য মাতৃহীন বন্ধুর সঙ্গে খেলা করতে গিয়েছিল, কিন্তু বন্ধু কেঁদেছে, বলেছে কাল রাত্রে তার মা যে কোথায় চলে গেছে খুঁজে পাচ্ছে না; সেই কারণে তার আর কিছুই ভাল লাগছে না, সে খেলতে পারবে না। এ খোকাটি ক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়ি ফিরে নিজের মাকে বলছে, ওর মা কোথায় গিয়েছে তুমি খুঁজে এনে দাও। মায়ের চোখে জল এল, তিনি বললেন—ওরে পাগল, ওর মা যে স্বর্গে গেছেন, অনেক দূর। কি ক'রে ডেকে আনব তাঁকে? তা হ'লে আমাকেও খুঁজে পাবি নে তুই। খোকা মায়ের মুখের দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে—না, তা হ'লে তুমি খুঁজতে যেয়ো না। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এস। ওই খোকাকে ডেকে নাও! ওর চোখ মুছিয়ে কোলে নাও। আমি হেঁটেই আসব। ও আমাদের বাড়িতেই থাকবে। মাগো, আমার মায়ের ভাগ আমি ওকে দেব। শেষ দুটো লাইন ছিল—

> ওরই দিকে নয় মুখ রেখে শোবে, আমি করব না রাগ,
> সত্যি বলছি—আমি ওকে দেব আমার মায়ের ভাগ।

আমার ভাল লেগেছিল কবিতাটি। দিলাম ওদের। কিন্তু ওদের ভাল লাগল না। বললে—সেই রকম পদ্য লেখ। সেই দেশের কথা নিয়ে। সেই ধরণের পদ্য চাই।

তখন বোধ হয় আগস্ট মাস, পূজো আসছে সামনে। সে কালে পূজার সময় সাহিত্যের আসরে আগমনী কবিতার স্থান ছিল প্রথমেই। বাঙলা দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির ধারাটি জাতীয়তাবাদের কল্যাণে পুনরুজ্জীবিত হয়ে তখন প্রবল এবং গভীর ধারায় প্রবাহিত হ'ত। এ কালে ইজমে'র স্রোতের ধাক্কায় বালির চড়া পড়ে সে খাত মজে এসেছে। লোকসঙ্গীতের ধুয়োকে যারা প্রবল ক'রে তুলতে চাচ্ছেন তাঁরা শারদীয়া পূজাকে উচ্চবিত্ত এবং সম্পন্ন মধ্যবিত্তের উৎসব বলে এবং এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা "ব্যাধির' বীজাণু আছে বলে আগমনী সঙ্গীতকে পরিহার করেছেন এবং কলকাতা শহরে এখন হাজার দরুণে বারোয়ারী দুর্গা পূজা গজিয়ে ওটা সত্ত্বেও আগমনীর পাতা সাহিত্যপত্রিকা থেকে আজ উঠে গেছে। কিন্তু বাংলা দেশের লোকসমাজে আজও শরৎ কালের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাউল-বৈরাগীরা একতারা, ডুব্‌কী, বাঁয়া, মন্দিরা, গাবগুবাগুব বাজিয়ে গৃহস্থের দুয়ারে বাজারে হাটে হাজির হয়ে গাইতে সুরু ক'রে দেয়—

"গিরি - গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে মা-মা বলিয়ে
স্বপ্ন ঘোরে আবার কোথা লুকাইল।"

মানুষেরা আজও পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেই আগেকার কালের মতই ওঠে। অভাব-অভিযোগ রোগ-শোক অপার বেদনারও পারে এসে পৌছয় তারা। এবং বুক বেঁধে ভক্তিশুদ্ধ চিত্তে পূজার প্রত্যাশা করে। এইখানেই এ উৎসব হয়ে ওঠে সার্ব্বজনীন। এবং বাংলা দেশে যদি সার্ব্বজনীন উৎসব বলে কোন উৎসব পার্ব্বণ থাকে, তা এই শারদীয়া উৎসবই। ধনী মধ্যবিত্তের সাধ্য কি যে এ পার্ব্বণের ভাবানুভূতিকে নিজেদের নাট-মন্দিরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখে। শুধু ধনী দরিদ্রের মধ্যেই এ পূজা আবদ্ধ নয়, রাঢ় বঙ্গে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সম্প্রসারিত। সে

স্থালে কিন্তু এর প্রভাব সাহিত্যে প্রবল ভাবেই পড়ত। আমি সেই উপলক্ষ্য করেই 'আগমনী' কবিতা লিখেই ওদের হাতে দিলাম। প্রথম জার্মাণ যুদ্ধ তখন প্রবল ভাবে চলছে। সেই সুরও এসে পড়েছিল।—

"মাগো, আর একবার নাচতে হবে।
ওদের দেশে নাচিস মাগো তা থৈ তা থৈ,
মোদের দেশে নাচবি কবে?
সত্যি রূপে হোথায় গেলি,
মিথ্যে সেজে হেথায় এলি,
আঁকা তিনটে চক্ষু মেলি রইলি চেয়ে,
পলক ফেলে জাগ্ মা ভবে।"

ওরা এ কবিতা পেয়ে মহানন্দে নেচে উঠল। বললে যে, এ কবিতা তারা হাতে লিখে বা ছেপে বিলি করবে। কবিতা ছাপা হয়েছিল প্রীতি-উপহারের মত। কিন্তু তাতে আমার নাম ছিল না! এতে দুঃখ হয়েছিল। ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি তখন। এরপর নিত্যই এ্যালেন গার্ডেনে বসে আমাদের কাব্যচর্চ্চা চলত। ওদের কাছ থেকে কিছু কিছু বইও পেয়েছিলাম। সখারাম গণেশ দেউস্কর, স্বামী বিবেকানন্দের বই। স্বামীজীর বই আমি লাভপুরেই পড়েছিলাম। তবুও আবার পড়লাম। আরও কিছু কিছু বই পড়েছিলাম। একদিন আমাকে ওরা নীলচে ধরণের মলাট দেওয়া একখানি বই দিয়ে বললে, এখানা তোমাকে প্রাইজ দিয়েছেন আমাদের এক দাদা। তোমার ভাল পদ্যের জন্যে দিয়েছেন। বইখানির মলাটে ঠিক মাঝখানে তেরচা ভাবে বেশ টানা হাতের লেখার মত হরফে সোনার জলে লেখা বন্দেমাতরম। খুলে দেখলাম, স্বদেশী গানের বই। সে আমলের সমস্ত স্বদেশী গানই তার মধ্যে ছিল। বইখানি অনেক যত্নে রেখেছিলাম। কিন্তু উনিশ শো তেত্রিশ চৌত্রিশে বীরভূমে ওই দোহা সাহেবের বীরভূম কনস্পিরেসী কেসের আমলে অনেক বইয়ের সঙ্গে ওখানিকেও উই পোকার মুখে শেষ হতে দিতে হয়েছে। তখন বাড়ি কবে সার্চ্চ হবে তার কোন ঠিক নাই। তাই নেহাৎ নিরীহ ধরণের বই কিছু রেখে বাকী সবই আমার এক পিসতুত

ভাইয়ের খালি বাড়ীতে বাক্সবন্দী ক'রে রেখেছিলাম। আমি রাখি নি, রেখেছিলেন আমার কথা মত আমার বাড়ীর লোকে। আমি তখন সাধ্যমত বীরভূমের বাইরে বাইরেই থাকি। তাঁরা কাঠের প্যাকিং বাক্সে বইগুলি পুরে ও বাড়িতে রেখেছিলেন। তার ওপর ঢাকা দিয়েছিলেন ঘুঁটের স্তূপ। পরে যখন ঘুঁটের স্তূপ সরানো হ'ল তখন কাঠের বাক্সটি একটি উই ঢিপিতে পরিণত হয়েছে। ভেঙে পাওয়া গিয়েছিল প্যাকিং কেসের কয়েকখানা পাতলা কাঠ, কিছু আধ-খাওয়া-মলাট এবং আধ-খাওয়া কিছু কাগজ।

একদিন ওদের সেই দাদাকে দেখলাম।

মধ্যে মধ্যে এক একদিন ওদের এক একজন, কখনও বা দু'জনই এ্যালেন গার্ডেনে অনুপস্থিত থাকত। বলত—একটু কাজ ছিল।

একদিন অনাথ ছিল, সুশীল ছিল না। তার কাজ আছে। আমি এবং অনাথ বসে আছি, কথা বলছি, এমন সময় সুশীল ফিরে এল। বললে—ওঠ, তারাশঙ্কর!

—কোথায়?

—এস না।

অনাথ কোন প্রশ্নই করলে না। তিনজনে পূর্ব্বমুখে সারকুলার রোডের দিকে হেঁটে চললাম। সারকুলার রোড জংসনের একটু আগে পার্ক স্ট্রীটের দুই পাশে প্রাচীন কালের কয়েকটি কবর স্থান। সেইখানে নিয়ে গেল। তখনকার পার্ক স্ট্রীট স্বতন্ত্র পার্ক স্ট্রীট ছিল। বড় বড় গাছ দুই পাশে। গাছের আড়াল দিয়েই একরকম যাওয়া চলত।

কবরস্থানের চারিপাশের পাঁচীলের একটা অল্পস্বল্প ছাড়ানো জায়গা দিয়ে ভিতরে ঢুকে একজন মানুষকে দেখলাম। একটা বড় কবরের আড়ালে বসে আছেন। তাঁর চেহারা আমার মনে আজ আবছা হয়ে এসেছে। তবে তাঁর মুখে তখন দাড়ীগোঁফ, মাথায় চুল ছিল। শ্যামবর্ণ রঙ। বেশ স্বাস্থ্যবান ভারিক্কে ধরণের মানুষ। বয়স তিরিশ হয় তো হবে। মাথায় একটা টুপী ছিল। মুসলমানী ঢঙের।

আমার পদ্যের প্রশংসা ক'রে বললেন—প্রাইজ পেয়েছ? পড়বে সমস্ত গানগুলি।

অনাথ সুশীলের দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন—এ দুটো গুণ্ডা। এরা তোমার মত পদ্য লিখতে পারে না। তোমার কিন্তু শরীরটা দুর্ব্বল। তোমার শরীরটা ভাল করো।

তারপর বললেন—বছর দুয়েক আগে নলিনীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল, রামপুরহাটে? কখানা চিঠিও লিখেছিলে। না?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—হ্যাঁ।

তিনি বললেন—দেশ স্বাধীন হবে। তৈরী হও সব। বুঝলে?

কেঁপে উঠলাম।

আর কোন কথা না বলে তিনি বললেন—যাও আজ। সুশীল তুই থাক।

আমি অনাথ চলে এলাম। পথে অনাথকে জিজ্ঞাসা করলাম—অনাথ, উনি কে?

অনাথ বললে—নাম জেনে কি করবে? উনিই আমাদের দাদা।

পুজোর দিন পনেরো আগে সুশীল অনাথ হঠাৎ কলেজে অনুপস্থিত হ'ল। এবং পুজোর ছুটি পর্য্যন্ত আর এলই না কলেজে। দু'পাশে দু'জনের সিট খালি পড়ে থাকত, মাঝখানে আমি বসে থাকতাম। ক্লাসে সঙ্গী বলতে ওরাই দুজনে ছিল, অন্যদের সঙ্গে বড় আলাপ হয় নি। ক্লাসের পর বেরিয়ে এসে আশুর সঙ্গে দেখা হয়। তারই সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে হাঁপ ছাড়ি। এদিকে সামনে পুজো। কলকাতার বাজারে লেগেছে ছোঁয়াচ, রঙীন বসনে ভূষণে রঙচঙে হয়ে উঠেছে। কলেজেও ছোঁয়াচ লেগেছে। পুজোর বন্ধের আগের দিন এবং পরের দিন, দু'দিন অভিনয় হবে। সেকালে অন্য কলেজে অভিনয়ের বড় রেওয়াজ ছিল না কিন্তু সেণ্ট জেভিয়ার্সে ছিল। কলেজ হলেই স্থায়ী রকমের স্টেজ সাজানো ছিল এবং

এই ইউরোপীয়ান ধর্ম্মযাজক অধ্যাপকেরা এ দিক দিয়ে ছিলেন উদার। তাঁরা অভিনয়ে উৎসাহই দিতেন। কলেজ বোর্ডে নোটিশ পড়ে গেল—যাঁরা অভিনয়ে অংশ নিতে ইচ্ছুক তাঁরা স্বাক্ষরকারীর কাছে নাম দিয়ে আসুন। স্বাক্ষরকারী ছিলেন নীতীন রায়। নীতীন রায় কলেজে প্রায় সর্ব্বজন-পরিচিতই ছিলেন। বোধ হয় তখন থার্ড ইয়ার তাঁর। আগুর সঙ্গে খুব আলাপ। ভদ্রলোকের চেহারাখানি সকল ছেলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। একটু সায়েবী ঘেঁষা ফরসা রঙ, চোখ দুটিও কটা, বিড়ালাক্ষ যাকে বলে, দোহারা শরীর একটু স্থূলতার দিকেই ঝুঁকেছে, ভদ্রলোক চলতেন বেশি ভারী রকমের পা-ফেলে। মাথায় একটু খাটো মনে হ'ত। আর একজন ছিলেন বেশ লম্বা, শ্যামবর্ণ, একটু মিষ্টি বাঙালী চেহারার ভদ্রলোক, তিনিও থার্ড ইয়ারের ছাত্র, তিনিও ছিলেন অভিনয়দক্ষ ব্যক্তি। তবে নীতীন বাবুরই নাম বেশি। আমার মেসোমশায়ের ভাই ভুলুবাবু ছিলেন সেণ্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র, আই-এস-সি পাশ করে মেডিকেল কলেজে তখন পড়তেন, তিনি নীতীনবাবুর গল্প করতেন।—নীতীন খুব ভাল থিয়েটার করে। সাহস আছে! চন্দ্রগুপ্ত প্লের সময় যা সাহস ও দেখিয়েছে!

ব্যাপারটা তাঁদের আমলের। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের ভূমিকা নিয়েছিলেন ওই শ্যামবর্ণ ভদ্রলোকটি, তিনি তখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র। নীতীন বাবু কলকাতারই ছেলে, ভবানীপুরে বাড়ি, বোধ করি স্কুলজীবনেই সে আমলে পাণ্ডা হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। তবে কলেজে এসে নিজেই ঠাঁই করে নিয়েও ওই ভদ্রলোকের পিছনেই ছিলেন তখন পর্য্যন্ত। কাজেই তিনি নিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকা। এরপর রিহারশালের সময় চাণক্যের ভূমিকায় ভদ্রলোক অকস্মাৎ নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব ক'রে বলেছিলেন—বই বদলাতে হবে। চাণক্য আমি পারব না। এ দিকে তখন সময় কমে এসেছে। কি হয়? ছেলেদের কাছে অভিনয় হবে বলে চাঁদা নেওয়া হয়েছে। নতুন নাটক ধরবার সময় কোথায়? তখন নীতীনবাবু এগিয়ে এলেন, বললেন—আমি করব চাণক্যের পার্ট। তখন ভূমিকার নাম পার্টই ছিল বাঙলা ভাষায়। এবং নাকি ভাল অভিনয়ই করেছিলেন। ভুলুবাবু

বলতেন—তবে ওই জায়গাটা বুঝেছ, যেখানটায় আছে না—এই শীর্ণ ব্রাহ্মণ বলে বুকে ঠুকে চাণক্য নিজেকে দেখাবে সেই জায়গাটায় লোকে একটু হেসেছিল।

সেবারে হ'ল সিংহলবিজয় অভিনয়। নীতীনবাবু বিজয় সিংহ। সেই ভদ্রলোক সিংহবাহু। আশু আমাকে ধরলে—তোকে পার্ট নিতে হবে। আমি নীতীনকে বলেছি।

আমি ভয় খেয়ে গেলাম। অভিনয় কখনও তো করি নি। আশু বললে—ওরে, তুই লাভপুরের ছাওয়াল। লাভপুরে থিয়েটারের ট্রেনিং ছেলেবেলা থেকে। তাছাড়া তুই ইস্কুলে যে সব রেসিটেশন করেছিন আমি তো দেখেছি।

আশু যেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়, আমি ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠি, সেবার প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষে আমি আর লক্ষ্মীনারায়ণ একলব্যের গুরুদক্ষিণা আবৃত্তি করেছিলাম স্বর্গীয়া কামিনী রায়ের 'পৌরাণিকী' থেকে। নাটকের আকারে লেখা একলব্য কাব্যনাট্যটি আজও আমার বড় ভাল লাগে। আমি একলব্যের ভূমিকা আবৃত্তি করেছিলাম, নারাণ ছিল দ্রোণ। স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত বোধ হয় তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি আমার খুব প্রশংসা করেছিলেন। শ্রোতাদের খুব ভাল লেগেছিল।

আশুর ধারণা সেইটুকুর উপর ভিত্তি ক'রে। সে জোর ক'রেই নিয়ে গেল নীতীনবাবুর কাছে। তখন তাঁদের নায়িকা কুবেণীর ভূমিকা নিয়ে পছন্দ চলছে। আশু বললে—একে দাও। পরীক্ষার দিন ধার্য্য হ'ল দু'দিন কি তিনদিন পর। হঠাৎ এর মধ্যে এক চিঠি কলেজের কাচে-ঢাকা বাক্সে এসে হাজির হল। সুশীল লিখেছে—কদাচ থিয়েটার করিবে না। দাদা বারণ করিয়াছেন।

আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। সুশীল চিঠি দিয়েছে, কোন ঠিকানা নাই। নিজের কোন খবর নাই। শুধু থিয়েটার করতে বারণ করেছে। মনে থিয়েটার নিয়ে শখও ছিল, ভয়ও ছিল। এ দিকে সেই রহস্যময় দাদা ব্যক্তিটির প্রতি একটি আকর্ষণও ছিল। এই দ্বন্দ্বে পড়ে শেষ পর্য্যন্ত ভয় এবং দাদার আকর্ষণই জয়ী হ'ল। নির্দ্দিষ্ট দিনে বেরিয়ে পথ থেকে ফিরে গেলাম। সে দিনটা ছিল

বৃহস্পতিবার—সেণ্টজেভিয়ার্সের ছুটি। পার্ক স্ট্রীটে ঢুকেও ফিরলাম। ফিরে চলে গেলাম কলেজ স্ট্রীটে কমলালয়।

পুজোর সময়; বোনের, ভগ্নীপতির তত্ত্ব,বউয়ের তত্ত্ব করতে হবে; নিজের এবং ভাইদের জামা চাই। বাড়ি থেকে ফর্দ্দ এসেছে। এতদিন এর জন্যে কলকাতায় যে আত্মীয়-স্বজন থাকতেন তাঁদের কাছে ফর্দ্দ পাঠানো হ'ত, টাকা পাঠানো হ'ত। পাঠাবার সময় পিসীমা কাঁদতেন। আজ অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে একটা কথা বলা চলে না। নিজেদের একটু অনুগ্রহের পাত্র বলে অনুভব করতে হয়। এবার আমি কলকাতায় এসেছি। আমার কাছে এসেছে ফর্দ্দ, টাকা। লিখেছেন—তোমার মেসোমশায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সঙ্গে কাউকে নিয়ে জিনিস-পত্র কিনো। অন্য জিনিষ মেসোমশায় কিনে দিয়েছিলেন, জামাগুলির জন্যে বলেছিলেন, কোন দোকানে মাপ দিয়ে করিয়ে নাও।

কমলালয় তখন মাত্র বছর দেড় কি দুই খুলেছে। কলেজ রোয়ের যে মুখটা হ্যারিসন রোডে মিশেছে সেই মুখে একখানা বাড়ির পরই একটি ছোট ঘরে ছিল কমলালয়। খোলা অবধি লাভপুরের লোকেদের সঙ্গে এঁদের হৃদ্যতা ছিল। কমলালয়ের কর্ণধার শ্রীযুক্ত খগেন চক্রবর্ত্তী আমার থেকে হয়তো চার পাঁচ বছরের বড়। তিনি নিজে টেলারিং শিখে কাজ সুরু করেছিলেন। সে আমলে এই কৃতী পুরুষটির অক্লান্ত পরিশ্রম দেখেছি। ব্যবসায়ে যাকে বলে স্পেকুলেশন, কমলালয়ের সাফল্যের মধ্যে তা কতটা আছে সে জানিনে, কিন্তু এই মানুষটির পরিশ্রম এবং ভদ্র মিষ্ট ব্যবহার, ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে জিনিষ দেওয়ার নীতি যা দেখেছিলাম সেই প্রথম থেকে তাতে সাফল্য তাঁর প্রাপ্য। আজকের কথা জানি নে। আমি সেই প্রথম আমলের কথা বলছি।

কমলালয়ে জামার বরাত দিয়ে ফিরবার পথে হঠাৎ শেয়ালদার মোড়ে সেই টুপিপরা মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেই পার্ক স্ট্রীট গোরস্থানের দাদা। চড়লেন ট্রামে এবং সঙ্গে সঙ্গেই নেমে গেলেন। মনে হ'ল আমাকে নামতে বললেন।

নামলাম। অনুসরণ ক'রে গেলাম বৈঠকখানা বাজারে। সেখানে তিনি অল্প কয়েকটি কথা বললেন—থিয়েটার করছ না তো?

বললাম—না।

—চিঠি পেয়েছ?

—পেয়েছি।

-ভাল। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। এখন শুধু এই ভাবনা। আর কিছু না। বুঝেছ? পূজোর ছুটিতে আরও অনেক ভাল পদ্য লিখে আনতে হবে। যাও। বাড়ী যাও।

আমি প্রশ্ন করলাম—সুশীল অনাথ—

—পূজোর পর দেখা হবে তাদের সঙ্গে।

চলে গেলেন তিনি, আমার শরীরে রক্তস্রোত চঞ্চল উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বুঝতে পারলাম—যা অস্পষ্ট ছিল স্পষ্ট হয়ে গেল। উত্তেজনায়, একটা অজানা আশঙ্কায় মাথার চুল পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল। বাড়ী চলে গেলাম।

পরের দিন কলেজে আশু বললে—তুই কাল এলি নে?

কথা বলতে গিয়ে চুপ করে গেলাম। মনে পড়ল আশুর দাদা সি-আই-ডি সাব-ইনস্পেক্টর।

আশু মনে করলে আমি ভয় পাচ্ছি। সে বললে—এত ভয় কেন রে? চল একদিন রিহারশ্যাল দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি এখনও ঠেকিয়ে রেখেছি।

বললাম—না ভাই। পারব না!

অগত্যা আশু বললে—তবে থাক। নে সিগারেট খা।

আশু ক'দিন আগে টিফিনে সিগারেট ধরিয়েছে। ওই একটা সিগারেটই দিলে।

সে দিন বললাম—না। ও ভাল লাগে না আমার। জামাতে গন্ধ হয়। মেসোদের বাড়িতে টের পাবে।

মোট কথা আমার কানে বাজছে সেই কথাগুলি—এখন দেশের ভাবনা ছাড়া আর কিছু না। 'দেশকে স্বাধীন করতে হবে। ওই কথাগুলি শোনা

অবধি উপলব্ধির মুহূর্ত্ত থেকে আমার সমগ্র দেহে মনে একটা শুদ্ধির তপস্যা সুরু হয়ে গেছে। একটা ক্রিয়া চলছে।

আজ তাই ভাবি। সে কালের জাতীয়তাবাদের মধ্যে মন্ত্রগুপ্তি আত্মগুপ্তিটা বড় ছিল না, তার চেয়েও বড় ছিল চিত্তশুদ্ধি আত্মশুদ্ধির তপস্যা। দেশের মুক্তিসাধনার সঙ্গে মানুষের চরিত্রগঠনের কাজ চলেছিল প্রবলতর বেগে। সে কালে কেউ এ কালের ধারা কল্পনাও করতে পারতেন না। এই দিকটা যেন কাটা ঘুড়ির মতই মিলিয়ে যাচ্ছে। চরিত্রবান মানুষের প্রয়োজন শেষ হয়েছে; উপহাসের সামগ্রী হয়েছে। তাই আজ সাহসী মানুষ, সৎ অসৎ যে বাছবে না, যে মিথ্যায় হোক সত্যে হোক কাজ হাসিল করবার মত কূট কৌশলী সেই আজ সব চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। যাক সে কথা। প্রকৃতি অনাচার সয় না। প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হবে।

এরই মধ্যে একটি বৃহস্পতিবারে, তারিখ মনে নেই তবে খুঁজেলে বের হবে—হ'ল সাইক্লোন। ১৯৪২ সালের সাইক্লোনের মতই সে সাইক্লোন। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের মানুষ যাঁরা তাঁদের নিশ্চয় মনে আছে। সেই-বারের সাইক্লোনেই হ্যারিসন রোড বৃক্ষশূন্য হয়ে গেল। পার্ক স্ট্রীট ন্যাড়া হ'ল। তার আগে শেয়ালদার মোড় থেকে কলেজ স্ট্রীট পর্য্যন্ত হ্যারিসন রোডের দু'পাশে বড় বড় গাছ ছিল। পার্ক স্ট্রীটের সে পরিচয় নামেও আছে এবং কিছু গাছ এখনও পুরনো গোরস্তানের পাশে আজও আছে। আমি বৃহস্পতিবারের সুযোগে দশটায় খেয়ে দেয়ে কমলালয়ে এসেছি। সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এলোমেলো হাওয়া, টিপি টিপি বৃষ্টি। আশ্বিন মাসে যেটা অত্যন্ত সাধারণ। মেসোমশায়দের বাড়ীর যে যার আপিসে কলেজ ইস্কুলে বেরিয়ে গেলেন। যদিও মেঘ ঘোরালো হচ্ছে, হাওয়া জোরালো হচ্ছে, বৃষ্টির ঝাপটা তেজালো হচ্ছে তবুও কেউ কোন শঙ্কা করলেন না। আশ্বিন মাসের বৃষ্টি হাওয়া, শরৎকালের মেঘ, এসেছে আবার চলে যাবে বিকেলের আগেই।

পল্লীগ্রামের লোকেরা অবশ্য আশ্বিনের ঝড় সম্পর্কে শঙ্কিত। ধানের থোড় সুদ্ধ ধানগাছগুলিকে শুইয়ে দিয়ে যায়। তার বেশি কিছু না। তার

কারণ আশ্বিনের সর্ব্বনাশা সাইক্লোন এর আগে বোধ করি ত্রিশ বৎসরের মধ্যে হয় নি। কি তারও বেশী।

আমার মনে পড়ছে—কমলালয়ে বসে আছি, কথা বলছি, সাড়ে বারোটা বেজেছে, বাইরে ওদিকে ঝড় উঠেছে খেয়াল হয় নি। হঠাৎ হ্যারিসন রোডে নবীন ফার্ম্মেসীর সামনে একখানা ছ্যাকরা গাড়ী গেল উল্টে। বাতাস বইছিল পূব দিক থেকে। প্রচণ্ড একটা দমকা এসেছিল, ঠিক সেই মুখেই গাড়ীটা মোড় নিচ্ছিল। একখানা পানের দোকানের মাথার চাল উড়ে গেল। ঝাপটাটার দমকটা পাক খেয়ে কলেজ রোয়ের ভেতরে ঢুকেও ক্ষান্ত হল না, কমলালয়ের চওড়া কাঠের পাল্লাতেও বার দুই মাথা ঠুকে চলে গেল। এবার চকিত হয়ে উঠল সকলে। বাইরে দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির ধারা এবং ঝড়ের মাতন, আকাশের রঙ দেখে মনে হল—এ অবার কি রকম? বোধ করি মিনিট চারেকের মধ্যে খবর চাউর হয়ে গেল—সাইক্লোন আসছে, সাইক্লোন। হাওড়া ব্রিজে পোর্টকমিশনার থেকে দশ নম্বর (ঠিক মনে নেই কত নম্বর, তবে যেন দশ নম্বর বলেই মনে হচ্ছে) ফ্ল্যাগ উড়িয়েছে। হাওড়া ব্রিজ হওয়া অবধি এ ফ্ল্যাগ এ পর্য্যন্ত একবার উড়েছে। এই দ্বিতীয় বার। বন্ধ কর। সব বন্ধ কর। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। আমি বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় হ্যারিসন রোডে দাঁড়ানো যায় না। বাতাসে ঠেলে ফেলে দেয়। বৃষ্টি সূচের তীক্ষ্ণতা নিয়ে মুখে বিঁধছে। ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে কখন। কি করব? হেঁটেই পাড়ি দিলাম। পূব দিক থেকে হ্যারিসন রোড বেয়ে ঝড় বইছে প্রচণ্ড বেগে। তখন অন্তত তিরিশ মাইল বেগে বোধ হয়। আমি চলেছি শেয়ালদার মুখে। খানিকটা আসবার পর পিছনেই ভেঙে পড়ল একটা গাছের ডাল। আমি শঙ্কিত হয়ে দক্ষিণ ফুটপাথে এসে দক্ষিণমুখী গলি-পথ ধরলাম। ক্যান্টোফার লেনে যখন এসে পৌছুলাম তখন বেলা আড়াইটে। ওঁদের বাড়ির ফটক পূর্ব্বমুখী। কাঠের দরজার পাল্লা দু'খানা মাথার লোহার আউট্রায় আটকে আছে বটে কিন্তু পিছনের দিকে দু'টো পাল্লা ঠ্যালা মেরে আর্ত্তনাদ করছে। যেন কোন অদৃশ্য বুনো হাতী মাথা লাগিয়ে ঠেলছে।

সে আউটা খোলা প্রচণ্ড শক্তিশালী লোকেরও অসাধ্য।

তখন কিন্তু বাড়ির মানুষেরা উপায় উদ্ভাবন করে ফেলেছেন। বাড়ির সকলেই ফিরেছেন প্রায়। আপিস ইস্কুল কলেজ আগেই খবর পেয়েছিল। সব বন্ধ হয়ে গেছে বারোটা নাগাদ। তখনও ট্রাম ছিল।

আমি চীৎকার করে ডাকতেই তাঁরা হেঁকে বললেন—দাঁড়াও।

পাঁচ-ছ জনে দু'টো বাঁশ দিয়ে দরজাটাকে সামনে ঠেলে ধরে বললেন—এবার তুমি আঙটাটা খোল। আঙটাটা খুলতে তাঁরা ধীরে ধীরে বাঁশ দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। এমনি হঠাৎ ছেড়ে দিলে দরজার পাল্লা দু'খানা আছাড় খেয়ে পড়ত দু'দিকের দেওয়ালে। কিন্তু এতেও ক্ষতি আটকাল না। এ দরজা দু'পাল্লার, কিছু হ'ল না বটে কিন্তু দরজার পরেই বাড়ীর প্রথম ঘরখানার একটা জানালার ছিটকিনি ঝড়ের বেগে খুলে গিয়ে এক পাল্লা জানালা সজোরে খুলে গেল, আবার ফিরে এল, আবার খুলল; শুধু খুলল না—কব্জার বাঁধন ছিঁড়ে প্রায় ঘুড়ির মত উড়ে গিয়ে পড়ল পাশের বাড়িতে।

তারপর রাত্রে সে কি ঝড়ের তাণ্ডব! সে কি শব্দ, সে কি গোঙানি! যেন প্রলয় হয়ে যাবে। কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থল পর্য্যন্ত এমন প্রচণ্ড এবং এত দীর্ঘক্ষণস্থায়ী প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় দেখিনি। আতঙ্ক এবং কৌতূহলের সীমা ছিল না। রাত্রি তখন কত জানি না, বারোটার পর তাতে সন্দেহ নেই—হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দে বাড়িটার ছাদখানা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। বিরাটকায় বিপুল ওজনের একটা কি যেন আছাড় খেয়ে পড়ল সেখানে। সমস্ত বাড়িটা আতঙ্কে উঠে বসল। সেটা একখানা বিরাটকায় টিনের চালা। উড়ে এসে পড়ল এ বাড়ির ছাদে। রাত্রি দুটো থেকে ঝড় কমতে লাগল। সকাল হল। আকাশে তখনও মেঘ, বাতাসও আছে, তবু প্রসন্ন সূর্য্যালোক বলে দিলে—বিপদ বিগত হয়েছে।

আমরা উঠলাম, বাড়ির বাইরে দেখলাম—নালা বেয়ে তখনও প্রবল জলস্রোত বইছে। রাস্তায় জল জমে রয়েছে। ওই পাড়ায় মেসোমশায়দের বাড়ির পূব দিকে রেললাইন পর্য্যন্ত ছিল বাগানের পর বাগান, নারকেল এবং নানান গাছের সমারোহ। দেখলাম সব যেন ফাঁকা হয়ে গেছে।

আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে দেখে এলাম। ধরাশায়ী গাছগুলোর শাখাপল্লবে মাটি ঢেকে গেছে। মরা কাক, বাদুড়, ছোট ছোট পাখী ছিটিয়ে পড়ে আছে চারিদিকে।

এরপরই কলেজের প্রথম পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী রওনা হলাম। সুশীল অনাথ পরীক্ষা দিতেও এল না। দু'একদিন শেয়ালদার মোড় ঘুরে এলাম। সেই মানুষটির সঙ্গে দেখা হল না।

মনে আছে বাড়ি গিয়েছিলাম সন্ধ্যের ট্রেণে। ওই ট্রেণখানার নাম ছিল লুপ মেল। মধ্যরাত্রে আমদপুর পৌঁছুবে। নিছক মেল ট্রেণে চড়বার জন্যে ওই ট্রেণে গিয়েছিলাম। হাওড়ায় এসে লুপের কাউন্টারে টিকিট কিনতে গেলাম। প্রচণ্ড ভিড়, ওরই মধ্যে একজন পিছন থেকে বললেন—আমার একখানা টিকিটও নেবেন ভাই দয়া করে। আমদপুর।

—আমদপুর? পিছন ফিরে তাকালাম—ভাবলাম পরিচিত কেউ হবে।

না, পরিচিত কেউ নন। অপরিচিত একজন বেশ পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক। একখানা পাঁচটাকার নোট আমার হাতে বাড়িয়ে দিলেন। দু'খানা টিকিট কিনে বাইরে এলাম। মালপত্র নিয়ে কুলী বসে ছিল, তাকে নম্বর খুঁজে বের করে ট্রেণে এসে চড়লাম। সেই ভদ্রলোকও চড়লেন। স্টেশনে তিনি একটা কাঠের বাঁশী কিনলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কিনবেন আপনি?

—আমি তো বাজাতে জানি না।

—শিখবেন। ও শিখতে আর কি লাগে।

কিনলাম দেখাদেখি। ট্রেণে ভিড় খুবই ছিল। তবু জায়গা মন্দ মিলল না। বড় বগী ইণ্টার ক্লাসের দরজার দু'পাশের দু'টো বাঙ্কে তিনি বেশ কায়দার সঙ্গে জিনিস ঠেলে ঠুলে জায়গা ক'রে একটায় আমাকে উঠিয়ে নিজে অন্যটায় চড়ে বসলেন। মাঝখানে দরজাটা রেখে বুকে বালিশ দিয়ে আমার দিকে মুখ করে আলাপ সুরু করলেন। নিজেই পরিচয় দিলেন।

কলকাতায় বাড়ি। আমাদের ওই দিকেই লাভপুর থেকে কয়েকমাইল উত্তরে তাঁর বোনের বিয়ে হয়েছে। সেখানে যাবেন। বোনকে তারা

পাঠায় না। অথচ কলকাতায় মানুষ বোনটির কত কষ্ট হচ্ছে ভেবে বড় কষ্ট পাচ্ছেন। এবার পাঠাবে। তাই খুশি হয়ে যাচ্ছেন। আমার প্রশ্ন করলেন—আপনার নামটি কি ভাই ?

বললাম। তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন—চমৎকার নাম তো! তারা-শঙ্কর! বাঃ! আমাদের দেশে একজন লেখক ছিলেন জানেন? পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন? কাদম্বরীর অনুবাদ করেছিলেন? বললাম—জানি। পড়েছি কাদম্বরী।

—আপনি তো এই বয়সে অনেক পড়েছেন! নিজে লেখেন টেখেন না? এমন নাম! এর মধ্যে কাদম্বরী পড়েছেন! আর কি পড়েছেন? শুধু নাটক নভেল? না আরও কিছু পড়েন? এই বয়সে নীলবসনা সুন্দরীর ফাঁদে পড়েই সর্ব্বনাশ হ'ল দেশটার! আমার ভগ্নীপতিকে তাই বলি আমি। বলি, বিবেকানন্দ পড়! আপনি পড়েছেন?

—পড়েছি।

—পড়েছেন? বাঃ বাঃ। ভাল ছেলে আপনি। নিজে লেখেন টেখেন কিছু? আপনারই মত আমার এক খুড়তুতো ভাই আছে, চমৎকার লেখে।

আমি চুপ করে রইলাম। বলতে লজ্জা পেলাম।

তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন—তা হ'লে লেখেন। বাঃ, বেশ! বেশ! কবিদের লেখকদের লজ্জা পাওয়াটাই স্বাভাবিক। **My shame in crowd but solitary pride!** তাই না? হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন, শোনান না আপনার লেখা! আচ্ছা। আগে আপনাকে আমার বাঁশী শোনাই। নিজের বাঁশীটা ফেলে এসেছি। এগুলোতে সুর ঠিক থাকে না অনেক সময়। পথে রাত্রি কাটাতে হবে বলে কিনলাম। বাজাতে লাগলেন বাঁশী।

চমৎকার বাজান। সমস্ত ট্রেনটাই প্রায় বাঁশী বাজালেন। আমদপুরে নেমে বললেন—এইবার আপনার পালা। দাঁড়ান একটা ব্যবস্থা করি। স্টেশন মাস্টারকে বলে ওয়েটিং রুম খুলিয়ে নি। সেই ভোর বেলা গাড়ী ভাড়া ক'রে রওনা, কি বলেন? হাঁটব মশাই। মাল থাকবে গাড়ীতে।

সত্যিই ওয়েটিং রুম খোলালেন। আলো আনালেন। অদ্ভুতকর্ম্মা ভদ্রলোক। তারপর আমার লেখা শুনলেন। আজও আমি তাঁর তারিফ কানে শুনি!—

মাটির হাতে আর খেলার প্রহরণ
জননী মিনতি গো, ধরো না—ধরো না।

বাঃ বাঃ। ঠিক বলেছেন। জাগতে হয় জাগ! কালীমূর্ত্তিতে জাগ! বন্দুক পিস্তল ধর! নইলে মিছে! পুতুল পূজো।

সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে সকাল বেলা রওনা হলাম। লাভপুরের কাছাকাছি এসে বললাম—আর পৌঁছে গেছি। আপনি কিন্তু এ বেলা আমাদের বাড়ী খেয়ে রওনা হবেন।

মনে রয়েছে তিনি বলেছিলেন—তা যাব। কিন্তু মনটা দমে যাচ্ছে যত কাছাকাছি হচ্ছি, বুঝলেন না? পুলিশের সঙ্গে কারবার কি করে! আমার ভগ্নীপতির বাপ হলেন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। চিঠি লিখেছেন পাঠাব। কিন্তু গেলে যে কি বলবেন সে বোধ হয় দেবতাতেও বলতে পারে না। না পাঠালে কিন্তু থানায় আমি ডায়েরী করে যাব। বুঝেছেন!

এক বেলা কিন্তু থাকলেন না তিনি। চা জল খেয়েই রওনা হলেন। ফিরে এলেন একলা সন্ধ্যে বেলা। বললেন—পাঠালে না! আমি মশায় থানা থেকে ঘুরে আসি। ডায়েরী করব আমি। রাগে ভদ্রলোকের সে কি মূর্ত্তি! সত্যই থানায় গিয়ে ডায়েরী করে এলেন।

সে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

বলে গেলেন—কলকাতায় নিশ্চয় দেখা করব। হয় তো শিগ্‌গির আসতেও পারি। আমার বোনকে নিয়ে যাবার জন্য যদি আইন আদালত করি, বাড়ীতে পরামর্শ করে ঠিক হবে অবশ্য; তা হ'লে আপনি এখানে থাকতে থাকতেই আসব।

তখনও দেশের অবস্থা এমন রিক্ত অবস্থায় পৌঁছয় নি। প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। বাজার দর চড়েছে। মনে পড়ছে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাপড়ের দামই সব থেকে বেশী চড়েছিল বলে মনে হয়েছিল। মিলের ভাল ধুতি

শাড়ী ছ টাকা জোড়া দাম হয়েছিল। তাই মনে হয়েছিল অগ্নিমূল্য। তবে তখনও দেশে সঞ্চয় ছিল। যে যেমন সে তেমনি দুশো, পাঁচশো, হাজার, পাঁচ হাজার নিয়ে নাড়াচাড়া করত। কাজেই চড়া বাজারেও পূজার আনন্দ ম্লান হয় নি। আমাদের গ্রাম তখন জমজমাট গ্রাম। প্রাণ-প্রাচুর্য্যও যথেষ্ট। পূজোর ক'দিন আনন্দ যেন উথলে পড়ত।

ওই পূজা মণ্ডপেই দেখা হল আমার বালিকা বধূর সঙ্গে।

মনে হ'ল তার যেন একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। আমাদের দুই বাড়ির কলহের মধ্যে পড়ে এই এগার বছরের মেয়েটি যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। সে-কালে এগার বছরের মেয়ের সাংসারিক চেতনা একালের ষোল সতের বছরের মেয়েদের থেকে অনেক বেশী জাগ্রত হ'ত। তাদের স্বপ্ন বলতে সংসার স্বপ্ন।

গ্রামে তখন নানান গুজব। পাড়াপ্রতিবেশীদের জল্পনা কল্পনা সুদূর-প্রসারী। তারা অনুমান করে এই আশ্বিন কার্ত্তিক কাটলেই অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুনের মধ্যে আবার দুই বাড়ীর দরজায় রসুনচৌকি বেজে উঠবে। অর্থাৎ আমার এবং আমার ভগ্নীপতি নারাণের আবার বিয়ে সুনিশ্চিত। দোষটা তাঁদের ষোল আনা এ কথা নয়, আমাদের দু'পক্ষের অভিভাবকদের মনোভাবও অনেকটাই তাই ছিল! আমার বোনকে নিয়ে গণ্ডগোল ছিল না। ওদের বাড়ীতে শুধু আমার বোনের বিয়ে হলে কোন গণ্ডগোলই ঘটত না। তবে একা আমার বিয়ে হলে, ঝগড়াটা যেভাবে পেকে উঠেছিল তাতে আমার কপালে দুই পত্নীযোগ এক রকম সুনিশ্চিতই ছিল। এই সব গুজব মেয়েটিকে ওই বয়সেই ম্লান ক'রে তুলেছিল।

পূজোর পর আকস্মিকভাবে উমার সঙ্গে একদিন একান্তে দেখাও হয়ে গেল। আমার যেটি খাঁটি শ্বশুরবাড়ী অর্থাৎ শ্বশুরমশায়ের নিজবাড়ি সে বাড়ি পড়ো বাড়ির মতই খাঁ খাঁ করত তখন। শ্বশুর মশায় আবার বিবাহ করে আলাদা বাড়ি করে সংসার পেতেছেন। এ ছেলেমেয়েরা থাকে মাতামহীর কাছে মামার বাড়িতে। অবশ্য তফাৎ মাত্র রশি দুই আড়াই। সেবার পূজোর পর ওই বাড়িতে নাতি-নাতবউদের সংস্কার পাতবার

আয়োজন করছেন মাতামহী। সেই কারণে বাড়িটার তালা খোলা হয়েছে। আমার বোনই সংসারের কর্ত্রী হবেন। কর্ত্তা হবেন ভগ্নীপতি নারাণ। ভাইরাও আসবে। আসবে না কেবল উমা অর্থাৎ আমার স্ত্রী। তাঁকে মাতামহী তাঁর জীবনের সঙ্গে প্রায় জাহাজের জালিবোটের মত বেঁধে রেখেছেন। এই সময়ে তাঁরই উদ্যোগপর্ব্ব চলছে। নারাণচন্দ্র সকাল বিকেলে চায়ের আসর খুলেছেন। ওদের সংসার দেখাশুনার জন্য এক বামুন ঠাকুমা নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি চায়ের আসরে মিষ্টান্নের ব্যবস্থাও করেছেন। তখন নারাণদের বাড়িতে সেই গল্পের মত ঘড়া ভর্ত্তি দুধ হয়। সাত আট সের দুধ। তাই থেকে ছানা ক্ষীর তৈরী করে মিষ্টি করতেন তিনি। সুতরাং আসর জমে উঠতে দেরী হয়নি। কিন্তু এ আসরে আমি সভ্য ছিলাম না। ছিলাম না ওই ঝগড়ার কারণেই। বিকেলে আমার গতিবিধি ছিল নদীর দিকে। পূজার পর আমাদের কুয়ে নদীতে জল থাকত হাঁটু খানেক, তাতে নৌকা বা ডোঙা চলত না। সেগুলি বাঁধা থাকত দহে। সেখানে গিয়ে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ওই নৌকা বা ডোঙা খুলে নৌবিহার করে আসতাম। এতে সঙ্গী ছিল বীরেশ্বর। বীরেশ্বরের কথা আগে বলেছি। বীরেশ্বরের নাম সার্থক। সত্যিকারের বীর সে তাতে সন্দেহ নেই। এমন দুঃসাহসী এবং এমন শক্তিশালী মানুষ কদাচিৎ চোখে পড়ে। পৃথিবীর কোন কিছুতে তার ভয় দেখিনি এবং এমন কোন খেলা বা শক্ত কাজ নেই যা সে পারে না। বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে তার পারঙ্গমতা নেই, ওদিকে তার রুচিও নেই, কিন্তু যে কোন কঠিন খেলা ব্যায়াম কসরত সে সামান্য চেষ্টাতেই আয়ত্ত করতে পারত; শুধু তাই নয়, অসমান্য কৃতিত্ব অর্জ্জন ক'রে সকলের সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতাও তার ছিল। বীরেশ্বরের কথা যখন মনে হয় তখন আপশোষ হয় যে এমনি একটি সাহসী শক্তিশালী ছেলে পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে ব্যর্থ হয়ে গেল। বীরেশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল যুদ্ধবিভাগ। যুদ্ধবিভাগে প্রবেশাধিকার পেলে বীরেশ্বর একজন রণপণ্ডিত হতে পারত। আরও একটা ক্ষেত্র তার ছিল। সে যদি সেকালে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেত তবে সে সার্থক হতে পারত। কিন্তু সে সুযোগও

তার হয়নি। আমাদের গ্রামের পরিবেশ তেমন ছিল না। বাড়ির আবহাওয়াও না। সেই কারণে বীরেশ্বর নিতান্তই সাধারণ মানুষ থেকে গেল। পুলিশে চাকরী পেলে বীরেশ্বর নরখাদক বাঘের মত ভয়ঙ্কর পুলিশ কর্ম্মচারী হ'ত। কি যে তার দুঃসাহস এবং ওই দুঃসাহসে যে তার কত কৌতুক ছিল তার আর কি বলব! আমাদের লাভপুর থানার উঠানে থানা বিল্ডিং-এর সামনের বারান্দা থেকে হাত বিশেক দূরে একটি আম গাছ ছিল। এই গাছের আম আমাদের চাকলায় সব থেকে আগে ধরত এবং পাকতো। এবং আম গাছের পাশে গোটা দুই তিনি খেজুর গাছ ছিল; শীতের সময় প্রতি বৎসরই সেপাইরা এই গাছ কামিয়ে খেজুর সংগ্রহ করত। বীরেশ্বরের কৌতুক ছিল—এই আম চুরি করা এবং খেজুর রস সংগ্রহ করা। এ কাজ সে অন্তত পক্ষে ক্রমান্বয়ে সাত আট বছর করেছে। পুলিশ কিন্তু কোনদিন ধরতে পারে নি।

এই নৌবিহার ছিল বীরেশ্বরের আবিষ্কার। আগে বলেছি—বীরেশ্বর ফুটবলে একজন অসামন্য কৃতী খেলোয়াড় ছিল। বাল্যকাল থেকে বীরেশ্বরের সঙ্গে আমার প্রীতি ওই ফুটবল খেলার সূত্র ধরে। আমার জীবন নিত্য কয়েক-ঘণ্টা ওর সঙ্গে নিয়মিত ভাবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে থাকত।

একবারকার কথা মনে পড়ছে

শীতকাল, পৌষমাসের শেষ। আমরা খেলা শেষ করে বাড়ি ফিরছি। সে আমলে আমাদের ফুটবল খেলা চলত বারমাস। চাষের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পথ। দু'পাশে রবি ফসলে ক্ষেতগুলি ভ'রে উঠেছে। সে দিন বোধ করি জন চারেক ছিলাম আমরা। হঠাৎ বীরেশ্বর এবং দ্বিজপদ দাঁড়িয়ে গেল। এ দ্বিজপদ কবির বিপ্রপদ নয়, এ আর এক দ্বিজপদ—বীরেশ্বরের প্রতিবেশী এবং আত্মীয়। বললে—চল তুমি। আমাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টাটা আমি বুঝতে পারলাম। কাজেই আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। তখন বীরেশ্বর প্রকাশ করলে—পরের দিন তাদের পৌষলা হবে—তার জন্য তারা আলু চুরি করিবে ক্ষেত থেকে।

আমি সবিস্ময়ে বলেছিলাম—সে কি! কিনলেই তো হয়।

বীরেশ্বরেরর যুক্তি হল—চুরি ক'রে যদি পৌষলা না করলে পৌষলার আমোদটা কোথায়? মিষ্টত্ব কোথায়?

আমার মনেও নেশা লেগেছিল সেদিন। আমিও ক্ষেত থেকে ওদের আঁচলে আলু তুলে দিয়েছিলাম। হঠাৎ লোক এসে পড়েছিল। আমরা প্রচণ্ড দৌড় মেরে ঘুর পথে গ্রামে ঢুকেছিলাম। বীরেশ্বর বলেছিল—এই তো আমোদ।

পরের দিন কিন্তু ওই জমির চাষী ঠিক আমাদের বাড়ী এসে হাজির হয়েছিল। সে সকলকেই চিনেছিল কিন্তু এসেছিল আমার মায়ের কাছে। বলেছিল—উনি কেন গেলেন মাশায়, তাই আপনাকে নিবেদন করতে এসেছি।

মা জিজ্ঞাসা করলে মিথ্যা বলতে পারিনি। স্বীকার করেছিলাম। মা প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি তো ওদের সঙ্গে পৌষলা করতে যাবে না, তুমি কেন গেলে? চুরি করতে গেলে?

আমি ভেবে চিন্তে নিজেকে খতিয়ে দেখে বলেছিলাম—চুরি করতে কেমন লাগে তাই দেখলাম।

মা বলেছিলেন—কিন্তু এ কথা কি ভেবেছিলে যে যে-চাষী চাষ করছে সে সকালে উঠে দেখে—তোমার পিতৃপুরুষের মুখে বিষ্ঠা পড়ুক বলে গাল দিতে পারে? ঘটনাটি সন্দীপন পাঠশালায় আছে। এ ঘটনাটি মায়ের ওই কথায় এবং সেদিন চাষীর তাড়ায় পালাবার সময় বুকের মধ্যে যে উদ্বেগ করেছিলাম তার স্মৃতিতে আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে।

এই বীরেশ্বর।

বীরেশ্বরের সঙ্গে সেবার আলাপটা নতুন ক'রে জমেছিল—কলকাতার ফুটবল খেলার গল্প নিয়ে। সেবার আমি কলকাতায় লীগ এবং শীল্ড খেলা দেখে গিয়েছি, সেই খেলার গল্প শুনতে আসত সে। এবং এই গল্পের আসর বসত নদীতে ওই নৌকার উপর। বেলা তিনটে হতে না হতে চলে যেতাম, বাড়ি ফিরতাম সাড়ে সাতটায়। আর একজন সঙ্গী আমাদের ছিল। আসলে সে বীরেশ্বরের বন্ধু। আমার চেয়ে বয়সে বছর চার-

পাঁচের বড়। আমাদের গ্রামের দত্তদের ছেলে। ইস্কুলে আমাদের থেকে উঁচুতে পড়ত। আমাদের মধ্যে সে আমলের একটা সামাজিক ব্যবধান ছিল। কালিদাস দত্ত প্রথম দু'তিন দিন একটু সমীহ করত। তারপর সে সহজ হল। তখন এই চারঘণ্টা কালিদাস এক নাগাড় হাসিয়ে যেত। হাসাত' সে বক্তৃতা ক'রে। এবং এই বক্তৃতায় 'মান' শব্দ সহযোগে অজস্র নূতন শব্দ তৈরী করে যেত। আরম্ভ করত—"ওই যে দোদুল্যমান ভাসমান তরণী এই কলকলায়মান প্রবহমান নদীতরঙ্গে দ্রুত ধাবমান—হঠাৎ যদি টলটলায়মান হইয়া উল্টায়মান হয় তখন নিমজ্জমান হইয়া তোমরা কি ক্রিয়মান হইবে?"

বীরেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিত—সন্তরণ করিব।

—মূর্খ! বল—সন্তরণমান হইব। কিন্তু দহ অভ্যন্তর হইতে যদি কুম্ভীর উত্থায়মান হইয়া আক্রমণমান হয় এবং ঠ্যাং ধরিয়া জলতলে নিমজ্জ-মান হয়, তবে কি করিবে?

—তাই তো! কি করিব আপনি বলমান হউন।

—বাহবা! কালিদাস বাহবা দিত। তারপর বলত—সেই কারণে বলিতেছি নিমজ্জমান হইবার পূর্ব্বেই ঝম্পমান হইয়া ওই যে শাওড়া বৃক্ষের ডাল জম্বু বৃক্ষের ডাল বায়ুতে দোলদোলায়মান দেখিতেছ তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝোঝুল্যমান হইবে। এবং চিল্লায়মান হইয়া লোক ডাকিবে বুঝিয়াছ?

আমার জীবনে এই নৌকাবিহারের স্মৃতি কালিদাসের এই রসকাব্যের স্মৃতিতে মধুর হয়ে আছে।

এরই মধ্যে একদিন, সে দিন পূজার পর আমাদের ওখানে যে সাহিত্য সভা ছিল তারই অধিবেশন হবার কথা। সন্ধ্যার সময় অধিবেশন হবে। আমি কবিতা দিয়েছি এবং ওখানকার ঠাকুরপাড়ার মুসলমান মিয়াদের সম্পর্কে প্রবাদ গল্প নিয়ে একটি প্রবন্ধও দিয়েছি। এই কারণেই সেদিন নৌবিহার স্থগিত ছিল। সে দিন বিকেলে বেরিয়ে নারাণদের বাড়ীর সামনে আমার পাড়ার বন্ধুদের সামনে পড়ে বাঁধা পড়লাম। আমাদের

পাড়াটা সে কালে অভিজাত পাড়া বলে গণ্য হ'ত আমাদের গ্রামে! পাড়ার বন্ধুরা আমাকে অবজ্ঞা করতে পারত না, কিন্তু ঠিক তাদের সঙ্গে জলের সঙ্গে জলের মত মিশে না-যাওয়ার জন্য আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করত। সে দিন তারা যখন পাকড়াও করলে তখন আর 'না' বলবার যো রইল না। বাড়ীর ভিতরে চায়ের মজলিশে নিয়ে গেল।

এইখানেই সেদিন দেখা হল ওঁমার সঙ্গে।

ওই যে ওদের বাড়িতে ছিলেন অভিভাবিকা ঠাকুরমা—তিনিই সুকৌশলে আমাকে বন্দী করলেন একটি ঘরে। ডাকলেন, তোমাকে নারাণ ডাকছে একবার উপরে। কি বলবে।

বুঝলাম নারাণ বলবে ঝগড়ার কথা। সেটা আমার পক্ষে প্রীতিপ্রদ ছিল না। কিন্তু এতগুলি বন্ধু-বান্ধবদের সম্মুখে না বলে ঝগড়ার গুরুত্বের প্রমাণ দিতে লজ্জা হল।

—ওই ঘরে। বলে দেখিয়ে দিয়ে ঠাকুরমাটি পাশে সরে দাঁড়ালেন। এবং আমি ঘরে ঢুকতেই বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল আমার বালিকা বধূটি।

সে দিন সে জিজ্ঞাসা করেছিল—লোকে বলছে তুমি আবার বিয়ে করবে?

ছুটির মধ্যে আর কয়েক দিনই বউটির সঙ্গে এই ভাবেই দেখা হয়েছিল। বোধ করি আমার সারা জীবনে রোমান্স বলতে এই ক'টা দিনের দেখা-শুনা।

পুজোর ছুটি শেষ হল।

কলকাতায় এলাম। মেসোমশায়দের বাড়ীতে উঠলাম। বোধ হয় ঠিক পরের দিন গেলাম কালিঘাট মহিম হালদার স্ট্রীটে আশু দাসের সঙ্গে দেখা করতে।

আশু দাসের বড় দাদা মাখন দাস ছিলেন সি-আই-ডি সাব-ইনস্পেক্টর কি ইনস্পেক্টর। সেখানে আশুর সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় দেখলাম সেই

ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন ওদের বাড়ীতে। যিনি, পূজোর ছুটির সময় বাড়ি যাবার ট্রেনে আমার সঙ্গী ছিলেন, যিনি বোনকে আনবার জন্য গিয়েছিলেন, তিনি।

হেসেই তিনি বললেন—কাল এসেছেন ?

—হ্যাঁ। বিস্ময়ের আর অবধি রইল না আমার। কিন্তু আপনি—?

—মাখনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার পাঠ্য জীবন শেষ হয়ে গেল।

তিনি সি-আই-ডি অফিসার। ওই সুশীল অনাথ এবং সেই মুসলমানী টুপীপরা রহস্যময় দাদা ব্যক্তিটির সঙ্গে আমার সংযোগ সূত্র আবিষ্কার করেছেন তিনি। তিনি সে কালের বিখ্যাত পুলিশ কর্মচারী ৺পূর্ণ লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয়। সেই সূত্রে তিনি লাহিড়ী মশায়কে আমার কথা বলেছিলেন। কারণ ছিল এই যে, ৺পূর্ণ লাহিড়ী মশায় এক সময় লাভপুরে সাব-ইনস্পেক্টর ছিলেন এবং আমার বাবার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল ঘনিষ্ঠ। এদিকে আশু দাসের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক জেনে আশুর দাদা মাখনবাবুকেও জানিয়েছিলেন। মাখনবাবুও আমাদের দেশের লোক। এই সব যোগাযোগের জন্যই আমার ভাগ্যে বন্ধন-যোগটা গৃহে-বন্ধন-যোগেই পর্য্যবসিত হল। পড়া ছেড়ে বাড়ীতে আবদ্ধ থাকতে হল।

তবু বন্ধন—বন্ধন।

এই বন্ধনের মধ্যেই কৈশোর পার হয়ে উপনীত হলাম যৌবনে।

ঘরে বসে এই বন্ধন মুক্তির স্বপ্ন দেখতাম।

একদিন বন্ধন অর্থাৎ বাধা-নিষেধ কাটল। সে বোধ হয় আঠারো সাল। কিন্তু তখন পরাধীন ভারতবর্ষই আমার কাছে কারাগারে পরিণত হয়েছে।

দাঁড়ালাম—কি করব ? কোন্ পথে যাত্রা করব সুরু ?

হঠাৎ শুনতে পেলাম—জালিনওয়ালাবাগের ধ্বনি।

শুনলাম—অহিংসার পথে গান্ধীজীর আহ্বান !

সেই পথেই যাত্রা আমার সুরু হল।

শেষ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অন্যান্য বই

কবি
অভিযান
সন্দীপন পাঠশালা
মন্বন্তর
পঞ্চগ্রাম
গণদেরতা
ধাত্রীদেবত
কালিন্দী
প্রতিধ্বনি
স্থলপদ্ম
না
গল্পসঞ্চয়ন
১৩৫০
ইমারত
রসকলি
জলসাঘর
হারানো সুর
চৈতালী ঘূর্ণি

রাইকমল
নীলকণ্ঠ
আগুন
পাষাণপুরী
তিনশূন্য
যাদুকরী
দিল্লীকা লাড্ডু
ঝড় ও ঝরাপাতা
প্রসাদমালা
শিলাসন
নাগিনীকন্যার কাহিনী
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
আরোগ্যনিকেতন
দুইপুরুষ
দ্বীপান্তর
পথের ডাক
বিংশ শতাব্দী
প্রিয়গল্প